শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

মাসিক পত্রিকা।

প্রথম বর্ষ।

ভাদ্র ১৩০৬——শ্রাবণ ১৩০৭।

ভবানীপুর।

শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারিণী

সূচীপত্র ।

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীগুরু স্তব। (পদ্য)	সতীশ চন্দ্র বসু	
শ্রীশ্রীতুলসীর স্তোত্র (পদ্য ,	ঐ	
চিরকুমের চিন্তা।	অটল চন্দ্র নাথ	৩ ,
ভক্তের ভগবান।	নগেন্দ্র নাথ মল্লিক	:
প্রাণের কথা	সভাচার্য্য (উক্তি)	১৪, ৪৬,
ভারতে বর্ণভেদ	বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭, ৪০ ৫
বকুল বৃক্ষ (পদ্য)	বসন্ত বিহারী সেন	:
ধর্ম্মের পথ (পদ্য)	সতীশ চন্দ্র বসু	২
গান	বিবিধ	২৪, ৪৮, ৭২, ৯৬, ১২০, ১৪৪, ১৯২, ২
শ্রীগৌরাঙ্গ (পদ্য)	প্রাচীন	২৫
গোরা রসময় (পদ্য)	অটল চন্দ্র নাথ	২৬
চিন্তামালা	হরিপদ ঘোষ	২৮, ৮১, ১০৬, ১৫৬, ১৮৫
সৎসঙ্গ	সতীশ চন্দ্র বসু	৩০
গুরু নিষ্ঠা	নগেন্দ্র নাথ মল্লিক	৩৭
রিপুষড়্‌বর্গ	দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন	৪৫
(অনুবাদ)	সতীশ চন্দ্র বসু	
আগমনী গীতি (গান)	হেমন্ত কুমার মৌলিক	৪৭
শ্রীগৌরাঙ্গ (পদ্য)	প্রাচীন	৪৯
প্রর্থনা	সতীশ চন্দ্র বসু	৫০
সকীর্ত্তন	সতীশ চন্দ্র বসু	৫৩
ভক্ত-নিষ্ঠা	নগেন্দ্র নাথ মল্লিক	৬৩
বিরহোচ্ছ্বাস (পদ্য)	শ্রীমতি—	৬৮
চোর ধরা। (পদ্য)	সুরেন্দ্র নাথ রায়	৭০
প্রার্থনা (পদ্য)	দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন	৭৩
তুমি কে ?	ঐ	৭৩
কর্ম্মযোগ	অটল চন্দ্র নাথ	৭৭, ৯৯, ১২২, ১৭০
ুর (পদ্য)	সতীশ চন্দ্র বসু	৮৬
গবতত্ত্ব	বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৮, ১০৯, ১৪৯
দশ্য (পদ্য)	বসন্ত বিহারী সেন	৯৪
ক্ত (পদ্য)	ঐ	৯৭
দয়াময় (পদ্য)	সতীশ চন্দ্র বসু	১১৩
সধনা	নগেন্দ্র নাথ মল্লিক	১১৪

	লেখক	পত্রাঙ্ক
ৗরাঙ্গ (পদ্য)	সতীশ চন্দ্র বসু	১২১
গ্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ	হরি পদ ঘোষ	১২৭
রাধনা (পদ্য)	সুরেন্দ্র নাথ রায়	১৩০
়	শ্রীমতি—	১৩৩
গ্ন-শক্তি	দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন	১৩৬
ত কে ?	সতীশ চন্দ্র ়	১৪২
দাল গৌর (পদ্য)	ঐ	১৪৫
নের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি ?	শ্রীমতি—	১৪৬
্য-নারায়ণ		১৫৮
মন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব	অটল চন্দ্র নাথ	১৬০
পস (পদ্য)	কালী দাস দত্ত	১৬৭
য়া নাগবীব পদ	প্রাচীন	১৬৯
শ্রীরাধাগোবিন্দদর্শনে	অটল চন্দ্র নাথ	১৭৯
ঙ্গার স্নান মাহাত্ম্য	বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮১, ২১১
বিপদে মধুসূদন	সারদা চরণ মিত্র	১৮৮
শ্রীগৌরাঙ্গ (পদ্য)	প্রাচীন	১৯৩
প্রেমস্বরূপ ও প্রেমদাতা	শ্রীমতি—	১৯৪
বৈধব্য জীবন		১৯৮
দুঃখিতের বেদনা (পদ্য)	লক্ষ্মী নারায়ণ পাল	২০০
পৌত্তলিক বা প্রতিমা পূজা	ব্রজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য	২০৪
শ্রীগৌরাঙ্গ	দীনবন্ধু—	২১৭
ভক্তি-তত্ত্ব	দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন	২১৮, ২৪৯
যমুনা (পদ্য)	সতীশ চন্দ্র বসু	২২৩
সৌন্দর্য্য (পদ্য)	অটল চন্দ্র নাথ	২২৫
হিসাবের খাতা	কৃষ্ণকালী গুহ	২২৮
অর্জ্জুন মিশ্র	নগেন্দ্র নাথ মল্লিক	২৩৪
শ্রীগৌরাঙ্গ	প্রাচীন	২৪১
আমি কে ?	নরেন্দ্র নাথ মল্লিক	২৪২, ২৭০
ভিক্ষা (পদ্য)	হরিপদ চট্টোপাধ্যায়	২৪৭
গুহরাজ	নগেন্দ্র নাথ মল্লিক	২৫৭
নক্ষত্র (পদ্য)	শ্রীমতি—	২৬৲
বন্দনা।	শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন।	২৬৲
গুরু শিষ্য	বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬
শ্রীভাগবত-ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা	যতীন্দ্র নাথ মিত্র	২৭

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি। BR 479 10.8.1907

ভক্তি।

"ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎ কিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎসমম্॥"

—*—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

অজ্ঞান আঁধারময় আছিল নয়নদ্বয়,
জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলায়
করিলেন আলোকিত, শ্রীগুরো দয়ার্দ্রচিত,
প্রণিপাত করি তব পায়॥
অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্যাপি' বিশ্ব চরাচর
বিরাজেন বিভু দয়াময়।
তাঁহার চরণদ্বয় হেরি শ্রীগুরু কৃপায়
প্রণিপাত করি তব পায়॥
বড়ই পতিত আমি পতিতপাবন তুমি
গুরুদেব দীনের আশ্রয়।
দীনবন্ধো কর দয়া দাও দীনে পদছায়া,
প্রণিপাত করি তব পায়॥
করিতেছি অবিরত অপরাধ শত শত,
বেদনা দিতেছি তব পায়।
কি করিবে দয়াময়?— স্বগুণে সদয় হ
প্রণিপাত করি তব পায়॥

ভক্তি।

প্রাণের সমান ক'রে　　বড় ভালবাস মোরে
বুঝিয়া না বুঝে চিত তায়।
ঘুরিতেছি মোহবশে　　প্রেমডোরে বাঁধ ক'ষে,
প্রণিপাত করি তব পায়॥
প্রভু হে জগৎপতি　　তুমি অগতির গতি,
মোর গতি আর কিছু নাই।
এ চঞ্চল চিত মোর　　হ'ক এই ভাবে ভোর,
প্রণিপাত করি তব পায়॥
অন্ধের নয়ন তুমি　　কাঙ্গালের স্পর্শমণি
অজ্ঞানে করহে জ্ঞানময়।
সকলই করিতে পার　　শ্রীগুরো পরাৎপর;
প্রণিপাত করি তব পায়॥
প্রণিপাত করি পায়　　দাও ভিক্ষা দয়াময়
শ্রীচরণে মতি যেন রয়।
প্রেমে "ভক্তি" মিশাইয়ে　　শ্রীচরণে সমর্পিয়ে
প্রণিপাত করি তব পায়॥

শ্রীশ্রীতুলসী স্তোত্র।

নমস্তে শ্রীবৃন্দাদেবি নমঃ শ্রীতুলসি।　নমঃ নমঃ নমঃ দেবি কেশবপ্রেয়সি॥
বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনি নমঃ তোর পায়।　নমঃ সত্যবতি মাগো ভক্তি দে আমায়
জগৎপাবনি মাগো জগন্নিস্তারিণি।　তুমি মা জগজ্জীবের মোক্ষবিধায়িনী॥
শিখাই'ছ কৃষ্ণপ্রেম জগত জনায়।　নমঃ সত্যবতি মাগো ভক্তি দে আমায়।
নিজ অঙ্গ 'পত্র' কৃষ্ণসেবার কারণ।　অকাতরে কৃষ্ণভক্তে কর সমর্পণ॥
দেহ দিয়া সাজাই'ছ ভকত জনায়।　নমঃ সত্যবতি মাগো ভক্তি দে আমায়
কেশবচরণে মাগো সদা তোর স্থিতি।　কেশব তোমার গতি তোতে তাঁর প্রীতি
দয়াময়ি দয়ালেশ কর মা আমায়।　নমঃ সত্যবতি মাগো ভক্তি দে আমায়।

ভক্তি।

তুমি যে সকল দ্রব্য কর মা স্পর্শন। প্রেমভরে শ্রীকৃষ্ণ তা' করেন গ্রহণ॥
সযতনে অঙ্গে তাই রেখেছি তোমায়। নমঃ সত্যবতি মাগো ভক্তি দে আমায়॥
নমস্তে তুলসি কর আশিষ আমায়। তুলসীভূষিত কণ্ঠ কৃষ্ণনাম গায়॥
তুলসীর মালা কর কবে মা ধারণ। মন যেন করে ধ্যান শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥

চিররুগ্নের চিন্তা।

আজ পাঁচ মাস অতীত হইল আমি পীড়িত, এই কয় মাস আমার ক্ষে যেন কত বৎসর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই জন্যই আজ আমি ঠিকবৃন্দের নিকট আমাকে চিররুগ্ন বলিয়া পরিচয় দিতেছি। এই ড়ায় মন হইতে আমার আশা ভরসা সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রীভগ-ন মঙ্গলময়, আমার শ্রেয়ঃ কি তিনিই জানেন, আমি যদি তাহা সৌ-গ্যক্রমে জানিতাম তবে ওরূপ নিরাশ হইতাম না। আশা আমার র্থিব সুখের দিকে ধাবিত, অথবা যদি তাহা কর্ত্তব্য সাধনের স্তরায় ছিলনা তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি কর্ত্তৃত্বাভিমানে পূর্ণ ছিলাম, বা আমার মনে দুঃখ হয় কেন? আমিত এখন দৈহিক বিশেষ ণা ভোগ করিতেছি না। বৈকাল বেলা একটু একটু জ্বর হয়, আর শী আছে, তাহাতে অবশ্য অধিক কোন কষ্ট বোধ হয় না; তবে রে বল নাই, স্বাস্থ্য নাই, সবল ব্যক্তির ন্যায় চলিতে হাঁটিতে র না। ঔষধ সেবন করি, খাই দাই, একটু আধটু চলিয়া ফিরিয়া াই, মধ্যে মধ্যে বা পুস্তক দেখি। কিন্তু ইহার মধ্যে মনে কত ন্তা আইসে, কত অগণ্য চিন্তা! আমি দার্শনিক নহি তবুও সেই ল ভাবনা স্রোতে কখনও কখনও ভাসিয়া যাই, কখনও বা তাহার ল জলে ডুবি। এক এক দিন নিজকে আমি এত দুর্ব্বল মনে রি, এক এক দিন নিশীথে বক্ষের ভিতর কেমন এক প্রকার কষ্ট নুভব হয়, মনে হয় যেন আমি জগৎ ছাড়া হইয়াছি, সংসারে হাকেও আপন দেখিতে পাই না, যাহারা আমাকে কত স্নেহ

করে, আমি যাহাদের ভালবাসি বা ভক্তি করি, সকলকেই বন্ধনের কারণ বলিয়া মনে হয়! আমি যেন একা! মরণ বাঁচনে আমি উদাসীন! যে সকল আশা আমি এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, সে সকলের চরিতার্থতা সম্পাদনেও আমি বীতস্পৃহ! আজ আমার কিছুই ভাল লাগে না; হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি তুল্য। চিন্তা আমার মন হইতে ক্ষণেকের নিমিত্ত অবসর গ্রহণ করিল, তখন এক জনকে মনে পড়িল। চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ। কতক ক্ষণ অতীত,— এই বিপদ সময়ে একজন আমার স্মৃতিপথে উদয় হইলেন। তিনি বড় প্রাণারাম বস্ত---শান্তিদাতা—প্রেমময়। তাঁহার স্মরণেই আমার হৃদয়ের ভাব সকল পরিবর্ত্তিত হইল। মরীচিকাময় মরুভূমি স্রোতস্বতীর কল কল ধ্বনি, হিংস্র জন্তু পূর্ণ নিবিড় অরণ্যানী নন্দন কাননে পরিণত। দয়াময়! আর তুমি আমার হৃদয় ছাড়া হইও না তুমি আমাদের হৃদয়ের ধন, হায়! তোমাকেই আমরা ভুলিয়া থাকি একি সাধারণ মোহ! যিনি আমার, তাঁহাকে পর ভাবায়; আর যাহারা পর, শুধু পর নয়, যাহারা সেই শ্রীভগবানকে পাইবার অন্তরায় তাহাদিগকে আপনার সামগ্রী বলিয়া দৃঢ় ধারণা জন্মাইয়া দেয়! যেমন কীট পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণা পাইয়াও অগ্নিতে পতিত হইতে যায়, আমাদেরও সেই দশা। জানি বিষয়সুখ প্রকৃত সুখ নয়, চক্ষের সম্মুখে অগণ্য দৃষ্টান্ত দেখিতেছি; তথাপি জ্ঞান হয় না কেন? হায়! আমার জ্ঞান যে মায়াকর্ত্তৃক আচ্ছন্ন, কেমনে সেই কুহকিনীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়? মনেই উত্তর পাইলাম "সাধনা কর"। প্রশ্ন, সাধনার উদ্দেশ্য কি? উত্তর, শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা। অর্থাৎ শ্রীভগবানের হও তাহা হইলে আর মায়া হইতে তোমার কোন ভয় থাকিবে না! তোমার মনে শ্রীভগবানে কিছু ভক্তি থাকিতে পারে, কখনও বা সেই ভক্তি-উদ্দীপনা হেতু আনন্দ পাইতে পার, কিন্তু সেই আনন্দ এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, কেনন

তোমার ভক্তি এখনও অসম্পূর্ণ আছে। সেইজন্য বিষয়ানন্দ হইতে সেই পরাভক্তি নিঃসৃত আনন্দের ঔৎকর্ষ হৃদয়ে ধারণা করিতে পার নাই, কাজেই পুনরায় বিষয়সুখে আকৃষ্ট হও। এখন তোমার কর্ত্তব্য ভালবাসা শ্রীভগবানে অর্পণ করা। তাহার প্রকরণ বলিলেছি শুন। দেখ, আমরা বুঝিনা কেন বড়ই আশ্চর্য্য। প্রথম, শ্রীভগবান আছেন এই মনে বিশ্বাস থাকার প্রয়োজন, নতুবা তুমি ভালবাসিবে কাহাকে? বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ারও প্রয়োজন, কেমন করিয়া সেই বিশ্বাস অটল রাখিতে হইবে তাহারও প্রকরণ ক্রমেই বলিতেছি। যখন বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া মানব যৌবনে পদার্পণ করে, তখন নরনারীহৃদয়ে স্বতঃই ভালবাসার স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। এই ভালবাসা অথবা প্রেমরূপ গঙ্গাদেবীর উৎপত্তিস্থল শ্রীভগবানের পাদপদ্ম। সর্ব্ব জীব-হৃদয়েই দেবী বিরাজমান থাকিয়া জীবকে সেই প্রেমময়ের চরণে আকর্ষণ করিতেছেন। জ্ঞানী হউন, কর্ম্মী হউন, ভালবাসা সর্ব্বঘটে, প্রেমের স্রোত সকলের হৃদয়ে বহমান। তাহা না হইলে আজ জগত-সংসার শ্মশান হইত, প্রকৃতি বিভীষিকা মূর্ত্তি ধারণ করিত। মনুষ্য-হৃদয়ে এই প্রেম যৌবন সময়ে সম্পূর্ণ বিকসিত। একজনকে যেন ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। যৌবন সেই নিমিত্ত অতীব সঙ্কটসময়। কাহাকে তোমার হৃদয় দান করিতে যাও? কাহাকে তোমার প্রেম রত্ন বিলাইতে যাও? সাবধান জীব! তোমার মন পূর্ব্বে পরীক্ষা কর, তাহা স্বার্থপর কিনা। তুমি প্রেমের বিনিময় চাও কিনা! পরীক্ষা করিও, তুমি যাহার সহিত হৃদয় বিনিময় করিবে, তোমার হৃদয়ে তাহার হৃদয়ে মিলে কিনা। একটু স্থির হইয়া চিন্তা কর কাহাকে তোমার হৃদয়ধন সমর্পণ করিবে। আরও চিন্তা করিও তোমার ভালবাসা কোন শক্তিতে প্রস্ফুটিত; এতদিন কাহার যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছ; কে তোমায় ক্ষুধায় এতদিন আহার দিয়া আসিতেছেন; কে তোমায় পিপাসায় সুশীতল বারিদানে তোমার তৃষ্ণা দূর করিতেছেন

তিনি কি তোমার কাছে কিছু বিনিময় পাইয়াছেন, তোমার কি সেই উপকারকর্ত্তার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয়, তাঁহার এই অযাচিত ভাবে প্রেমদানের পরিবর্ত্তে তুমিকি সেই দয়াময়কে কিছু ভালবাসিতে পারনা? তবে তুমি আবার ভালবাসিতে শিখিয়াছ কি? তোমার ভালবাসাই বা কি? তুমি আবার প্রেমিক কি? এখনও তোমার শিক্ষার অনেক বাকী আছে। অপেক্ষা কর, অধৈর্য্য হইও না। কু-প্রবৃত্তি তোমার শত্রু, রিপুগণ তোমার নরকের দ্বার; তাহাদের চরিতার্থতায় যদি ব্যস্ত হইয়া থাক, হইতে পারে। সেই কারণ স্ত্রী কি তোমার ভালবাসার পাত্রী হইবে? সে তোমার এত কি উপকার করিল? তাহার সহিত কয়দিন হইল তোমার পরিচয় হইয়াছে? এই কয়দিনে তোমার এত ভালবাসা জন্মিল কিরূপে? বুঝেছি তোমার ভালবাসা মোহজ। স্ত্রীর প্রতি তোমার যে মানসিক বৃত্তি তাহা ভালবাসা-পদ-বাচ্য হইতে পারে না, কেননা ভালবাসার সহিত মায়া অথবা মোহের কোন সম্বন্ধ নাই। বৈদান্তিক জ্ঞানে তোমার একথা বিশ্বাস না হইতে পারে কিন্তু তুমি যদি ভক্তিযোগী হও তবে তোমা একটী দৃষ্টান্ত দিয়া ঐ বিষয় বুঝাইতে পারি। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিদায় গ্রহণ করিবার কালে কোনরূপ সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না, সেই সময় তিনি প্রিয়াজীর সমস্ত মায়া অপ-হরণ করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি দেখাইলেন। দেবী তখন সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিলেন, "কে আপনি যদি আমার স্বামী হন তাহা হইলে আমি আপনাকে প্রণাম করি"। দেখ, বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামীর প্রতি যে প্রেম, মায়ার আশ্রয় ত্যাগ করিয়াও তাহা অক্ষুণ্ণ রহিল। সুতরাং ভালবাসা বা প্রেমের মায়ার সহিত কোন সংস্রব নাই।

শ্রীভগবানই আমাদের প্রকৃত নিজজন তাঁহাকেই ভালবাসিতে যত্ন কর, তাঁহার নিকট ভালবাসা শিক্ষাকর। তোমার পত্নী তোমাকে ভালবাসেন, তোমার জননী তোমাকে স্নেহ করেন, জানিও, সকলে

ভগবচ্ছক্তিতে চালিত। শ্রীভগবানকে ভালবাস সকলকে ভালবাসিতে পারিবে। শুধু তোমার স্ত্রীকে কেন বন্ধুকে কেন? প্রত্যেক জীবে তুমি ভগবৎসত্তা অনুভব করিয়া প্রত্যেক প্রাণীকে তুমি প্রেম করিতে পারিবে। ভগবদ্ভাব বিবর্জ্জিত হইয়া উহাদিগের উপর প্রীতি স্থাপন করিলে শ্রীভগবান হইতে অনেক দূরে যাইয়া পড়িবে। অথচ শ্রী-ভগবানকে ভাল বাসিতে তোমার কোন ক্ষতি নাই, তুমি স্ত্রীকে ভালবাস, পুত্র কন্যাকে স্নেহ কর, বিষয় ভোগ কর, প্রেমময় তোমায় নিষেধ করিতেছেন না। যদি বল শ্রীভগবানকে দেখিতে পাইনা, না দেখিলে কেমন করিয়া ভালবাসিব? তোমার কল্পিত ভালবাসা কত ভ্রমপূর্ণ তাহা বলা যায় না। একটা কথা বলিয়া রাখি যে যতদিন না তুমি শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে পার ততদিন জীবকে ভাল বাসিতে পারনা। সেই প্রেমময়ে অনিবেদিত যে ভালবাসা তাহা পবিত্র নয়। দেহাভিমানী মানবের ভালবাসা কখনও নির্ম্মল হইতে পারেনা। ভালবাসিয়া যদি বিমল আনন্দ পাইতে চাও, তবে পূর্ব্বে তাহা নির্ম্মল ও পবিত্র কর। তোমার প্রেম পূর্ব্বে শ্রীভগবানকে নিবেদন কর, তাহার পর জীবকে তাহা প্রসাদ স্বরূপ দাও। শ্রীভগবানে অনর্পিত যে ভালবাসা তাহাতে মোহ থাকার কারণে দুঃখের ও কষ্টের হেতু মাত্র হয়। প্রকৃত ভালবাসাতে দুঃখ নাই, প্রেমে কেবলই প্রীতি ও আনন্দ। ভালবাসার মিলনেও সুখ, বিরহেও সুখ। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে কৃষ্ণ বিরহে ক্রন্দন করিতেন তাহাকে কি দুঃখ বলিয়া মনে করিতে পার? একথা ক্রমশই বুঝিবে এখন ইহার আলোচনা থাকুক। পূর্ব্বের কথা হউক, তুমি বলিতেছিলে, না দেখিলে কেমন করিয়া ভালবাসিবে। এখন মনে কর তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাস। তুমি যদি তাহার রূপ দেখিয়া ভালবাস তবে তোমার সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়। কেননা সৌন্দর্য্যত আর চিরস্থায়ী নয়, সুতরাং তাহা ফুরাইয়া যাইলে সঙ্গে সঙ্গে

তোমার ভালবাসাও ফুরাইবে। যে ভালবাসা এইরূপ অনিত্য তাহাকে কেমন করিয়া ভালবাসা বলিব ? প্রেম নিত্য ও চিরস্থায়ী; তোমার ভালবাসা যদি গুণজ হয়, তবে তুমিত গুণগুলি দেখিতে পাও না ; তোমার স্ত্রীর কার্য্যদ্বারা সেই সকল গুণের বিদ্যমানতা স্বীকার কর, কিন্তু তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করনা। তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে তুমি তোমার স্ত্রীর শরীর অপেক্ষা গুণগুলিকে ভালবাস ; শরীর সেই সকল গুণের স্থূল আধার বলিয়া কিছু ভালবাসিতে পার, কিন্তু তাহাও দেহাভিমানিত্বের পরিচয়। এখন শ্রীভগবানের কার্য্য দ্বারা তোমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা প্রত্যক্ষ কর। জীবনে কি তোমার এমন কোন বিপদ ঘটে নাই যাহা হইতে তুমি অলৌকিকভাবে উত্তীর্ণ হইয়াগিয়াছ। শ্রীভগবান এইরূপে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদিগের কত যে উপকার সাধন করিতেছেন তাহার কি সংখ্যা আছে? ভাব দেখি তিনি তোমায় কত ভালবাসেন! মনে করিতে পার, তোমার স্ত্রী তোমায় ভালবাসেন, তোমার বন্ধু তোমায় ভালবাসেন, কিন্তু সেই প্রেমময় তোমায় যেমন ভালবাসেন আর কাহারও সেইরূপ ভালবাসিবার সাধ্য নাই। তুমি তাহা কি বুঝিবে! সেই শ্রীভগবানের মত প্রেমিক হইতে পারিলে তবে বুঝিতে পার। তবে তাঁহার প্রেমের কার্য্য দেখ। তিনি তোমার গলা ধরিয়া মুখে বলেন না "আমি তোমায় বড় ভালবাসি"। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি পলে তিনি তোমার মঙ্গল সাধনে রত। তাঁহার নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই। তুমি শ্রীগুরুদেবকে দুইদণ্ড বীজন করিবে তাহাও হয়ত বিরক্তির সহিত করিতেছ। কিন্তু সেই দয়াময়ের তোমার নিমিত্ত বিশ্রামের অবকাশ নাই। জানত কত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে। ভক্তের ক্ষুধার অন্ন শ্রীভগবান স্বয়ং মস্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। ভক্তের সহিত একত্র শ্রীভগবান বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতেছেন, ভক্তের রথের সারথ্য পর্য্যন্ত শ্রীভগবান করিয়াছেন। এমন প্রেমের বিনিময় কেহ

কখন কি জীবের নিকট পাইয়াছে? যদি ভাল বাসিতে চাও, শ্রীভগবানকে ভালবাস, যদি ভালবাসিয়া আনন্দ পাইতে চাও, সংসার যন্ত্রণা তুচ্ছ করিতে চাও, দুর্জ্জয় রিপুগণকে জয় করিতে চাও, কুহকিনী মায়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে চাও, তবে শ্রীভগবানকে ভালবাস তাঁহার প্রেম ঢোকে ঢোকে পান করিয়া চিরন্তন আনন্দ সম্ভোগ কর।

পূর্ব্বে, সাধনার উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে এক্ষণে সাধনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে পর্য্যালোচনা করা যাউক। আর একটি প্রশ্ন উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা এই, সাধনা কাহাকে বলে? উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন এই দুই পদের অভিধানোক্ত বিশেষ বিভিন্নতা না থাকিলেও উক্ত পদদ্বয়ের মুখ্য ও গৌণত্ব ব্যাপারে কিছু পার্থক্য দৃস্ট হয়। সাধনার উদ্দেশ্য শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা, আর সাধনার প্রয়োজন আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের অপনোদন করা। শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা মুখ্য প্রয়োজন আর ত্রিবিধ দুঃখের অপনোদন করা গৌণ প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের নিরাকরণ করিবার প্রয়াসকে সাধনা বলে। যখন জীব উক্ত ত্রিবিধ দুঃখে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া প্রকৃত সুখান্বেষণেচ্ছু হয়; যখন বুঝে বিষয়-সুখ প্রকৃত সুখ নয় এবং পূর্ব্ব দুর্ব্বুদ্ধিতার নিমিত্ত অনুতাপ করে, তখন হইতেই জীব সাধনার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করে। সুখপ্রাপ্তি-কামনা জীবের একটি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি। অথচ প্রকৃত সুখ—যাহা লাভ করিলে অপর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা থাকেনা, যাহার আদিতে আনন্দ, মধ্যেতে আনন্দ ও পরিণামে আনন্দ—কিছু দুর্লভ। এবং দুর্লভ বস্তুই আমাদের প্রিয় হয়। মণি মাণিক্য দুর্লভ বলিয়াই তাহাদের এত আদর; হিংস্র জন্তুপূর্ণ অতলস্পর্শী মহাজলধি হইতে রত্ন সংগ্রহ করিতে হয় এদিকে বিষয়সুখ আমাদিগকে ধাঁধার ভিতরে ফেলে, আমরা কোনও একটা

সুখের ছবি দেখিবা মাত্র ভুলিয়া যাই। বিবেচনা করি না যে সেই সুখের পরিণাম কি। আমাদের ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে, কেন না মানব ভ্রান্তিশীল, ভ্রান্তি আমাদের স্বভাবের এক ধর্ম্ম। কিন্তু এই বিষম ভ্রম আমাদের পরিত্যজ্য। যাহা আমাদিগের নানা প্রকার দুঃখ ও অশান্তির কারণ, যাহা সেই নিরবচ্ছিন্ন বিমল আনন্দপ্রাপ্তির বিঘ্ন-স্বরূপ, সেই ভ্রমকে মনমধ্যে স্থান দিয়া আমরা কত কাল আর এই-অন্ধকারের ভিতর থাকিব, কত কাল আর জ্বালা যন্ত্রণায় হা হুতাশ করিব? বিষয়-সুখে আমরা সহজে আকৃষ্ট হই, তাহার আরও একটি কারণ এই যে, ইহা অল্পায়াস সাধ্য। তাহাত হইবেই, শ্রুতি বলিতেছেন,—

"নহ্যেতস্যানন্দস্য মাত্রামুপজীবন্তি বাহ্যাঃ"

সাংসারিক ভোগসুখ সেই চিরন্তন আনন্দের সহস্রাংশের এক কণিকা-মাত্রও নয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সুখপ্রাপ্তিকামনা জীবের একটী স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি আবার সাংখ্যসূত্র দেখ,—

"ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ"

সুতরাং আমাদের এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম পরম-পুরুষার্থ, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের নিরাকরণ করিতে পারিলেই আমরা পরমা শান্তি লাভ করিতে পারি। এবং এই পরা শান্তি প্রাপ্ত হইবার জন্য আমাদের যত্ন হওয়ার প্রয়োজন। অর্থ দান করিয়া এই সুখ মিলে না, বিষয় সম্ভোগ করিয়া এই আনন্দ প্রাপ্ত হইবার নয়; তবে তুমি কেমন করিয়া সেই শান্তিদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিবে? তোমার আছে কি? তোমার যাহা আছে তাহা লইয়া তুমিত সুখী ইতে পারিবে না! তবে কি শ্রীভগবান তোমাকে এমনই কতকগুলি ও দিয়াছেন, এমনই কতকগুলি ইন্দ্রিয় দিয়াছেন যাহারা সেই

দয়াময়কে সম্ভোগ করিবার অন্তরায়? তাহা ভাবিও না; সেই দয়াময়কে এত নিষ্ঠুর মনে করিও না। তবে তিনি বড় রসিক, তাঁহার রসিকতা তুমি বুঝিতে পার নাই, তোমাকে তিনি বড় ঠকাইয়াছেন, বিষয়সুখ দেখাইয়া তোমায় ভুলাইয়াছেন! মন, আর ভ্রমে থাকিও না, আর তাঁহার চতুরতায় প্রতারিত হইও না তোমার ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ভোগে না রাখিয়া সেই হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত কর, তোমার মনোবৃত্তিসকল শ্রীভগবানের চরণে উৎসর্গ কর। তবেই তোমার আর কোন অভাব রহিবে না, বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া আর তোমায় ছট্ ফট্ করিতে হইবে না। আমার কথা শুন, আর বিলম্ব করিও না, তোমার অনেক শত্রু আছে; যদি তাহারা বাদ সাধে তাহা হইলে আবার বিপদ।

"চিররুগ্নের চিন্তা" এবার এই পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল। মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছা হইলে বারান্তরে অবশিষ্ট অংশ বাহির হইবে।

ভক্তের ভগবান।

দীনবন্ধু দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু দীনহীন পতিত কাঙালগণকে উদ্ধার করিবার জন্য কাঙাল সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন এবং তীর্থপর্য্যটনচ্ছলে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ ভট্টমারি গ্রামে ভাগ্যবান বঙ্কটভট্ট মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কটভট্টের পুত্র শ্রীগোপালভট্ট। গোপালভট্ট বালক, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি, তিনি সর্ব্বদাই কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুর সেবা কামনা করিতেন। ভগবান দয়াময়, ভগবান ভক্তবৎসল, তাই বালক গোপালভট্টের নিকট স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। গোপাল ভট্টের আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি প্রাণ খুলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সেবায় নিরত হইলেন। প্রভুও তাঁহার ভক্তিগুণে আবদ্ধ হইয়া চারি মাস তথায় অবস্থান করতঃ শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাকে হরিনাম মহামন্ত্র দান

করিলেন। "ধন্য গোপাল ভট্ট! ধন্য তোমার ভক্তি! তোমার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য প্রভু নীলাচল হইতে তোমার নিকটে আসিলেন। গুরুদেব! আমি বড়ই পাষণ্ড, তোমার শক্তি পাইয়াও তোমাকে চিনিতে পারিলাম না; সর্ব্বদা বিষয়ে মত্ত থাকিয়া তোমাকে ভুলিয়া রহিলাম! প্রভো! তুমিত দয়াময়, তুমিত দীনবন্ধু—নিজগুণে আমায় দয়া কর—প্রভো! দাও আমায় সেই ভাব, তোমার শ্রীচরণে যেন অবিচলিত ভক্তি থাকে! দেখ' প্রভো, পতিতপাবন নামে যেন কলঙ্ক হয়না!

গোপাল ভট্ট এইরূপে প্রভুর কৃপালাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইলেন। আর তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখে কে? বিষয়, তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও গোপাল ভট্টকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না! যাঁহার প্রাণে একবার শ্রীভগবানের প্রেমানন্দ লাগিয়াছে, যাঁহাকে ভগবান দয়া করিয়া শ্রীচরণে আকর্ষণ করিয়াছেন তাঁহার নিকট তুচ্ছ বিষয়ের প্রলোভন, তুচ্ছ পিতামাতার স্নেহবন্ধন, তুচ্ছ কামিনীর মনোমুগ্ধকারিণী মোহিনী শক্তি, তুচ্ছ বন্ধুবান্ধবের মমতা, গোপালভট্ট তাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করতঃ প্রেমে বিভোর হইয়া শালগ্রামরূপী নারায়ণের সেবায় ব্যাপৃত হইলেন।

একদিন কোনও ধনী শ্রীবৃন্দাবনে বিগ্রহ দর্শনে আসিয়াছিলেন; তিনি আনন্দিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার শ্রীবিগ্রহের সেবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে প্রেরণ করিলেন এইরূপে গোপালভট্টের শালগ্রামের সম্মুখেও নানাবিধ দ্রব্য উপনীত হইল। গোপালভট্ট দেখিয়াই প্রেমে পুলকিত;— এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন;—নয়নে প্রেমধারা, সর্ব্বাঙ্গে পুলক, বদনে সুমধুর হাস্য; ভট্ট একবার অলঙ্কার প্রভৃতির দিকে চাহিতেছেন আবার প্রেমভরে শ্রীবিগ্রহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, বড়ই বাসনা মদনমোহনকে মোহন বেশে

সাজাইবেন। পুনঃ পুনঃ মনে করিতেছেন আহা ! আমার শালগ্রামের যদি হস্তপদাদি অবয়ব থাকিত !—আর নয়ন জলে ভাসিতেছেন !”

ভক্তের ভগবান ভক্তের জন্য কি না করিতে পারেন ? যিনি দ্রৌপদীর জন্য বস্ত্রাকার ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি স্তম্ভের ভিতর হইতে নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া প্রহ্লাদকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, যিনি মোহন মূর্ত্তিতে উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষিতকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ভক্ত গোপাল ভট্টের প্রেমে তিনি স্থির থাকিবেন কেমন করিয়া? ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের মনোরথ পূর্ণ না করিয়া থাকিবেন কিরূপে? শালগ্রাম টলিলেন—,তাহার মধ্য হইতে ইন্দীবরশ্যাম ত্রিভঙ্গ মুরলীধর আবির্ভূত হইলেন। ভট্ট প্রেমে অধীর হইলেন—নয়নে গঙ্গা যমুনা প্রবাহিত হইল—সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত—মুখে অট্ট অট্ট হাস—ভক্ত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

ভক্ত, তুমিই ধন্য ! ধন্য তোমার শক্তি ! সর্ব্বশক্তিমান্ ভববন্ধনহারী হরি তোমার প্রেমে বাঁধা ; যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, যাঁর শক্তিতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত, তিনি আজ তোমার ইচ্ছায় নাচিতেছেন, তোমার ইচ্ছায় সাজিতেছেন,—তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই করিতেছেন। কেনই বা না হইবে ? তুমি যে প্রাণ মন সকলই তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছ,—তিনি প্রেমময় হইয়া তোমাকে আত্মার্পণ না করিবেন কেন ? ভক্ত তোমার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ! আমি বড়ই কাঙাল, কণামাত্র ভাব আমায় দাও,—শিখায়ে দাও, কেমন করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। মন বুঝিয়াও বুঝেনা। মন সুখ চায়, মন আনন্দ চায়, কিন্তু সুখের পথ জানিয়াও সে পথে চলিবে না। ভক্ত, নিজগুণে দয়া কর,—তোমার দাস হইয়া কৃষ্ণসেবার আয়োজন করিয়া দিব।

ভট্ট উঠিলেন, সেই পরিচ্ছদাদি লইয়া ভগবানের শ্রীঅঙ্গে পরাইতে

লাগিলেন। শ্রীভগবান শ্যামরূপে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া,—আর তিনি এক এক খানি অলঙ্কার এক এক অঙ্গে পরাইতেছেন ও এক এক বার তাঁহার দিকে যেমন চাহিতেছেন অমনি তাঁহার আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। আজ ভক্ত গোপালভট্টের প্রাণে কি আনন্দ! দয়াময় নিজে মদনমোহনরূপে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—আর তিনি মনের সাধে সাজাইতেছেন। ইহাতে তাঁহার কামনা নাই ভক্ত শুধু দেখিতেছেন আব তাঁহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব তোমরা কি এই আনন্দ দিতে পার? বোধ হয় পার না; তাহা হইলে ভক্ত শ্রীভগবানের জন্য এত ব্যাকুল হইত না।

দয়াময়! তোমার লীলা তুমিই জান। ভক্তের মনের ভাব তুমিই জান। তাই ভক্তকে আনন্দ দিবার জন্য আজ শিলার ভিতর হইতে নটবর শ্যামরূপে দণ্ডায়মান।

দয়াময়, আমি অতি নরাধম, শুধু বিষয় গঞ্জনা ভোগ করিতে করিতে জীবন কাটাইলাম। তোমাকে সাজাইবার জন্য আমার কি কখনও বাসনা হইবে না? না হউক প্রভো! বামনের চাঁদ ধরিবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র! প্রভো, তুমি দয়াময় দয়া করিয়া এই কর, যেন তোমার ভক্তের দাসানুদাস হইয়া সেবার আয়োজন করিয়া দিতে পারি, দাও নাথ, সেই প্রবৃত্তি যেন তোমার সেবার জন্য তুলসী প্রভৃতি চয়ন করিতে যাই—যেন পুষ্পাহরণ করিয়া তোমার জন্য মালা গাঁথিয়া দিই—যেন তোমার অঙ্গানুলেপনের জন্য চন্দনাদি প্রস্তুত করিয়া দিই।

—*—

প্রাণের কথা।

১। বিষয় ভোগে যে আনন্দ পাওয়া যায় বিষয় পরিত্যাগ করিলে, বিষয়ভোগ হইতে বিরত হইলে—সংযত হইলে তদধিক আনন্দ

লাভ হইয়া থাকে।

২। একবার যদি ভগবানকে বাঁধিতে পার, একবার যদি তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে আর কিছুরই অভাব থাকিবে না। ভাবময় সকল অভাব পূর্ণ করিবেন, যে কোনও সন্দেহ হৃদয়ে উপস্থিত হউক না কেন, জ্ঞানময় অন্তর্যামী রূপে সকল সন্দেহই নিরসন করিবেন।

৩। ভগবদুপাসনার কালাকাল নাই; তবে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে নিয়মিতরূপে ভগদুপাসনা একান্ত কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা তাঁহার ভাবে থাকিতে পারিলেই ভাল, কারণ কখন মৃত্যু উপস্থিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয় নাই। আর ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ;
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥

অর্থাৎ যে অন্তকালে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে সে সদা তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া সেই তত্ত্বকে পাইয়া থাকে। (যেমন ভরত ঋষি মৃত্যুকালে মৃগভাব চিন্তা করিয়া দেহান্তে মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)।

অতএব সর্ব্বদাই আমাকে স্মরণ কর, এবং স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হও; এইরূপে আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পিত হইলে নিঃসন্দেহ আমাকে লাভ করিবে।

৪। "প্রাণের ভাব হইলে উপাসনা করিব"—এরূপ বলা সম্পূর্ণ মূর্খতা। কার্য্য কর, উপাসনা কর; উপাসনা ব্যতীত ভাব আসিবে না। শ্রীগুরুদেবের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া যাও। দুই পাঁচ দিবস আনন্দ না পাও, দুই পাঁচ দিন হৃদয়ে ভাব না

আসুক, তাহাতে কি হইবে? শ্রীগুরুবাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় রাখিয়া চিত্তের একাগ্রতার সহিত তাঁহার আদেশ অনুসারে নিয়মিতরূপে কার্য্য কর, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রত্যহ উপাসনা কর, শ্রীগুরুকৃপায় হৃদয়ে ভাবের উদয় হইবে, আনন্দ পাইবে। হতাশ হইও না।

৫। আমরা যে সংসার স্রোতে পড়িয়াছি যদি অলস হইয়া তাহাতে গা ঢালিয়া দিই, তাহা হইলে যে কোন পাপসাগরে ভাসিয়া যাইব তাহার স্থিরতা নাই। আমরা এক্ষণে যে অবস্থায় পড়িয়াছি তাহাতে যদি কিছুমাত্র উন্নত না হইয়াও কেবল মাত্র আমাদের স্বীয় পদবী অর্থাৎ মনুষ্যত্ব অব্যাহতভাবে রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই পরম লাভ। কিন্তু এ সময় ভগবদুপাসনারূপ দৃঢ় রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরিয়া না থাকিলে মনুষ্যত্ব রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং বড়ই দুষ্কর। ভগবানকে ডাকিতে ভুলিও না।

৬। সাধারণতঃ জানিবে, যে কর্ম্ম করিতে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় যে কর্ম্ম প্রকাশ্যে করা যায় না, গুরুজনকে লুকাইয়া যে কর্ম্ম করিতে হয়, যাহা করিলে অনুতাপ হয়, যে কর্ম্ম সকলের সমক্ষে প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করা যায় না তাহাই পাপ কর্ম্ম।

৭। স্বর্ণ যেমন অগ্নি-সংস্কারিত হইলে শ্যামিকা দোষ শূন্য হইয়া নির্ম্মল হয়, সেইরূপ ভক্তসংসর্গে চিত্তের মলিনতা ও বিরুদ্ধভাব দূরীভূত হয় এবং ভগবদ্ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

৮। ভগবদুপাসনা আমাদিগের কর্ত্তব্য কিনা, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করা, তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া থাকা উচিত কিনা, এ বিষয় আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ভক্তগণ ভগবানের উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া কি অসীম, বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন কেবল ইহা দর্শন করিয়াই ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করা কর্ত্তব্য, যে হেতু আমরা সর্ব্বথা সুখৈষী।

ভারতে বর্ণভেদ।

ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের মধ্যে বর্ণভেদ প্রসিদ্ধ। এই বর্ণভেদ প্রথমতঃ কি জন্য হইয়াছিল এবং এক্ষণে কি ভাবে পরিণত হইয়াছে তাহা সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে অনেক ভ্রান্তিমূলক সংস্কার দূর হইতে পারে। এই বিষয়টী যথাসাধ্য বিশদভাবে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমত দেখা যা'ক বর্ণভেদ কি কারণে আবশ্যক। কার্য্য-বিভাগ ব্যতীত যে মানব সমাজের উন্নতি হইতে পারে না, তাহা এক্ষণে সামাজিক বিজ্ঞানের একটী স্থির সিদ্ধান্ত। একজন লোক নিজে কৃষী, বণিক, ধর্ম্ম-প্রচারক ও যোদ্ধা ইত্যাদি সকল ব্যবসায়ী হইতে পারে না, এবং সর্ব্ব প্রকারের নৈপুণ্য লাভ করিতে পারাও তাহার পক্ষে সম্ভব নহে এবং করিতে পারিলেও তাহা লাভ করিবার অবসর হয় না। কৃষিকার্য্যের দ্বারা শস্য উৎপাদন না করিলে উদরপূর্ত্তি এবং জীবন রক্ষা হইতে পারে না। তজ্জন্য কৃষিকার্য্য সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কিন্তু সকল প্রকার আবশ্যকীয় শস্য ত এক স্থানে বা এক দেশে জন্মে না। তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং দেশ দেশান্তরে গমন করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, তথা হইতে আবশ্যকীয় শস্য ক্রয় করিবার উপযোগী সঞ্চিত অর্থেরও প্রয়োজন। সুচারুরূপে কৃষিকার্য্য করিতে হইলে প্রায় সম্বৎসরই সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। দীর্ঘ কালের জন্য স্থানান্তরে যাওয়া কৃষকের পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে। এই কারণেই কৃষিজীবী ও বণিক সকল সমাজেই দৃষ্ট হয়।

সমাজের জীবিকা ও বিলাসিতা উক্ত দুইটি শ্রেণীর লোকের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক সম্বন্ধে শান্তি রক্ষার জন্য আর এক শ্রেণীর লোকের নিতান্ত আবশ্যক। সমাজের মধ্যে দুষ্ট লোক শিষ্টের উপর অত্যাচার, এবং এক সমাজের লোক অন্য সমাজের লোকের উপর শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে। ঐ

দুই প্রকার অহিতাচরণ নিবারণজন্য বলবীর্য্যশালী অস্ত্রশস্ত্রাদি চালনে নিপুণ লোকের প্রয়োজন।

পার্থিব সম্বন্ধে, এই তিন শ্রেণীর লোকের দ্বারা সমাজের কার্য্য একপ্রকার নিষ্পন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহা সুচারুরূপে হয় না। নীতি ও দর্শনশাস্ত্র ব্যতীত কোন সমাজ রক্ষা হইতে পারে না। কি কৃষিকর্ম্ম, কি বাণিজ্য, কি শাসনকার্য্য, প্রত্যেক সম্বন্ধেই দর্শনের আবশ্যক। কোন বীজ, কোন সময়ে, কিরূপ ক্ষেত্রে, বপন করিলে উত্তম ফল হইতে পারে, বাণিজ্যের জন্য দেশান্তরে যাইতে হইলে, কোন স্থানে বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে, কত দিনই বা তাহাতে লাগে, এবং তজ্জন্য কোন সময় যাত্রা করা আবশ্যক, এবং কিরূপ নিয়মে ভিন্ন সমাজের বাণিজ্যকর্ম্ম সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে, এই সকল বিষয় দর্শনদ্বারা স্থির করা বিশেষ প্রয়োজন। সমাজের শাসন, শান্তিরক্ষা ও পরস্পর আচার ব্যবহার নিরাকরণ সম্বন্ধে ও দর্শনের ঐরূপ আবশ্যক। এই সকল তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য চিন্তাশীল নিঃস্বার্থ, দ্রব্য ও জীব প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, অপর এক শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন।

মানবসমাজের লোক-সমষ্টিকে একটি বৃহৎ মানব-শরীর বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। কারণ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই দেহ ও চৈতন্য বিশিস্ট। সেজন্য লোক-সমষ্টিকে ও একটি বৃহৎ কলেবর বিশিষ্ট চৈতন্যবিগ্রহ বা পুরুষ বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। এই সমাজ-বিগ্রহ বা সমাজ পুরুষের মানব-শরীরের এক একটি অবয়াবর সহিত উহার উক্ত এক এক শ্রেণীর লোকের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মস্তকের দ্বারা চিন্তাকার্য্য সম্পাদন ও বিজ্ঞানের অনুশীলন হয় এবং মুখের দ্বারা তল্লব্ধ সিদ্ধান্ত সকল প্রকাশ করা যায়। পূর্ব্বে যে দর্শনাদি ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তার কথা বলা হইয়াছে তাহাদের কার্য্য অনুসারে তাহাদিগকে সমাজ-বিগ্রহের মস্তক-স্থানীয় বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিশুদ্ধজ্ঞান-অনুসন্ধান এই

শ্রেণীর কার্য্য বলিয়া ঐ শ্রেণীস্থ লোকেরা ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ-পদ বাচ্য। তদ্রূপ হৃদয় শরীরের সর্ব্বস্থলে রক্ত চালনা করিয়া, এবং অবিশুদ্ধ শোণিত বিশুদ্ধ করিয়া, মস্তক প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্দ্ধিত, ও নিজ নিজ কার্য্যে সুপটু করে। সমাজের ক্ষত বা অন্যায়, লোক নাশাদি অনিষ্ট, নিবারণ করার জন্য এই শ্রেণীর নাম ক্ষত্রিয়। পূর্ব্বোল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাই সমাজ-বিগ্রহের এই হৃদয় স্থানীয় হইয়া উহাদের কার্য্যদ্বারা স্বীয় ও অন্যান্য ভাগের পুষ্টি ও বিশুদ্ধিতা সাধনকরেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা সমাজবিগ্রহের যে ভুজস্বরূপ তাহাও একটু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়। আদান প্রদান হস্তের কার্য্য। সুলভ দ্রব্য দিয়া তাহাব বিনিময়ে দুর্ল্ভ দ্রব্য গ্রহণ করাই বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য। হস্ত যেমন শরীরের বাহ্যিক দ্রব্য আহরণের একমাত্র সাধন, সমাজের এই শ্রেণীর লোক অপর হইতে কোন দ্রব্য আনয়ন সম্বন্ধে তদ্রূপ। তজ্জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যে সমাজের ভুজদ্বয় একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাহ্যিক সম্বন্ধে অন্যান্য সমাজে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়াই এই শ্রেণীর নাম বৈশ্য হইয়াছে, বোধ হয়। পরিচর্য্যা অর্থাৎ দৌত্যাদি কার্য্য পাদদ্বারা সম্পাদিত হয়।—গত মারিভয় উপলক্ষে ভারবাহক প্রভৃতি শ্রেণীর লোক কয়েক দিন মাত্র কর্ম্ম হইতে বিরত থাকায় কি বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।—পাদাভাবে দেহ যেরূপ নিশ্চল হয়, পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর লোকের অভাবে সমাজের ও সেইরূপ অবস্থা ঘটে; অতএব উপকারিতায় ইহারা সমাজের পাদস্বরূপ।

সমাজের এই যে চারি প্রকার স্থুল বিভাগ, তাহা সকল মানবসমাজেই আছে। তবে অন্য দেশে এই চারিটি বিভাগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বলিয়া কোন বিশেষ সাধারণ নাম নাই। ভারতবর্ষে আর্য্য ঋষিগণ কোন শ্রেণীর লোকের দ্বারা সমাজের কি কার্য্য ও উপকার

সাধন হয়, তাহার উপর বিশেষ লক্ষ রাখিয়া উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন, এবং তাহাদের সমাজে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতার বিধান করিয়াছেন। তাঁহারা মস্তকগুণধর্ম্মীকে ব্রাহ্মণ, হৃদয়গুণধর্ম্মীকে ক্ষত্রিয়, বাহুগুণধর্ম্মীকে বৈশ্য এবং চরণগুণধর্ম্মীকে শূদ্র নাম দিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন বর্ণের লোক যে অপর বর্ণের হেয়, তাহা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। একই শরীরের হস্তপদাদির ন্যায় তাহারা পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ, এইটিই বুঝান তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য। পদ না থাকিলে মানুষ মানুষ হইত না; এবং ব্রহ্মার পদের গৌরব মস্তক অপেক্ষা কম নয়। ভক্ত সম্বন্ধে ব্রহ্মার পদই সর্ব্বস্ব।

পূর্ব্বে যে চারিটী বর্ণ-ভেদের কথা বলা হইল, তাহা যে কার্য্য অনুসারে হইয়াছে, এবং সমাজের উন্নতি সাধনই যে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকাশ আছে। যথা—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।—গীতা

লোকানাস্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।

ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥ মনুসংহিতা

ভগবদ্গীতার বর্ণবিভাগের যে শ্লোক উদ্ধৃত হইল তাহাতে কেবল কর্ম্মই বিভাগের হেতু নহে। তাহাতে গুণ কথাটিরও যোগ আছে। গুণ অর্থে সংসারে বন্ধনসাধনোপায়, এবং যে ভাবে কার্য্য করা যায় সেই ভাবই তাহার গুণ। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুসারে যেমন কোন দ্রব্য যত বেশী ঘনীভূত হয়, তাহার পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ ততই বৃদ্ধি পায়। সেই রূপ আমাদের অহংজ্ঞান যে পরিমাণে স্বার্থ বিষয়ে ঘনীভূত হয়, ততই আমরা গুরুভারাক্রান্ত হইয়া সংসার-সাগরে অধোগামী হই। বর্ণ নির্ব্বিশেষে আত্মা মুক্তধর্ম্মী, কার্য্যভাব গুণেতেই বদ্ধবৎ হইয়া পড়ে। বর্ণধর্ম্মের কার্য্য যদি কর্ত্তব্য বলিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে করি, তাহা হইলে সেই কার্য্যই আমাদের মুক্তি ও জ্ঞানলাভের উপায় হয়।

তুলাধার ব্যাধ সমাজের চক্ষে হীনবৃত্তি হইলেও, কেবল কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া, পিতৃভক্তিদ্বারা এরূপ জ্ঞানী হইয়াছিলেন, যে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ জ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন। এই বৃত্তান্ত বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকাশ আছে। ঐ পৌরাণিক ইতিবৃত্তের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, যে বর্ণের কার্য্য কেবল সমাজের উন্নতি সাধনের জন্যই পৃথক, কিন্তু ঐ কার্য্য জীবমুক্তির কোন রূপ ব্যত্যয় নহে।

(ক্রমশঃ)

বকুল বৃক্ষ।

হে বকুল! তরুকুলে তুমি বড় মানি!
তুমি হে পবিত্র ব'লে আসি তব ছায়াতলে,
দাঁড়া'ত রাখালরাজ সহ রাধারাণী
নবীন নীরদ যেন সহ সৌদামিনী।

উল্লাসে বিবশ হ'য়ে তুমি তরুবর!
বরষি' কুসুমসার, করিতে মঙ্গলাচার,
ঝঙ্কারিত ফুলসখা মধুপ নিকর,
বহিত মলয়ানিল করি শর্ শর্।

কভু বা বিরহানলে বিদগ্ধ মাধব
আসিয়া তোমার তলে, ডাকিতেন "রাধা" ব'লে—
সুমধুর স্বরে করি বেণুর সুরব;—
জলস্থল নভস্তল হইত নীরব।

মাধব-বিরহ-দগ্ধা ব্রজ কুমুদিনী—
ব্রজ সুধা-নিধি আশে, আসিয়া তোমার পাশে
বলিতেন প্রাণ খুলে দুখের কাহিনী,
জুড়াতেন লভি প্রিয় শ্যাম গুণমণি।

সে দিন তোমার তরু গিয়াছে এখন ;
কুঞ্জশোভা-চূড়া শিরে গুঞ্জমালা বক্ষোপরে
মঞ্জুকেশী শ্যাম সহ ব্রজাঙ্গনাগণ
আর কি তোমার তলে করেন ভ্রমণ ?

আর কি হে ব্রজশশী তব তলে আসি
ব্রজবিনোদিনী তরে ভাসেহে নয়ননীরে
শ্রুতির মধুর স্বরে বাজাইয়া বাঁশী ?—
ডাকেন কি "রাধা" ব'লে রাধিকা-বিলাসী ?

সে সুখ যদিও তব গিয়াছে এখন,
তথাপি তোমার শোভা বিশ্ব-জন-মনলোভা
জাগাইয়া দেয় প্রাণে যখন তখন
বিশ্বেব আরাধ্য—সেই "যুগল চরণ"।

তরুবর ! এক কথা সুধাই তোমারে,—
তব ক্ষুদ্র মনপ্রাণ যাঁহারে ক'রেছ দান,
আঁকিয়াছ যাঁর মূর্ত্তি হৃদয়মাঝারে ;—
আমি কিহে তরু, হায়, পাইব তাঁহারে ?

জান কিহে কোথা সেই পুরুষরতন ?
তোমার সুন্দর কায়, রচেছেন যিনি হায়,
কোথা গেলে পাব সেই ভুবনমোহন ?
যাঁর তরে যোগী ঋষি ধ্যানে নিমগন !

বাসনা হে তরুবর, জীবন সন্ধ্যায়
তাঁর নাম গাহি মুখে, শুনি তাঁর নাম সুখে
স্মরি' সে চরণচারু—কালের নিশায়
মগ্ন হই চিরতরে অনন্ত নিদ্রায়।

ধর্ম্মের পথ ।

একদিন মোরা বিদ্যালয় হ'তে আসিতেছি তিন জনে ।
আসিতে আসিতে পথের মাঝারে আসিলাম হেন স্থানে ॥
দক্ষিণে গভীর জলে ঢল ঢল বিরাজিত সরোবর ।
বামেতে মলিন জলের প্রণালী মলপূর্ণ ভয়ঙ্কর ॥
উহাদের মাঝে অতিশয় ক্ষীণ উচ্চ নীচ মেটে পথ ।
দুইজন যা'তে পাশে পাশে নারে করিবারে গতাগত ॥
তাহাতে আবার বিষম বিপদ, পথের উভয় ধারে ।
দুরগন্ধময় অতি ঘৃণাকর নববিষ্ঠা থরে থরে ॥
তিনজন মোরা, দ্রুত বাটী যাব, এই অভিলাষ ক'রে ।
ত্যজি অন্য পথ বিপদ-সঙ্কুল চলি সেই পথ ধ'রে ॥
চলিতে চলিতে যাই একবার চাহি সরোবর পানে ।
টলিল চরণ, রাখিলাম পথ অতিশয় সাবধানে ॥
ভাবিনু মনেতে, দ্রুত যাব ব'লে আসিলাম এই পথে ।
অন্যদিকে চেয়ে হারাতেম পথ, পড়িতাম বিপাকেতে ॥
কোথা পথ চলা, কোথা বাটী যা'য়া, সকলি যাইত দূরে ।
খানায় অথবা জলাশয় মাঝে পড়িতাম এবে ঘুরে ॥
তখনি আবার কে যেন আমায় বলিলেন প্রাণে প্রাণে ।
"ধরমের পথ ঠিক এইরূপ, চল তাহে সাবধানে ॥
পথ পানে চেয়ে চল অবিরত, মন রাখ লক্ষ্য পানে ।
শ্রীহরিচরণ হৃদয়ে ধরিয়ে চ'লে যাও এক মনে ॥
এদিক ওদিক চাহিলেরে ভাই পড়িবি বিষম ফেরে ।
লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবি, পথ হারাইবি, উঠিতে পারিবি নারে ॥
পথের পাশেতে যাই কেন হ'ক, তোমার তাহাতে কিবা ।
আপন পথেতে চল সাবধানে একমনে রাতি দিবা ॥

যে পথে যে যাক, যে যাহা করুক, তাহে তোর কাজ নাই।
শ্রীহরিচরণ ভাবিয়া আপন পথেতে চলরে ভাই॥”

(গান)

কীর্ত্তন——লোফা।

হ’যে ভ্রান্ত প্রাণকান্ত, তোমার লীলা খেলা বুঝতে নারি।
(তুমি) যখন যে ভাবে রাখিছ আমারে সে ভাবে কেমনে হেরি॥
(আমার) যখন যে আশ হয় শ্রীনিবাস, তুমি জান নাথ, সেই বাসনা।
(তাই) দিতেছ সতত, না আছ বিরত, তথাপি কাঁদিয়ে মরি॥
(তুমি) হৃদয় মাঝারে আছ নিরন্তরে, অন্তরেতে কেন ঘুরে মরি ?
(ওহে) হৃদয়বল্লভ দাও সেই ভাব, (যেন) ভাবেতে ভাবিতে পারি॥
(যাই) যখন যেখানে সাধ হয় মনে, তোমা ধনে যেন না পাশরি।
(তাই) পত্র পুষ্প ফলে এই ধরাতলে জাগিছ জগত ভরি॥
যে পেয়েছে আঁখি ওহে কমল আঁখি নিরখিছে সদা তোমায় প্রাণে।
(নাথ) রেখোনাক বাকি দিতে সে প্রেম আঁখি আশা প্রেমভরে হেরি।
মাতিয়ে প্রেমেতে নাচিব গাহিব শুনিব শুনা’ব তোমার কথা।
(নাথ) গাঁথিব হৃদয়ে যতন করিয়ে প্রেমগাথা হার করি॥
(নাথ) যেন তোমা বিনে ভবনে বিজনে, আন ধনজনে না রয় মতি।
ওহে হরি দীনবন্ধু, তব প্রেমসিন্ধু নীরে যেন ডুবে মরি॥

কীর্ত্তন (মিশ্র)—একতালা।

গাওত হরিনাম, নাচত রঙ্গে।
ভাসাওত জগজনে প্রেমতরঙ্গে॥
তোমার লাগিয়ে গোরা, ক’রেছি আসন।
এসো নিতাই চাঁদে ল’য়ে, কর সঙ্কীর্ত্তন॥
বড়ই পতিত আমি, শুন গৌরমণি।
তো’ বিনে তারিতে মোরে অন্যে নাহি জানি॥
কাঙালের সর্ব্বস্ব গোরা, অনাথ-শরণ।
অনাথ কাঙালে ডাকে, দেহ দরশন॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

"ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎ কিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎসমম্॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ।

অনুপম গোরা অবতার।
নবধা ভকতি রসে বিস্তারিলা সব দেশে,
না করিলা জাতির বিচার॥
এমন ঠাকুর ভজ, দূর কর সব কাজ,
ছাড় সব মিছা অভিলাষ।
চৈতন্য চাঁদের গুণে আলো কৈলা ত্রিভুবনে,
অনায়াসে হৈল পরকাশ॥
চৈতন্য কল্পতরু, অখিল জীবের গুরু,
গোলোক বৈভব সব সঙ্গে।
জীবেরে মলিন দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি,
হরিনাম বিলাইল রঙ্গে॥
যজ্ঞ, জপ, ধ্যান, পূজা অন্য যুগে যত প্রজা,
সাধিলেক অতি বড় দুখে।
এই কলিযুগে নরে যত পাপ তাই করে,
নাম লৈয়া তরি গেল সুখে॥
করুণা বিগ্রহ সার, তুলনা কি দিব আর?
পতিতের পুরাইল আশ।
কিছু না বুঝিয়া চিতে কান্দিতে কান্দিতে পথে
গুণ গায় নরহরি দাস॥

গোরা রসময়।

অমিয় ছুটায়ে নাচিছে লো! গোরা।
প্রেমে তনুখানি হেন মনে মানি
গড়িল কে বুঝি করি মনচোরা॥
সোণার বরণ অনাথ-শরণ,
লুটি রাঙা পায়ে তাই আজি মোরা।
গোরা মন-চোরা মন-চোরা গোরা॥

হেরি একবার নদীয়ার ধনে,
তুমিও স্বজনি! সঁপিবে পরাণি
জাগিবে সেরূপ সদা তব মনে॥
মধুর নর্ত্তন মধুর কীর্ত্তন
হইল পাগল হেরে যত জনে।
সঁপিবে পরাণি নদীয়াব ধনে॥

তিতিছে সদাই কমল নয়ন।
ইচ্ছি মরিবারে সেই অশ্রু হেরে
দ্রবিল ভুবন যাহার কারণ॥
যার লাগি কাঁদে নদীয়ার চাঁদে
না পারি বুঝিতে সে জন কেমন।
তিতে যার লাগি কমল নয়ন॥

কাঁপে ওষ্ঠ কিবা অনুরাগ ভরে।
রক্তিম আভায় শশীমুখ হায়!
হইয়া রঞ্জিত কত শোভা ধরে॥
চখের চাহনি বর্ণিব স্বজনি!
ত্রিলোকের মন নিমেষে তা' হরে।
কত শোভা ধরে, অনুরাগ ভরে!

চুমিছে সবারে প্রেমের পুতলি।
প্রেম আলিঙ্গনে প্রেম আলাপনে

ভকতেরে ল'য়ে করে প্রেম-কেলি ॥
বৃন্দাবন-লীলা অন্তরে স্ফুরিলা
খেলিল ভাবুক-হৃদয়ে বিজলি।
করে প্রেম-কেলি প্রেমের পুতলি ॥

রসময় গোরা প্রেম-অবতার।
জীবে প্রেমময়ে সম্বন্ধ দেখায়ে
(কিবা মধুময় ভিতর তাহার !)
পাষণ্ড-দলন হ'লনা তাঁহার ॥
সোণার নাগর কুন্তল চাঁচর
প্রাণের দুলাল শ্রীশচীমাতার,
হৃদয়বল্লভ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ,—

পথের কাঙাল, হ'ল নটবর।
পাপী কাঁদাইল প্রেমে ভাসাইল
কত মরুভূমি জ্ঞানির অন্তর ॥
শ্রীনাম প্রচার,— হয় অধিকার
যাহে সবাকার পাপী আপামর,—
ভকত সহিত হইয়া মিলিত
করিলেন সেই গৌরাঙ্গ সুন্দর।
হইয়া কাঙাল গোরা নটবর ॥

অপর সখীর উক্তি,—

হায় লো সুভগে ! আমি অভাগিনী,—
পথের কাঙাল নদীয়া-দুলাল
বৃদ্ধা শচীমার আজি সে পরাণি,
ত্যজি গৃহবাস ধরিল সন্ন্যাস
কাঁদা'য়ে প্রিয়ারে জীবন-সঙ্গিনী।
কি কহিব সখি ! মরম কাহিনী !—

হইল না হায় ! নামে রতি মোর।
কি হবে উপায় গোরা দয়াময় !

আজীবন র'ব বিষয়ে বিভোর !!
তোমা সম ধন পতিত পাবন
না ছুটাবে যদি মম মায়া-ঘোর।
কি হবে ? দাও হে ! নামে রতি মোর ॥

চিন্তা-মালা।

আজ শ্রীশ্রীভগবানের শুভ জন্মদিন। ভক্তরূপী নন্দ যশোদার আজ আনন্দের সীমা নাই। জন্মাদিশূন্য শ্রীভগবানকে ক্রোড়ে পাওয়া যায় না বলিয়া যে সকল জ্ঞানিবৃন্দ হতাশ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে লজ্জা দিয়াই যেন তাঁহারা সেই জন্ম-মরণ-শূন্য অক্ষয়, অব্যয়, পরম প্রিয় বস্তুটিকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ক্রোড়ে পাইয়াছেন, আর বিচারে প্রয়োজন কি ? শ্রীভগবান,—"দুনিয়ার মালিক যিনি"—যাঁহার ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই—যিনি নিয়ত আত্মতৃপ্ত,—তিনি যশোদার স্তন পান করিতেছেন। বিষয়ে বিক্ষিপ্ত অজ্ঞানী জীব ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না বটে, কিন্তু ইহা শাস্ত্রানুকূল যুক্তিসঙ্গত কথা। শ্রীভগবান দিব্য দেহ ধারণ করিয়া যেখানে সেখানে অবতীর্ণ হইতে পারেন ইহা সত্য কথা। এ জগতে যত প্রকার রূপ আছে বা কল্পনায় আসিতে পারে সে সমস্তই তাঁহার রচিত; তিনি ইচ্ছাক্রমে তাহার যে কোনটীর অনুরূপ হইতে পারেন। পাঁচটী রাখালের মধ্যে একটী রাখাল হইয়া গোচারণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন নহে। ঠাকুর রাখাল হইয়াছেন, রাখালের স্কন্ধে উঠিতেছেন, তাহাদিগকে স্কন্ধে করিতেছেন, ইহা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়।

পুরাণে শুনিয়াছি, কোন কোন ঋষি শ্রীভগবানকে ক্রোড়ে করিয়া প্রেমে গদ গদ হইয়া নবনীত প্রভৃতি সেবন করাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আদি ও অন্ত শূন্য অথচ, পরম দয়ালু শ্রীভগবান তাঁহাদের

সে আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এখন দেখুন যিনি অনাদি অনন্ত, মনের দ্বারাও যাঁহাকে কল্পনায় আনা কঠিন, সেই কোন বৃহৎ বস্তুকে ভক্তানুরোধে মন ও নয়নের গোচর হইতে হইয়াছিল। জন্ম নাই অথচ জন্ম গ্রহণ করিলেন। তবে জীবের জন্ম যেমন কর্ম্মাধীন তাঁহার সেরূপ নহে, তাঁহার জন্ম স্বেচ্ছাধীন বা ভক্তেচ্ছাধীন।

যাহা অত্যন্ত বিপরীত তাহাকেও সংলগ্ন করিতে পারা যায় যে শক্তির বলে তাহাকে "যোগমায়া শক্তি" বলে। এই যোগমায়াশক্তি যাহা ঘটেনা তাহাও ঘটাইতে পারে। এই শক্তি শ্রীভগবানে নিত্য বিরাজিতা। তিনি সঙ্কল্প করিলেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়া যায়; এই জন্য তাঁহার একটি নাম সত্য-সঙ্কল্প। এই যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছায় বা ভক্তেচ্ছায় ভগবান ভক্তগণপরিবৃত হইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; এইরূপ জন্মাদিকে 'দিব্য জন্ম' বলে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।"

শ্রীভগবান স্বেচ্ছাধীন ও ভক্তেচ্ছাধীন ইহা স্বীকার না করিলে তাঁহাকে ভগবান বলাই হয় না, প্রভু সর্ব্বেশ্বর বলিয়া সেবা করাই চলে না। শ্রীভগবানের এই দিব্য জন্ম আছে। আর তাহা আছে বলিয়াই তন্নিষ্ঠ ভক্তগণ বাঁচিয়া আছেন।

বেদজ্ঞ ঋষিগণ বিষয়ের চঞ্চলতা দেখিয়া তাহাতে বৈরাগ্য সম্পন্ন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন শ্রীভগবানই একমাত্র আদরের বস্তু, তাঁহার সহিত মিলিত হওয়াই পরম সুখ। বিষয় সম্মিলনের সুখ ক্ষণিক ও তুচ্ছ,—একপ্রকার মোহভাব জড়িত। প্রকৃত পরিতৃপ্তির বস্তু, যাহা লাভ করিলে আর অন্য লাভে লক্ষ্য থাকে না, এমন কোন চিন্ত্রাত্মক বস্তুর প্রতি তাঁহাদের লোভ হইয়াছিল। যে লোভ বিষয়ে

হইলে সর্ব্বনাশের হেতু হইত তাহা শ্রীভগবানে হইয়াছিল বলিয়া অমৃতের হেতু হইল। শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দখল করিব, প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিব, পিতামাতা পুত্ত্রকে যেমন তাড়ন ভর্ৎসন করে তাহাও করিব। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ় নিষ্ঠা ও মনের সমাধি বশতঃ তাঁহাদের প্রাণ সরল হইয়াছিল। তাঁহাদের সরল প্রাণের সরল প্রার্থনায় বশীভূত হইয়া যোগমায়াধীন পরম কৌতুকী শ্রীভগবান ভাবুক ভক্তসঙ্গে সংসারীর ন্যায় আচরণ কবিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আচরণ আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত হউক।

সৎ-সঙ্গ।

সৎসঙ্গ অর্থে সতের সংসর্গ। সৎ বলিতে কেবল একটি বস্তু বুঝায়, সেই বস্তুটী শ্রীভগবান, অতএব সেই শ্রীভগবানের সঙ্গই সৎসঙ্গ।

আমরা মলিন, আমরা অসৎ ভাবে ভাবিত, আমরা শ্রীভগবানের সঙ্গ কেমন করিয়া ভোগ করিব? তবে "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস" এই আশাপ্রদ বাক্যটি কি আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরর্থক? তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? শাস্ত্রেত অমূলক কথা নাই, সাধুদিগের মুখ হইতে নিরর্থক বাক্যত বাহির হয় না। অধিকন্তু শ্রীভগবান দয়াময়, তিনি চির তরে আমাদিগকে অসতে ডুবাইয়া রাখিবেন, ইহাই বা কিরূপে হইবে? আমরা খঞ্জ, আমরা অন্ধ, আমরা বধিব, তাই বলিয়া কি জগৎপিতা বিপদসঙ্কুল এই পঙ্কিল পথে ছাড়িয়া দিয়া তামাসা দেখিবেন? নিজ শক্তিতে উঠিতে গিয়া ক্রমশঃ পঙ্কে মগ্ন হইতেছি, ইহা কি তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিবেন, তুলিবার জন্য আদৌ চেষ্টা করিবেন না? যাঁর স্নেহকণা পাইয়া পিতা মাতা পুত্ত্রাদির জন্য এত যত্ন এত কষ্ট করেন সেই স্নেহাধার, সেই করুণাময় ভগবান কি আমাদিগের দুর্গতি স্থিরভাবে দর্শন করিবেন? তিনি কি আমাদিগকে তুলিয়া লইবেন না? তিনি কি আমাদিগকে সৎপথে চালাইবেন না, সদ্ভাবে ভাবিত

করিবেন না ?—নিশ্চয়ই করিবেন। আমাদিগকে সুখে রাখিবার জন্য, আমাদিগকে সৎপথে চালাইবার জন্য, ভগবৎসঙ্গ লাভে উপযুক্ত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা যত্ন করিতেছেন। আমরা দুর্ব্বল, প্রত্যক্ষ তাঁহার সঙ্গ সহ্য করিতে অসমর্থ ; তাই দয়াময় আপনার শ্রীনাম, মধুময় লীলা প্রসঙ্গ, লীলাত্মক গ্রন্থাদি এবং স্বীয় দেহরূপ ভক্তগণকে আমাদের উদ্ধারের জন্য আশে পাশে চতুর্দ্দিকে রাখিয়াছেন। আমাদের পক্ষে ভগবল্লীলাদির আলোচনা, তাঁহার শ্রীধামাদি দর্শন, ভগবল্লীলাত্মক গ্রন্থাদি পাঠ এবং ভক্তগণের সংসর্গ,—যাহা হইতে ভগবচ্চরণে রতি জন্মে ও ভগবদ্ভাবের উদ্দীপনা হয়,—সেই সকলই সৎসঙ্গ। তাহাদের সংসর্গগুণেই আমরা সত্বস্বরূপ ভগবানের সঙ্গলাভে অধিকারী হইব।

শ্রীভগবানের কি দয়া! ঐ সকলের সঙ্গকরণোপযোগী ইন্দ্রিয়াদিও দিয়াছেন ; শুধু তাহাই নয়, ইন্দ্রিয়গণকে চালনা করিবার ক্ষমতাও আমাদিগকে দিয়াছেন। আমরা মূর্খ সে শক্তির অপব্যয় করিতেছি। তিনি আমাদের বাক্য দিয়াছেন, কর্ণ দিয়াছেন, পরনিন্দায় পরচর্চ্চায় তাহা ব্যবহার না করিয়া নামগ্রহণে ব্যাপৃত করিতে পারি। আমাদের মন আছে, শূন্যে প্রাসাদনির্ম্মাণের কল্পনায় তাহা নিযুক্ত না করিয়া ভগল্লীলাদি ও ভক্তগণের বিষয় চিন্তা করিতে পারি। আমরা অনেকে পড়িতে জানি, ছাই ভস্ম কতকগুলা না পড়িয়া শ্রীভগবানের লীলা-প্রধান গ্রন্থ ও ভাগবতগণের চরিত্র পড়িলে ক্ষতি কি ? আমরা কত স্থানে যাই, এদিক ওদিক কত কি দেখিতে যাই, আর কোন শ্রীমন্দির কি কোন শ্রীবিগ্রহ, কি সাধু সজ্জন দেখিলেই কি সর্ব্বনাশ হইবে ? তবে কেন দেখি না, কেন সদ্বিষয়ের আলোচনা করি না, কেন সদ্ভাবে ভাবিত হই না, সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অসতের দিকে কেন ধাবিত হই ? নিয়ত অসৎসঙ্গ করিয়া আসিতেছি, অসৎসংসর্গের ক্ষণিক সুখই স্বর্গীয় সুখ মনে করিতেছি, তদতিরিক্ত আনন্দ আছে বলিয়া জানিনা, তাই আমরা সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি, তাই হরিনাম

শুনিলে কাণে আঙুল দি, তাই সাধু দেখিলেই ভণ্ড বলিয়া দূরে গমন করি, তাই তীর্থস্থান জুয়াচোরের আড্ডা বলিয়া সে দিকে মুখ ফিরাই না; বড়ই আশঙ্কা পাছে সেই সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়।

কি দুঃখের বিষয়! অসুখকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিলাম, প্রকৃত আনন্দের যাহা তাহাই অশান্তিময় বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম ইহা কি মূর্খতা নয়? ভাই, এখনও সময় আছে, এখনও অভ্যাস সেরূপ দৃঢ় হয় নাই, এস ভাই এই বেলা সদ্ভাবে ভাবিত হইতে যত্ন করি, দুএক দিন রসভঙ্গ হইবে, দু এক দিন বিরক্তি বোধ হইবে, কিন্তু ধীরতার সহিত কার্য্য করিলে অচিরাৎ নির্ম্মল আনন্দের উদয় হইবে। ভগবৎসঙ্গ করিবার জন্যই মনুষ্যজীবন, বিষয়ভোগ পশু পক্ষীরাও করিয়া থাকে। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকিব, মনুষ্যোচিত কার্য্য কিছুই করিব না? আমরা পাপাচারী হই না কেন, নিরতিশয় বিষয়াসক্ত হই না কেন, হই না কেন ভগবদ্বিদ্বেষী, এস, সৎসঙ্গ করি সাধুর চরণে আশ্রয় লই, প্রাণ টলিবে গতি ফিরিবে, অসদ্বস্তুতে ঘৃণা জন্মিবে শ্রীভগবানের জন্য প্রাণ কাঁদিবে। আমরা অন্ধ—পথভ্রান্ত, সৎসঙ্গই আমাদের একমাত্র অবলম্বন—পথপ্রদর্শক, বিশেষতঃ সাধু—ভক্ত যাঁহাতে নিখিল সদ্বৃত্তি, সমস্ত ভগবদ্ভাব জীবন্তভাবে বর্ত্তমান, তাঁহার সংসর্গে যে অসীম ফল লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্য সাধুসঙ্গ করিলে অনায়াসে সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

সৎসঙ্গ ভগবদ্ভক্তির জনক পোষক, বিবর্দ্ধক ও রক্ষক। যতদিন চিত্ত ভগবদ্ভাবে বিভোর না হয়, ততদিন সৎসঙ্গ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং

অসৎসঙ্গ সর্ব্বথা পরিহার্য্য। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে কথিত আছে—

"ভক্তি নব বৃক্ষ তাহে সৎসঙ্গ সিঞ্চনে।
পালন করহ ভাই পরম যতনে॥
বিচার যে বাড় দেহ রক্ষার কারণে।
অসৎসঙ্গ—গোছাগল না করে ভক্ষণে॥
তবে সেই বৃক্ষ শাখা প্রশাখা হইয়া।
আকাশে উঠয়ে নানা রঙ্গেতে ব্যাপিয়া॥
হৃদি আলবালে শোভি করে স্নিগ্ধ ছায়া।
সর্ব্ব জীবের হরে দুঃখ পাপ তাপ মায়া॥
যবে সেই ভক্তি-বৃক্ষ বলবান হয়।
দুষ্টসঙ্গ-করী হইতে বিঘ্ন না জন্মায়॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব বলিতেছেন—

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষনাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

অর্থাৎ সৎসংসর্গে হৃদয় ও কর্ণ তৃপ্তিকর ভগবল্লীলাগুণাদি যুক্ত কথার আলোচনা হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে স্বতঃই পরম কৈবল্যধাম ভগবান শ্রীহরির প্রতি ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হয়।

সাধুসহবাসের কথা কি? ক্ষণকালের জন্য সাধুকে দর্শন কি স্পর্শন করিলেই নিখিল পাপ বিদূরিত হয় এবং হৃদয় পবিত্র ও ভগবৎপ্রবণ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—

নহ্যম্মদীয়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের তীর্থসকল মৃত্তিকা ও শীলাময় দেবতাসকল কাল

অসৎসঙ্গ সর্ব্বথা পরিহার্য্য। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে কথিত আছে—

"ভক্তি নব বৃক্ষ তাহে সৎসঙ্গ সিঞ্চনে।
পালন করহ ভাই পরম যতনে॥
বিচার যে বাড় দেহ রক্ষার কারণে।
অসৎসঙ্গ—গোছাগল না করে ভক্ষণে॥
তবে সেই বৃক্ষ শাখা প্রশাখা হইয়া।
আকাশে উঠয়ে নানা রঙ্গেতে ব্যাপিয়া॥
হৃদি আলবালে শোভি করে স্নিগ্ধ ছায়া।
সর্ব্ব জীবের হরে দুঃখ পাপ তাপ মায়া॥
যবে সেই ভক্তি-বৃক্ষ বলবান হয়।
দুষ্টসঙ্গ-করী হইতে বিঘ্ন না জন্মায়॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব বলিতেছেন—

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষনাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

অর্থাৎ সৎসংসর্গে হৃদয় ও কর্ণ তৃপ্তিকর ভগবল্লীলাগুণাদি যুক্ত কথার আলোচনা হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে স্বতঃই পরম কৈবল্যধাম ভগবান শ্রীহরির প্রতি ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হয়।

সাধুসহবাসের কথা কি? ক্ষণকালের জন্য সাধুকে দর্শন কি স্পর্শন করিলেই নিখিল পাপ বিদূরিত হয় এবং হৃদয পবিত্র ও ভগবৎপ্রবণ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—

নহ্যম্মদীয়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের তীর্থসকল মৃত্তিকা ও শীলাময় দেবতাসকল কাল

বিলম্বে পবিত্র করে, কিন্তু সাধুগণের দর্শনমাত্রে নিখিল পাপ বিদূরিত হয়।

"যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ ॥
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পার্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥"

অর্থাৎ যে সাধুগণের স্মরণমাত্র জীবের গৃহপর্য্যন্ত পবিত্র হয়; তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও অবস্থান প্রভৃতিতে কি ফল লাভ হইবে তাহা অনুমান করাও সুকঠিন।

অথবা স্মরণেরই বা আবশ্যক কি? "বৈষ্ণবের নামে সর্ব্ব পাতক নাশয়"। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাঞ্চ কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌযগে ॥"

অর্থাৎ প্রত্যহ প্রাতে যাঁহারা বৈষ্ণবগণের নাম কীর্ত্তন করেন তাঁহারা পরম ভাগবত হন।

সাধুর এতই শক্তি! ভক্তের এমনই মাহাত্ম্য। তাই ভগবান নিজ মুখে বলিতেছেন—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাশ্চ তে নরাঃ ॥
মদ্ভক্তো বল্লভো যস্য স এব মম বল্লভঃ।
তৎপরো বল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয় ॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! যে আমার ভজনা করে সে আমার সেরূপ ভক্ত নহে, যে আমার ভক্তের ভজনা করে সেই আমার প্রিয়, সেই আমার ভক্ত। যে ব্যক্তি আমার ভক্তের শরণাগত হইয়াছে, আমি তাহারই আশ্রিত, তাহা অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর কেহই নাই।

"বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্ববেদবিদো জগৎ ॥"

অর্জ্জুন! বৈষ্ণবগণকে ভজনা কর, তাঁহাদেরই শরণাগত হও। বৈষ্ণবগণ নিখিল বেদের বেদ্য বস্তু আমাকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিতেছেন, সমস্ত জগৎকে তাঁহারা উদ্ধার করিতে পারেন!

তাই বলি ভাই, এস সাধুর চরণে শরণ লইয়া প্রেমময় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মলাভের উপযুক্ত হই। যদি বল, কাজ কি আমাদের ভগবৎ চরণ লাভে? বেশত সুখে স্বচ্ছন্দে আছি!' তাহার উত্তর এইমাত্র বলি—ভূত লইয়া ভূত সাজিয়া থাকিবার জন্য ত মানুষ হই নাই! যদি তুমি ইহা অস্বীকার কর, তবে আরও বলি—ভাই, আমরাত সুখ চাই, আমরাত সুখের জন্য লালায়িত, মনত ইতস্ততঃ সুখের জন্যই ছুটাছুটী করিতেছে, কিন্তু সুখ কোথা? এ জিনিসের পর ও জিনিস পাইতেছি কিন্তু তৃপ্তি কোথা? মনের ব্যাকুলতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে একটী অভাব পুরণ করিতেছি, তৎক্ষণাৎ আর একটী অভাব—প্রবল তর অভাব উপস্থিত হইতেছে। কাম্য বস্তু পাইতেছি, সাধ মিটে না। কেন?

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবৰ্দ্ধতে॥" মনু

কাম্য বস্তু উপভোগ করিলে কামনা নিবৃত্ত না হইয়া বরং ঘৃতসংসর্গে অগ্নির ন্যায় প্রবল হইয়া উঠে।

তাই বলি ভাই ভূত লইয়া খেলনা, এস ভূতভাবন ভগবানের ভাব পাইবার জন্য যত্নকরি—"যল্লাভান্নাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" যেলাভ হইতে আর শ্রেষ্ঠ লাভ নাই, এস সেই ভগবৎসঙ্গরূপ পরমবস্তু লাভে প্রয়াসী হই। আনন্দ পাইব, চিরশান্তি সাগরে ডুবিব। কিন্তু সেই পরম বস্তু লাভের উপায় কি?—অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যজ্ঞদানতপোভির্বা বেদাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ।
নৈব দ্রষ্টুমহং শক্যো মদ্ভক্তিবিমুখৈঃ সদা॥"

কেবল যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং বেদাধ্যয়ন প্রভৃতিদ্বারা ভগবানের দর্শন লাভ হয় না, ভক্তিই তাঁহার দর্শন লাভের একমাত্র উপায়।

"ভক্তেষু পারবশ্যং তে দৃষ্টং মেহদ্য রঘূদ্বহ।"

ভগবান ভক্তাধীন, ভক্তের প্রীত্যর্থে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্ত কিরূপে হই, কি উপায়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করি?—

"সতাং সঙ্গতি রেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্।"

সৎসঙ্গই ভক্তিলাভের প্রধান সাধন।

ভগবান আপনিই ধরা দিয়াছেন; দয়াময় দুর্ব্বল সন্তানগণের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছেন, জীব! ভোগবাসনাভিভূত হইয়া বার বার বিড়ম্বিত হইও না, "ভোগা মেঘবিতানস্থ বিদ্যুল্লতেব চঞ্চলাঃ" বিষয়ভোগ মেঘমালাস্থিত বিদ্যুৎলতার ন্যায় চঞ্চল। আমাকে পাইতে যত্নবান হও, চিরশান্তি অনায়াসে হস্তগত হইবে।

"সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা যদা ত্বাং সমুপাসতে।
তদা মায়া শনৈর্যাতি ত্বামেব প্রতিপদ্যতে॥"

সৎসঙ্গজনিত ভক্তিদ্বারা ভগবানের উপাসনা করিলে মায়া দূরে যায় এবং ক্রমশঃ ভগবদ্ভাবের উদয় হইয়া থাকে; তাই বলি—

"বৈষ্ণবের সঙ্গ কর হরি অনুরাগ ধর,
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই।"

"অতএব সাধুসেবা সাধুসঙ্গে মজ।
দেখিয়া শুনিয়া ভাই বৈষ্ণবেরে ভজ॥
বৈষ্ণবের পদরজঃ শিরের ভূষণ।
করিয়া এড়াও ভাই শমন বন্ধন॥
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-রস আস্বাদন কর।
কৃষ্ণপ্রেমে মজ, যদি ব্রজ আশা কর॥"

——৪——

গুরু-নিষ্ঠা।

মনুষ্য মাত্রের প্রত্যেক কার্য্যেরই কেহ না কেহ শিক্ষাদাতা আছে; মনুষ্য হইতে শিক্ষা করা ত আছেই, এমন কি জাগতিক অন্যান্য পদার্থ হইতেও আমাদের শিক্ষা হইয়া থাকে। যাঁহা হইতে আমরা কোন শিক্ষা পাই, তাঁহাকেই আমাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করা উচিত। শ্রীভগবানই আমাদের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক জীবের এমন কি গুল্ম লতার ভিতরও অণুপরমাণুরূপে অবস্থান করিয়া গুরুরূপে আমাদের মঙ্গল করিতেছেন। সুতরাং প্রত্যেকেরই সেই গুরু শক্তিতে সরল বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি রাখা উচিত। আমাদের মধ্যে যে গুরু-পাদপদ্মাশ্রয়-গ্রহণের শাস্ত্রীয় বিধান আছে, তাহা সামান্য মনে করা উচিত নয়। ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, যে ভগবান আমাদের ধারণা অনুযায়ী রূপ ধারণ করত গুরু হইয়া জগতে আগমন করেন।

স্বীয় গুরুদেবকে সরল প্রাণে ভাল বাসিয়া, তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ না করিলে আমাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই। ভগবানকে পাইতে হইলে গুরুদেবকে ভগবানের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে নতুবা ভগবানকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

গুরু নিশ্চয়ই সামান্য বস্তু নন। গুরু ইষ্টদেবের ভাবে মনুষ্যরূপে জীবের কৃতার্থতার জন্য অবতীর্ণ হন। সেই জন্য গুরু ইষ্টদেব ও মন্ত্র অভেদ ভাবিয়া উপাসনা করিতে হয়। তাহা হইলে হৃদয় সরল হইবে, বিষয়ের মলিনতা, ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন দূরে যাইবে।

যতদিন আমাদের নিজ গুরুদেবের উপর ভগবদ্‌জ্ঞানে বিশ্বাস ও ভক্তি না আসিবে, ও যতদিন গুরুদেবও প্রাণের সহিত নিজ শিষ্যের যথার্থ মঙ্গল কামনা না করিবেন ততদিন উক্ত গুরুকরণ প্রণালী একটী ব্যবসা ও সামাজিকতা রক্ষা ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারেনা।

ততদিন আমাদের দুঃখের অবসান নাই, ততদিন আমরা ভগবান হইতে অনেক দূরে আছি ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে। তাই বলি ভাই সকল, এস, প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন আমরা সদ্গুরু পাইয়া তাঁহাকে সরল প্রাণে ভগবান বলিয়া জানিতে শিখি তাহা হইলে আমরা সেই দয়াময় গুরুর কৃপায় ইহ জগতে আনন্দে কাটাইয়া নির্ব্বিঘ্নে সেই আনন্দ ধামে যাইবার উপযুক্ত হইতে পারিব।

গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে কি পার্থিব কি পারমার্থিক সকল কার্য্যই নিতান্ত অসম্ভব হইলেও অনায়াসে সাধিত হইতে পারে।

পূর্ব্বকালে কোন এক পরম বৈষ্ণব গঙ্গাতীরে আশ্রম সংস্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য ছিল। সকলেই তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত, ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহাকে সুখী করিত। এই শিষ্যগণের মধ্যে এক জনের শ্রীগুরুদেবের উপর অটল বিশ্বাস, ও প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি শ্রীগুরুর অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না এবং শ্রীগুরু দেবের সেবা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন সাধন ভজনও ছিল না।

গুরু শিষ্যগণকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, সকল সময়েই তাহাদিগকে সতুপদেশ দিতেন; তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, সদা শিষ্যগণের মঙ্গলের জন্য কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করিতেন।

এক দিন বৈষ্ণব কোন কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করায় তাঁহার শিষ্যের প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইল। তিনি অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও শ্রীগুরুদেবকে ছাড়িয়া কিরূপে থাকিবেন ইহা ভাবিয়া নিতান্ত অধীর হইলেন। ইহাতে দয়াল গুরু অনেক রকমে সান্ত্বনা করিলেন, ও বলিলেন যে যতদিন আমি না আসি তত দিন তুমি শ্রীগঙ্গাদেবীর উপাসনা করিও তাহা হইলেই আমার পূজা করা হইবে।

সেই দিন হইতে তিনি আর গঙ্গাজলে পাদস্পর্শ করিতেন না তটস্থ হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন; এবং পান করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে গঙ্গাজল ব্যবহার করিতেন না। ইহা দেখিয়া অন্যান্য শিষ্যগণ তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই টলিলেন না, গুরুর আজ্ঞা অনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

গুরুদেব! সদা বিষয়মদে মত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদির ভাবে ভাবিত হইয়াছি, তোমার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে পারি না। দয়াময়! কবে আমার সেই ভক্তি ও বিশ্বাস আসিবে যে দিন মনে প্রাণে তোমার ভাব বুঝিয়া তোমার আজ্ঞানুসারে তোমার কার্য্য করিতে পারিব' কবে তোমায় হৃদয়রথের রথী করিয়া মনরজ্জু তোমার হাতে দিতে পারিব এবং তুমি আমার ইন্দ্রিয়গণকে তোমার ভাবে বিভোর করিয় ঠিক পথে চালাইবে। গুরুদেব! কেমন করিয়া তোমায় হৃদয়ে অধীশ্বর করিতে হয় জানি না তুমি দয়া করিয়া না শিখালে আ আমার উপায় নাই।

কিছু দিন পরে বৈষ্ণব আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে শিষ্যগণ যথ বিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কথায় কথায় ঐ নৈষ্ঠিক শিষ্যের বিষ যথাযথ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি মনে মনে সমস্তই বুঝিলে এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া "দেখা যা'বে" এইমাত্র বলিলেন।

একদিন তিনি স্নান করিবার জন্য সমস্ত শিষ্যবর্গ লইয়া গঙ্গ গেলেন এবং একগলা জলে নামিয়া সেই প্রিয় শিষ্যকে বলিলে "বৎস! আমার গামছাখানি লইয়া আইস"। ইহাতে শিষ্য উভ সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি কিরূপে গঙ্গাজলে পাদস্পর্শ করিবেন ই ভাবিয়া অস্থির হইলেন, এদিকে গুরুদেবের আজ্ঞা পালন না কর মহা অনর্থ। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি গুরু-আজ্ঞাই শিরোধার্য্য বিবে করিলেন, এবং গামছা হস্তে লইয়া জলে নামিতে উদ্যত হইলেন।

গুরুশক্তির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! গুরুর কৃপায় না হয় পৃথিবীতে এমন কার্য্য কি আছে। আমি নিতান্ত হতভাগ্য তাই স্বয়ং ভগবানকে গুরুরূপে পাইয়াও তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার কথায় বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলিতে পারিলাম না। গুরুদেব! তুমি দয়াময় দয়া করিয়া পাপীকে তোমার মহিমা বুঝাইয়া দাও যেন প্রত্যেক বস্তুতে তোমার শক্তি বুঝিতে পারি।

শিষ্য যেমন গঙ্গাজলে পা দিবেন অমনি প্রত্যেক পদের নিম্নে একটী করিয়া পদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল এবং তিনি তাহার উপর পা দিয়া অনায়াসে শ্রীগুরুকে গামছা দিয়া আসিলেন।

শিষ্য তোমার গুরুভক্তি ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসকে আমি কোটি কোটি নমস্কার করি। আজ জগৎ তোমার গুরুনিষ্ঠার ফল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তোমার নিকট শিষ্য হইতে শিক্ষা করুক। আমি অতি অধম আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার চরণধূলি লইয়া তোমার অটল ভক্তির কণামাত্রও শিক্ষা করিতে পারি।

তখন অপর অপর শিষ্যেরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, ও তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করত তাঁহার পদধূলি লইয়া সকলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

ভারতে বর্ণ-ভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বর্ণভেদে যে কর্ম্মভেদ হয় তাহা মুক্তি পথের অবরোধক নহে, ইহা গীতাতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে; —

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥"

অর্থাৎ যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, তিনিই মনুষ্য-মধ্যে বুদ্ধিমান্ ; তিনি সমস্ত কার্য্য করিয়া ও ব্রহ্মে যুক্ত থাকেন।

কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখিতে হইলে, কর্ম্ম কি এবং অকর্ম্ম কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। বিশ্ব সংসারমধ্যে কোন একটী ঘটনাকে কর্ম্ম বলিতে হইলেই তৎসম্বন্ধে লক্ষিত বা অলক্ষিত ভাবে কেহ কর্ত্তা আছে, ইহা ধরিয়া লওয়া হয়। কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই দুইটী আপেক্ষিক শব্দ। যেমন পিতা না থাকিলে পুত্র হইতে পারে না তদ্রূপ কর্ত্তা না থাকিলে কর্ম্ম হইতে পারে না। কর্ত্তা ও কর্ম্মে একটী বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এক্ষণে যদি কোন লোকে ভাবেন যে, তাঁহার আহার, বিহার ইত্যাদি কার্য্য তাঁহার নিজ শক্তিতে সম্পাদিত হইতেছে, তাহা হইলে তিনি আপনাকে কর্ত্তা ও উক্ত কার্য্যগুলিকে তাঁহার কৃত কর্ম্ম বলিয়া থাকেন। কিন্তু যদি তিনি ভাবেন, যে তিনি ত ঈশ্বরের সৃষ্ট, পালিত ও তৎ-কর্ত্তৃক সর্ব্বথা চালিত, তখন তিনি যে কোন চেষ্টা করেন, তাহাই ঈশ্বর-সৃষ্ট দেহযন্ত্রে তৎকর্ত্তৃক চালিত হইয়া সম্পাদিত হয়, এবং ঈশ্বরভিন্ন অন্য কর্ত্তা আর কেহই নাই, এই ধারণা আইসে। পূর্ব্বে যে সমস্ত চেষ্টা কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতেছিল, এই ভাবে দেখিলে তাহা জীবের কর্ম্মপদবাচ্য হয় না, অর্থাৎ জীবসম্বন্ধে তাহা আর কর্ম্ম থাকে না, তখন ইহাকে অকর্ম্ম বলা যায়। সেইরূপ আবার ভাবভেদে যদি কেহ সঞ্চ-রণ না করিয়া নিজদেহ একস্থানে নিশ্চলভাবে রাখেন, তাহাও নিজের চেষ্টা ও ইচ্ছা সাপেক্ষ ; কারণ বিনা চেষ্টায় কেহ আপনদেহ বহুক্ষণ এক অবস্থায় রাখিতে পারেন না। যদিও দেহাদি চালনা হইতেছে না বলিয়া এই অবস্থাকে অকর্ম্ম বা কর্ম্মশূন্য অবস্থা বলা যায়, কিন্তু প্র-কৃত পক্ষে তাহা নহে। আমার চেষ্টায় আমি দেহ নিশ্চল রাখিয়াছি এই ভাবে দেখিলে যাহাকে কর্ম্মশূন্য ভাব বলা যাইতেছিল, তাহার মধ্যেও কর্ম্ম রহিয়াছে। কর্ম্ম ও অকর্ম্মে এই ভেদের উপর দৃষ্টি রাখিলে এবং তাহাতে স্থির বিশ্বাস হইলে, সকল বর্ণই আপন আপন

নিয়মিত কর্য্যানুষ্ঠান করিয়া নৈষ্কর্ম্ম ও মুক্তি লাভ করিতে পারে। শ্রীহরিকে বিশ্বময় ভাবিলে ও বিশ্বাস করিলে, জগতে তিনি ভিন্ন আর কিছুই থাকে না ; এবং জীবের অহন্তা, মমতা সেই বিশ্বময়েরই ভাব-মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ।"

ভূতগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হইতেই হয়। ইহাতেই দেখা যাইতেছে, যে যদি সংসার-বন্ধন-মুক্তি উদ্দেশ্য হয়, বর্ণগত কার্য্য বৈষম্য কিছুতেই তাহার প্রতিবন্ধক নহে।

এক্ষণে দেখা যা'ক, বর্ণভেদে এই ভাবটি লাভ করিবার পক্ষে কিছু বিশেষ আছে কিনা ! হরি সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান, সমস্তই তাঁহার রূপ ও কার্য্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই, এই ভাবটীতে দুই প্রকার প্রতীতি হইতে পারে ;—(১ম) জ্ঞান দ্বারা, (২য়) বিশ্বাস দ্বারা। জ্ঞান দ্বারা যাঁহারা এই ভাব উদ্ভাবন করিয়া লোকদিগকে সেই ব্রহ্মের নিকট লইয়া যান, তাঁহারাই ব্রহ্মর্ষি বা ব্রহ্মজ্ঞানদাতা। নিজে উদ্ভাবন করিতে না পারিলে ও আমরা অপর বিজ্ঞ ব্যক্তির উদ্ভাবিত সিদ্ধান্তের উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁহার কথিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া ইষ্ট ফল লাভ করি ; ফলে কোনও বিশেষ নাই। তদ্রূপ যদি সংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিব নিকট ঐ ভাবটী কি এবং তাহা কি করিলে আসিতে পারে, তাহা শিক্ষা করি, ও তাহাতে বিশ্বাস করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করি, তাহা হইলেও ঐ উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সিদ্ধ হয়। তজ্জন্যই বলা হইয়াছে—"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ"। বর্ণ সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণের কার্য্য জ্ঞান প্রদান করা।

ব্রাহ্মণ জ্ঞানব্যবসায়ী এবং অপর বর্ণের ও পরস্পরের গুরু বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের পতনের সম্ভাবনা পদে পদে। জ্ঞানের চর্চ্চা করিতে গিয়া কুতর্কে পড়িয়া অনেক সময়, এই ভাবটির উপর সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা সেই তর্কের মধ্যে না গিয়া গুরুবাক্যে

গুহ্যতম সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের পতন নাই ; উঁহাদের প্রবলতর বিশ্বাসে ইষ্টসিদ্ধি অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে হইয়া থাকে। মাতার কথা এবং গুরুমন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া ক্ষত্রিয় শিশু ধ্রুব ধ্রুবত্ব লাভ করিয়াছিলেন! ওদিকে আবার রত্নাকরের কথা স্মরণ করুন। দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বহুকাল তপস্যার পর বল্মীকাবৃত হইয়া তাঁহার পর সিদ্ধি লাভ করেন ও বাল্মীকি-নাম প্রাপ্ত হয়েন।

কার্য্য সমস্তই যে অশুদ্ধ এবং তাহা ভাববিশেষে শুদ্ধ হয়, তাহাও গীতাতেই আছে,—

"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"

অর্থাৎ অগ্নি (জ্ঞানস্বরূপ) যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ সকল কার্য্যই দোষযুক্ত।

এইটী বুঝাইবার জন্য বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ বেদব্যাস ঋষি শ্রীভগবানের লীলা অশেস প্রকারে বর্ণন করিয়াও বিশ্বরূপত্বের বিঘ্ন কয়িয়াছেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

"রূপ নাহি আছে তব তুমি নিরাকার,
ধ্যানে কিন্তু বর্ণিয়াছি আকার তোমার,
বাক্যের অতীত তুমি নাহি তব সীমা,
স্তবে কিন্তু বর্ণিয়াছি তোমার মহিমা,
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তুমি আছ সমভাবে,
অমান্য করেছি তাহা তীর্থের প্রস্তাবে;

করেছি এ তিন দোষ আমি মূঢ়মতি,
ক্ষমা কর জগদীশ! অখিলের পতি!"

আর দেখ, দেবীরূপে ভগবানকে আরাধনা করিয়া বিসর্জ্জন করিবার সময় যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, "ক্ষমস্ব" ইত্যাদি, তাহারও এই উদ্দেশ্য।

এই ভাবেতে যে, কোনও ভেদ থাকেনা, সকল ধর্ম্ম ছুটিয়া যায় এবং ভেদ যে কেবল লৌকিক সমাজ রক্ষার জন্য তাহাও শ্রীভগবান গীতার শেষে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

সকল ধর্ম্ম ফেলে একমাত্র আমার শরণ লও, (সকল ধর্ম্মের সারভূত) আমিই তোমাকে সকল পাপ হইতে মোচন করিব। (ক্রমশঃ)

রিপুষড়্বর্গঃ।

(কামঃ শ্রেষ্ঠতমো রিপুঃ)

সংসর্গেণ চ সাধূনাং যোষিৎসঙ্গবিবর্জ্জনৈঃ।
দুর্জয়ঃ সংজিতঃ কামো দেহাশুদ্ধিবিচারণৈঃ॥

সাধুর সংসর্গ ভাই কর অনিবার,
নারীসঙ্গ হ'তে হও সর্ব্বথা বিরত,
দেহের অশুচিভাব করিয়া বিচার
দুর্জ্জয় কামেরে ভাই, কর পরাহত।

(ক্রোধো বিপৎসাধকঃ)

সর্ব্বাশুভপ্রদং ক্রোধং ক্ষময়া শান্তচিন্তয়া।
প্রফুল্লভাবমাশ্রিত্য সংজয়েৎ সর্ব্বদা সুধীঃ॥

সদা ক্ষমাশীল হও, ভাব শান্তিময়ে,
সদাই প্রফুল্ল ভাব কররে ধারণ;
কোথা রবে ক্রোধ সর্ব্ব-অশুভ-কারণ?
হে সুধি! অচিরে তাহা হইবে দমন।

(লোভঃ পাপস্য কারণম্)

আত্মনঃ শুচিরক্ষার্থং প্রাপ্তাপ্রাপ্তস্য বস্তুনঃ।
অশুচিত্বমনিত্যত্বং মত্বা লোভং বিনির্জ্জয়েৎ॥

আত্মার পবিত্র ভাব করিতে রক্ষণ,
অপ্রাপ্ত অথবা প্রাপ্ত সকল বস্তুর
অশুচি অনিত্য ভাব করিয়া বিচার
যতনে লোভেরে ভাই, ক'রে দাও দূর।

(মোহো জ্ঞানবিলোপকঃ)

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভাবাভাবন্তু দেহিনাম্।
বিবেকেনাবধায্যাথ সংজয়েৎ মোহমাত্মবান্॥

জীবের জনম মৃত্যু জরা আর ব্যাধি,
এই আছে—এই নাই—অনিত্য স্বভাব,
বিবেক বলেতে সদা করিয়া বিচার
হে বিবেকি! কর সদা মোহে পরাভব।

(অহঙ্কারঃ পরোরিপুঃ)

পরোপকারনিরতঃ পরোন্নতিবিবর্দ্ধকঃ।
ভূত্বা দীনস্বভাবোহি অহঙ্কারং বিনির্জ্জয়েৎ॥

পর-উপকার ব্রতে হইয়া নিরত,
পরের উন্নতি হেতু হও যত্নবান,
কর কর সদা ভাই! দীনতা আশ্রয়,
অচিরে অহংভাব হইবে দমন।

(মাৎসর্য্যং দুঃখকারণম্)

জীবানাং সুখদুঃখস্য ধাতারং শ্রীহরিং ধিয়া।
বিভাব্যান্যশুভদ্বেষং মাৎসর্য্যং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

শ্রীহরি জীবের সুখ দুঃখের নিদান—
ইহাই জ্ঞানের বলে করিয়া বিচার,
অন্যের মঙ্গল যেই দেখিবারে নারে
এরূপ মাৎসর্য্যে ভাই কর পরিহার।

প্রাণের কথা।

১। ভগবান সর্ব্বময়! আমরা কেন তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করি না? অভনুব করি না—কারণ "ভগবান সর্ব্বময়" এটী আমাদগের মুখের কথা, প্রাণের কথা নয়—ভগবানের সর্ব্বময় ভাবে আদৌ বিশ্বাস নাই। তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান,—বায়ুরূপে বীজন করিতেছেন, জলরূপে তৃপ্ত করিতেছেন, অন্নরূপে পুস্ট করিতেছেন, সূর্য্যরূপে আলোক ও উত্তাপ দিতেছেন,—তি.ন ত সর্ব্বদাই আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন; আমরা নেশায় বিভোব কিছুরই অনুভূতি নাই! সরল বিশ্বাসে তাঁহার উপাসনা করিলে নেশা ছুটিবে,—ভগবানকে সর্ব্বময় দেখিতে পাইব।

২। সংসারের জ্বালায় বড়ই ব্যতিব্যস্ত—স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণের চিন্তাতেই অস্থির—বেরুতে পারলে বাঁচি!! ভাই! কোথায় গিয়ে বাঁচ্‌বে?—সংসার স্ত্রী পুত্র নহে, সংসার গৃহ ক্ষেত্র নহে, সংসার বিষয় বিভব নহে,—সংসার মন। মনকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে? যদি সংসারের জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইতে চাও, ছুটাছুটী করিও না, স্থিরভাবে ভগবানের উপাসনা কর, গুরুপদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনকে ভগবদ্ভাবে ভাবিত কর, স্ত্রী পুত্র, গৃহ ক্ষেত্র, ভগবানের পার্ষদ বলিয়া জ্ঞান হইবে—শান্তি পাইবে—আনন্দ-সাগরে ডুবিবে।

৩। ভাই! সংসার-বন্ধন এঁড়াইতে চাও, একবার শ্রীভগবানকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ কর, যেন বন্ধনের কষ্ট বেশ বুঝিতে পারেন। তাহা হইলে আমাদিগকে আর বন্ধনাবস্থায় রাখিতে পারিবেন না। এস, একবার দয়াময়কে ভক্তিডোরে বাঁধি।

আগমনী গীতি ।

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা ।

ওই দেখ, রাণি, আসিছে ঈশানী,
তুষিতে তোমার তাপিত জীবন ।
আন পূর্ণ কুম্ভ, অর্ঘ্য, দূর্ব্বা, ধান্য,
আদরে উমারে করিতে বরণ ॥

অশুভ ভাবনা ভেব'নাকো আর,
সঙ্গে আছে উমার প্রাণের কুমার,
বৎস বিনায়ক সর্ব্ববিঘ্নহর
হরষে করিছে পুরে আগমন ॥

কার্ত্তিকের, বাণী, কমলারে ল'য়ে,
আসিছে শিবানী দশভুজা হ'য়ে,
অসুর-নাশিনী, কেশরি-বাহিনী,
ত্রিনয়না উমায় কর দরশন ॥

প্রাণের প্রতিমা উমা আগমনে,
আনন্দিত চিত ভারত সন্তানে,
যুক্তকরে সবে, "নমস্তস্যৈ' রবে,
করিতেছে দুর্গা নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥

হাসিছে কুসুম লুটাইতে পায়,
আনন্দে বিহঙ্গে সুমঙ্গল গায়,
ফুল্ল তরুদলে, নীহারের ছলে,
প্রেম-অশ্রু-জলে করে বরিষণ ॥

শুন শুন, রাণি, তায় স্রোতস্বিনী,
কুলু কুলু রবে করে হুলুধ্বনি,
স্নিগ্ধ সমীরণ, করে সঞ্চরণ,
প্রাণ-উমা অঙ্গে করিতে বীজন ॥

বহু পুণ্যফলে পেয়েছি রতনে,
যতনের ধনে রাখগো যতনে,
সন্তাপ সকল, হবে সুশীতল,
উমা ধনে কর হৃদয়ে ধারণ ॥

ধন্য হ'ল আজি হেমন্তের পুরী,
হেরিনু শঙ্করী মনপ্রাণ ভরি',
ধন্য ধন্য দীন- হেমন্ত জীবন,
কলুষ-কলাপ হ'ল বিমোচন ॥

[গান]

আলাইয়া—একতালা।

অসুরনাশিনি শিবে!
হৃদয়ে এসগো মোর ॥

মধু ও কৈটভ হিংসা মোহ রূপে
ডুবাইছে মাগো অজ্ঞানের কূপে,
জ্ঞানচক্রে কেটে, বিষ্ণুমায়ারূপে!
ভেঙ্গে দাও ভব ঘুমের ঘোর ॥

মহিষ অসুর ক্রোধ অবতার
লণ্ড ভণ্ড করে রাজত্ব তোমার,
মহাসিংহে চড়ি এস একবার
শেষ কর তার বিষম জোর ॥

চণ্ড মুণ্ড মহাপশু দুইজনে
মদগর্ব্বরূপে মাতাইছে মনে;
অসি করে আসি অসিতবরণে,
কর মা! তাদের দরপ চূর ॥

কাম রক্তবীজ মনের মাঝারে
জনমিছে মাগো! হাজারে হাজারে,
করাল বদনে গ্রাস কর তারে
নাশ কর মম বিপদ ঘোর ॥

শুম্ভ ও নিশুম্ভ লোভ ও মাৎসর্য্য
হরিবারে চায় তোমার ঐশ্বর্য্য,
হুঙ্কারে হরিয়ে তাহাদের বীর্য্য
ছিন্ন কর মম করম ডোর ॥

অসত্যনাশিনি! পাল নিজ সত্য
হৃদিমাঝে আসি নাশ দুষ্ট দৈত্য,
নহিলে তোমার সুখের রাজত্ব
দুখের সাগরে ভাসিল মোর ॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

"ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎ কিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎসমম্॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ।

গোরা মোর দয়ার অবধি গুণ নিধি।
সুরধনী তীরে নদিয়া নগরে
গোরাঙ্গ বিহরে নিরবধি॥
ভুজযুগ আরোপিয়া ভকতের কান্ধে।
চলিতে না পারে গোরা হরিবোল বলিয়ে কান্দে।
প্রেমে ছল ছল নয়ন যুগল,
কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পূরল সব কলেবর
ধরণী ধরিতে নারে॥
সঙ্গে পারিষদ ফিরে নিরন্তর,
হরি হরিবোল ব'লে।
সখার কান্ধে ভুজযুগ দিয়া
হেলিতে দুলিতে চলে॥
ভুবন ভরিয়া প্রেম উভরিল
পতিত পাবন নাম।
শুনিয়া ভরসা পরমানন্দের
মনেতে না লয় আন॥

প্রার্থনা।

কে আনিল মধুর মৃদঙ্গ করতাল ?
কে আনিল হরিনাম শ্রবণ মঙ্গল ?
কে শিখা'ল ভক্তি প্রেম জগত জনেরে ?
কে ভাসা'ল আচণ্ডালে আনন্দ সাগরে ?
আপনি আচরি' কেবা শিখায় আচরণ ?
হরি হ'য়ে হরি বলে বিলায় নামধন ?
অঞ্জলি পাতিয়া কেবা পাপরাশি যাচে ?
পাপ ল'য়ে বাহুতুলে হরি ব'লে নাচে ?
কাঁদায়ে জননী প্রিয়া ভকত জনেরে
পাপী তরাইতে কেবা ফিরে দ্বারে দ্বারে ?
দয়ার ঠাকুর হেন কেবা আছে আর ?
পতিত পাবন গোরা কৃপা পারাবার !
মো সম পাতকী ভবে কেহ নাহি আর ;
মোহ বশে না লইনু শরণ তাঁহার।
নিজ গুণে কর দয়া প্রভু গৌরহরি !
পতিত পাবন নাম জগতে প্রচারি' ॥

ভারতে বর্ণ-ভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বর্ণভেদের মূল কারণ যাহা দৃষ্ট হইল তাহা হইতে পরস্পর আচার ও ব্যবহার সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তগুলি সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়,—

১। প্রত্যেক বর্ণের অপর বর্ণের সহিত কৃতজ্ঞভাবে থাকা এবং আচারে তাহা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। কেহ কাহারও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেও তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান না করিয়া তাহার আদর করা উচিত।

২। কোনও বর্ণ হেয় নহে, এবং প্রত্যেক বর্ণের স্বধর্ম্মে অর্থাৎ শাস্ত্রবিধানোক্ত নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। তাহাতে

ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত সুফল লাভ হয় ; যথা গীতায়—

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"

সকল বর্ণের ধর্ম্মানুযায়ী সমস্ত কামনা ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁহা হইতেই সমস্ত প্রবৃত্তি উদ্ভূত হয়। যে হেতু সমস্ত ভূতের প্রবৃত্তির এক মাত্র কারণ তিনি ; এবং ভূতদেহ ও তাহার ইন্দ্রিযাদির প্রবৃত্তি তাঁহার "যোজনা-সম্ভূত"। জাগতিক সমস্ত ব্যাপারেই তিনি ব্যাপৃত। নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহারই কার্য্য করা হয় এবং তাহাই তাঁহার অর্চ্চনা ও মানবসিদ্ধির কারণ।

বর্ত্তমান সমাজে, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠবণ তাহারই মুক্তি হইবে, অপর বর্ণের মুক্তি নাই, এই ধারণাবশতই বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের "স্বকর্ম্মণা" শব্দের অর্থ "আত্মকর্ম্ম" বা "প্রাণায়াম" এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু উহার অর্থ যে এরূপ নহে তাহা পূর্ব্ব ও পরের শ্লোক কয়েকটীতে স্পষ্ট বুঝান হইয়াছে। উহার মধ্যে একটীর কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।"

ইহা হইতে আরও দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ করিয়া কার্য্য করিলে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীরও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবার কোনও বিশেষ কারণ দেখা যায় না। যজ্ঞোপবীত ত্রিরাবৃত্ত প্রণবাত্মক ব্রহ্মমন্ত্র। এক মাত্র ব্রহ্মসূত্র মায়াগ্রন্থিদ্বারা ত্রিরাবৃত্ত হইয়াছে, এই ধারণা যাহাতে ধারণকর্ত্তার অহরহ মনে থাকে এবং দেখিয়া যাহাতে অপর বর্ণ ঐ জ্ঞান লাভ করিতে পারে সেই জন্য ব্রহ্মমন্ত্র প্রচারকেরা উহা ধারণ করিবার বিধান করিয়াছেন। যদি ঐরূপ ধারণা না করিয়া যজ্ঞোপবীত "ঘুন্‌শীর" বদলে চাবি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে উহা ত্যাগ করায় ক্ষতি নাই।

৩। বর্ণধর্ম্ম রক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধন করিতে হইলে সবর্ণের মধ্যে বিবাহাদি হওয়া কর্ত্তব্য ; তাহাতে বর্ণোচিত কার্য্যে পটুতা জন্মে।

তন্তুবায়ের রাজকন্যার সহিত বিবাহে যে বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহার গল্প সকলেই জানেন। বর্ণসঙ্কর হইলে প্রজা নষ্ট হয়, তাহা গীতাতেই প্রকাশ আছে। পৈত্রিক ধর্ম্ম যে সন্তানে বর্ত্তায় এবং তাহার চেষ্টায় যে উহার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধন হয় তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

৪। বর্ণ-ধর্ম্ম পুরুষানুক্রমে চলিলেই জাতির উৎপত্তি হয়। জাতি-অনুসারে কার্য্যাধিকার জন্মে। জাতিগত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায়ী হইলে স্বজাতিভ্রষ্ট হয়, এবং যে জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করে, সে জাতির সহিতও মিলিতে না পারায় মহা গোলোযোগ উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান সমাজে বর্ণ-ধর্ম্ম-রক্ষার উপর লক্ষ না থাকায় এই মহা অনর্থ ঘটিতেছে।

৫। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহার প্রত্যেকেরই আত্মোন্নতি, সামাজিক উন্নতি ও এক ঈশ্বরের তুষ্টিসাধনই উদ্দেশ্য। দেশ কাল ভেদে ঈশ্বরের নাম পৃথক পৃথক হওয়ায়, এবং আচারের বৈষম্য থাকায়, একমাত্র মহেশ্বর যে সকলেরই উপাস্য তাহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার বিশেষ বিশেষ নাম ধরিয়া যেরূপ ভিন্নধর্ম্মীর মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, বর্ণভেদেও সে দোষ বর্ত্তমান আছে। ভেদজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। কিন্তু ঐ ভেদ যে লৌকিক, কেবল সমাজ রক্ষার জন্য আবশ্যক এবং তাহার সহিত পরমার্থের কোন সংস্রব নাই, এই কথা মনে রাখিলে সে অনর্থ ঘটার সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য সকলেই এক পদার্থ হইলেও একজনের দণ্ডাজ্ঞায় অপরের প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ হইতেছে; সমাজের মধ্যে থাকিতে হইলে এই বন্ধন স্বীকার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অতএব বর্ণ-ধর্ম্মানুসারে পরস্পরের মর্য্যাদা রক্ষা এবং ঐ ধর্ম্মনিষ্ঠ-গুণানুসারে পরস্পরের প্রভুত্ব ও বশ্যতা স্বীকার করা সকলের কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই পিতা পুত্র, পতি পত্নী, ভ্রাতা ভগিনী, ভর্ত্তা ভৃত্য, ইত্যাদি অনন্ত সম্বন্ধ ভেদে শাস্ত্রে নানাপ্রকার কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা

আছে। কিন্তু সকল বর্ণ সম্বন্ধেই তাহা প্রায় এক, এবং তৎসম্বন্ধে বিস্তার করিতে হইলে প্রবন্ধটী অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে; তজ্জন্য আর বিস্তার করা হইল না। তবে ঐ সকল বিষয়ে সাধারণতঃ এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে প্রাচীন বিজ্ঞেরা যে বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করা এবং তাহা যথাসাধ্য পালন করা কর্ত্তব্য। আমরা বেশী বুঝি এরূপ ভাবিয়া ঐ সকল বিধি তুচ্ছ জ্ঞান করা ও ভঙ্গ করা উচিত নহে। সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আত্মোন্নতি এবং ঐহিক ও পারত্রিক সুখই ইহার একমাত্র লক্ষ্য, তাহা বিশেষ প্রতীয়মান হইবে।

পরিশেষে পাঠকবৃন্দ! তোমাদিগের নিকট আমার একমাত্র নিবেদন যে, যাহার শক্তিতে গমনশীল জগতের সমস্ত কার্য্য চলিতেছে এবং চালকস্বরূপে যিনি সকলকে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম দিয়া নিজ নিজ পথে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ এবং ধর্ম্মের অবমাননা করিলে তাঁহারই অবমাননা করা হয়, ইহা সতত মনে রাখিয়া অভিমানশূন্য হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অহরহ প্রবৃত্ত হও। তিনি তোমাদিগকে শক্তি দিন, ইহাই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা!

হরে ওঁম্॥

সঙ্কীর্ত্তন।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরববিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমাদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥”

দীনদয়াল কাঙালের ঠাকুর পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কলিভাবাপন্ন মলিন জীবের প্রতি কৃপা করিয়া ভক্তবেশে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীভগবানের নামই আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়, তাহা তিনি স্বয়ং কাঙাল বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। দয়াল ঠাকুর কারুণ্য বারিতে প্লাবিত হইয়া বলিয়াছেন, ‘ভাই! একবার হরি বল’; প্রভু আমার রজককে হরি বলাইবার জন্য তাহার কাপড় কাচিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মরি! মরি! কি অপার করুণা! কি বৎসলতা!!

উপরে যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের মুখপদ্মনিঃসৃত পিয়ূষ; ঐ দুইটী শ্লোকের মর্ম্মগ্রহণ করিলে বাস্তবিকই অমৃতত্ব লাভ হয়। প্রভু বলিতেছেন, যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনে হৃদয়দর্পণের সমস্ত মলিনতা বিদূরিত হয়, যাহাতে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সম্পূর্ণ রূপে নিবৃত্ত হয়, যাহা নিখিল মঙ্গলদায়ক এবং বিদ্যাদেবীর জীবন স্বরূপ, যাহার অক্ষরে অক্ষরে সুধা ক্ষরিত হইতেছে, সেই পরমানন্দ বিবর্দ্ধক, মনপ্রাণস্নিগ্ধকর শ্রীকৃষ্ণনাম পরম জয়যুক্ত হউন। প্রভু ভক্তভাবে জীবশিক্ষার জন্য আরও বলিতেছেন,—ভগবানের অসীম করুণা! দয়াময় অনন্ত নাম ধারণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক নামেই আপনার সমস্ত শক্তি নিহিত করিয়াছেন, আমি যে কোনও নাম গ্রহণ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারি। অধিকন্তু এতই দয়া! স্মরণ কি নাম গ্রহণের কালাকালও নির্দ্দেশ করেন নাই, যখন ইচ্ছা নাম লইতে পারি। কিন্তু হায়! আমি এমনই হতভাগ্য এই নামে আমার কিছু মাত্র অনুরাগ জন্মিল না।

“হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥”

কলিযুগে নাম বিনা আর গতি নাই, নাম-সংকীর্ত্তনই কলির মলিন জীবের একমাত্র সুগম ও শ্রেষ্ঠ পথ। সত্যযুগে ধ্যানধারণাদ্বারা, ত্রেতায় যাগযজ্ঞাদিদ্বারা, এবং দ্বাপরে অর্চ্চনাদিদ্বারা জীবের পরমা গতি লাভ হইয়াছে। সত্যযুগে লোকসকল সত্যস্বরূপ ভগবানের ভাবে ভাবিত ছিলেন, বিষয়াদিতে তাঁহাদিগের বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। তাঁহারা আত্মারাম ভগবানকে অন্তরে অন্তরে উপাসনা করিতেন, তাঁহারা মুক্ত। ত্রেতায় লোকের বহির্জাগতিক বস্তুতে কিছু কিছু প্রেম হইয়াছিল, যজ্ঞাদিদ্বারা জাগতিক বস্তু সকল শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া তাঁহারা ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইতেন। দ্বাপরের লোকের ভোগবাসনা কিছু জন্মিয়াছিল, জাগতিক বস্তু—বিষয়াদি তাঁহাদিগের সুখসম্ভোগের নিমিত্ত, এইরূপ ধারণা ছিল বলিয়া, শ্রীভগবানের সেবায়—তাঁহার প্রীতির জন্য ঐসকল বস্তু নিয়োজিত করিয়া ভগবদ্ভাব লাভ করিতেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগেই লোকের শ্রীভগবানে (ন্যূনাধিক) বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা জানিতেন ভগবদ্ভাবই সুখশান্তি-নিকেতন, তাই তাঁহারা বিষয়াদিতে অল্পাধিক লিপ্ত থাকিলেও ভগবানেই তাঁহাদিগের অধিক আসক্তি ছিল। আমরা কলির বিষয়াসক্ত বহির্মুখ জীব আমাদিগের সে বিশ্বাস নাই, সে জ্ঞান নাই। সৌভাগ্যক্রমে কাহারও কাহারও সে বিশ্বাস থাকিতে পারে; কিন্তু কেবল বিশ্বাস থাকিলেই কাজ হইবে না। মহারাজ বড় দাতা, দরিদ্রের প্রতি তিনি মুক্তহস্ত, কেবল এই বিশ্বাস রাখিয়া নিশ্চেষ্টভাবে ঘরে বসিয়া থাকিলে অথবা ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিলেই দুঃখ ঘুচিবে না; রাজার নিকট যাওয়া চাই, আপনার দুঃখের কথা বলিয়া কাঁদা চাই, তাঁহাকে জানান চাই আমি প্রকৃত দরিদ্র, তবে তিনি অর্থ দিবেন, তবে দুঃখ ঘুচিবে। ভগবান দয়াময়, ভগবান জীববৎসল, দীনবন্ধু, ভগবান অগতির গতি, কাঙালের ঠাকুর; কিন্তু আমরা আসক্তিজড়িত, মায়াবদ্ধ ঘূর্ণায়মান কালচক্রে নিষ্পেষিত ও ভ্রাম্যমাণ হইয়াও নিশ্চেষ্ট, আত্মোন্নতির জন্য

কিছুমাত্র উদ্যম নাই। আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা যে কেহ আছেন, আমাদিগের দুঃখের দুঃখী যে কেহ আছেন, আমাদিগের নয়নজল মুছাইবার জন্য যে স্নেহময় পরমপিতা শ্রীভগবান বিদ্যমান আছেন, এভাব অনেকের আদৌ নাই। অতএব পরমার্থ লাভ করিয়া দুঃখনিবৃত্তি করিবার উদ্যম নাই। কেহ কেহ জানেন বটে ভগবান দয়াময় দুঃখবারণ, কিন্তু তাঁহারা মোহমুগ্ধ—অহংকারী, আপনারা ছুটাছুটী করিয়া ক্রমেই আবদ্ধ হইতেছেন। তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না যে, ভগবানের নিকট কাঁদিয়া আত্মনিবেদন করেন। কাজে কাজে দুঃখেরও অবসান নাই।

ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন না করিলে, ভগবানকে প্রাণের প্রাণ পরম সুহৃৎ জ্ঞান করিয়া তদ্ভাবে ভাবিত না হইলে, শান্তি কোথা? শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

'সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।'

আমাকে সর্ব্বজীবের পরম বন্ধু জানিয়া আমাতে নির্ভর করিলে জীবের চির শান্তি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কিপ্রকারে সে ভাব আসিবে? আমাদিগের আয়ুঃ অতি অল্প, তাহাতে আবার রোগ শোকাদি নানা বিঘ্ন; মন অতিশয় চঞ্চল, নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর বিষয়াদিতে আসক্ত হইয়া গাম্ভীর্য্য ও স্থিরতা একেবারে হারাইয়াছে; প্রাণ অন্নগত; ধ্যানযোগে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করা আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। যে পথে সত্যযুগের সত্য-সংকল্প মহাত্মাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, ক্ষুদ্রচেতা মায়ামুগ্ধ হইয়া আমরা সে পথে কিরূপে যাইব। ত্রেতাযুগের যাগ-যজ্ঞরূপ যে পথ তাহাও আমাদিগের নিকট অবরুদ্ধ। কারণ, একে আয়ুঃ অল্প, তাহাতে ধৈর্য্য কিছুমাত্র নাই,—'গাছে না উঠিতে এক কাঁধি' আশা করিয়া থাকি, স্বার্থসিদ্ধিই আমাদিগের সংকল্প, আত্মোন্নতি বা ভগবৎপ্রীতি সাধন আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে; অধিকন্তু যজ্ঞীয় দ্রব্য সকলও এখন অতি দুর্ল্লভ। এইবার দ্বাপরের অর্চ্চনা ও পরিচর্য্যারূপ পথ।—কিন্তু চিত্ত স্থির না হইলে কিছুই হইবে

না। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি দ্বার দিয়া বিষয় সকল প্রবেশ করতঃ প্রলোভন দেখাইয়া মনকে কোথায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, এই চঞ্চল মন লইয়া অর্চ্চনাদি কিরূপে সম্ভব হয়? এখন উপায় কি?

আমরা বড়ই নিরাশ্রয়! অত্যন্ত দয়ার পাত্র! তাই অনাথশরণ দীনদয়াল শ্রীভগবান স্বয়ং কাঙ্গাল বেশে দীন হীন অনাথ কাঙ্গালগণের মধ্যে আসিয়া কলির জীবের একমাত্র উপায়—নাম সংকীর্ত্তন শিক্ষা দিয়াছেন। প্রভু গয়াধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমতঃ আপনার ছাত্রগণকে লইয়া উচ্চরবে নাম সংকীর্ত্তন করেন। প্রভু হাতে তালি দিয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতে করিতে শিষ্যগণের সহিত গাহিয়াছিলেন,

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।
(যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ)
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

সকলে প্রেমভরে উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, কেহবা হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন, কেহবা গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীনবদ্বীপে শুভ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। ক্রমে এই সঙ্কীর্ত্তন খোল করতাল লইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল, ক্রমে সহস্র সহস্র লোক নাচিয়া গাইয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণাশ্রয় করিল। এই ঘটনাটী পদকর্ত্তা বাসুঘোষ একটী পদে নিবদ্ধ করিয়াছেন,—

আমার পরশমণির কি দিব তুলনা?
পরশমণির গুণে, জগতের জীবগণে
নাচিয়া গাইয়া হইল সোনা॥

এই নাম সংকীর্ত্তনই—পতিত পাবন, কাঙ্গালের ঠাকুর, দীনদয়াল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত এই নাম সংকীর্ত্তনই—কলির জীবের পরমার্থ লাভের উপায়। নাম সংকীর্ত্তনই ভগবদ্ভাব লাভ করিবার অতি সরল, সুগম ও শ্রেষ্ঠ পথ। আমরা যেরূপ চঞ্চল ও লঘুচিত্ত,

প্রভুও তদ্রূপ নাচ গানের ভিতর দিয়া শ্রীভগবানকে পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। চিত্ত যতই চঞ্চল হউক না কেন, এই সংকীর্ত্তনের ভিতর প্রবেশ করিলে নিশ্চয়ই ক্রমশঃ ভগবচ্চরণাসক্ত হইবে। ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বিষয় আসিয়া মনকে টানিয়া লইয়া যাইবে, কিন্তু সংকীর্ত্তনকালে ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি সমস্তই অবরুদ্ধ থাকে; বিষয় কিরূপে প্রবেশ করিবে? খোল করতালের মধুর শব্দ ও হরিনামের গগনভেদী ধ্বনি সত্ত্বে কি বিষয়ের গঞ্জনা কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে? চক্ষু মুদ্রিত থাকিতে, অথবা ভক্তগণের প্রতি, কি শ্রীভগবল্লীলা-ঘটিত কোনও চিত্রে আসক্ত থাকিতে কি অন্য রূপ সেখানে স্থান পাইতে পারে? রসনা শ্রীহরিনামরসে মজিয়া থাকিতে অন্য রসা-স্বাদনে অবসর বা প্রবৃত্তি কোথা? গাত্র প্রেমভরে ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া ভক্তপদরজের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া কি সে সময়েরজন্য অন্য সুখের অভিলাষ করিতে পারে? আজ সেই উদ্দণ্ড নৃত্য—আজ সেই মন মাতোয়ারা খোল করতালের মধুময় ধ্বনির সহিত স্বতঃ প্রবৃত্ত ভাবময় নৃত্য আরম্ভ হইলে কি অন্য ভাবের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়? বাস্তবিকই এই মধুময় ভাব সম্বলিত মধুর সংকীর্ত্তনে মনের চঞ্চলতা, মনের অহংকার ও সন্দিগ্ধভাব সমস্তই বিলুপিত হইয়া যায়। মন উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবাবেশে বিভোর হইয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে গড়াইয়া পড়ে।

প্রভু নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিলেন—প্রভু হাতে তালি দিয়া, খোল করতাল লইয়া, নাচিয়া নাচিয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে মধুময় শ্রীনাম প্রচার করিলেন। প্রভু হেলিয়া দুলিয়া প্রেমভরে বলিতেছেন—"হরি হরয়ে নমঃ" আবার কখন বলিতেছেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম॥

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

যেই কোনও ভক্ত দেখিতেছেন, অমনি অকিঞ্চন ভাবে তাঁহার চরণ-তলে পতিত হইয়া কাতর স্বরে বলিতেছেন,—"আমায় দয়া কর, তোমরা কৃপা করিলেই শ্রীভগবানের কৃপা হইবে।" প্রভু আমার দীনাতিদীন—অবনত মস্তক, সর্ব্বাঙ্গ ধূলিময়, পরিধান মলিন বস্ত্র, রুক্ষ কেশ, অবিরল নয়নধারায় বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতেছে। নদের রাজা, পণ্ডিত শিরোমণি নিমাইচাঁদ আজ তৃণাদপি সুনীচ, আজ শচীর প্রাণ ধন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়বল্লভ, ভক্তগণের প্রাণের প্রাণ, কাঙাল হইতে কাঙাল। আহার নাই, নিদ্রা নাই—মৃণাল সদৃশ কোমল অঙ্গ কঙ্করময় কঠিন ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত, সর্ব্বাঙ্গে পুলক ও কম্প, মুখে মঙ্গলময় চিরশান্তি দাতা হরি নাম। প্রভুর বিচিত্র লীলা।

প্রভুর এই সমস্ত লীলা, রাজরাজেশ্বরের এই অকিঞ্চনতা, পণ্ডিতাগ্রগণ্যের এই অসামান্য বিনয়িতা, ধর্ম্মময় শ্রীভগবানের এই দৈন্যতা, কলই জীব শিক্ষার জন্য, সমস্তই কলির মলিন দুর্ব্বল জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য। যিনি কলিভাবাপন্ন নহেন, যিনি দুর্ব্বল নহেন, যাহার চিত্ত পাপে কলুষিত হয় নাই, যাঁহার স্থির বিশ্বাস আছে যে, নিজ শক্তিতে ধ্যান ধারণা যাগযজ্ঞাদি করিয়া পরমপদ লাভ করিতে পারিবেন, তিনি এ শিক্ষা গ্রহন না করিতে পারেন, তিনি এই পথ অবলম্বন না করিতে পারেন। কিন্তু আমরা—যাহারা অতি দুর্ব্বল, দুপা হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ি, যাহাদের পদে পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা, হাত ধরিয়া না লইলে যাহাদিগের চলিবার শক্তি নাই, পাপধূলিতে যাহাদিগের চক্ষুঃ অন্ধ হইয়াছে, বিষয়াসক্তিরূপ নিগড়ে যাহাদিগের পদ আবদ্ধ—আমাদিগের দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন উপায় নাই। কে এমন আছেন পাপী তাপীকে কোলে করিয়া লইবেন? কাঙ্গালের সহিত কাঙাল সাজিয়া কে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন? দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন এমন আর কে আছেন? তাঁহার অনুসরণ করা,

শ্রীগৌরাঙ্গ আগে আগে হরিবোল ব'লে নেচে নেচে যে পথে লইয়া যাইতেছেন সেই পথে গমন করাই আমাদিগের একমাত্র উপায়। এমন সুগম, এমন প্রশস্ত পথ আর কোথায় পাইব। (ক্রমশঃ)

চিররুগ্নের চিন্তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে সাধনা-প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ উপায় শ্রবণ কর। প্রথম, দিবসের এক সময় মনকে আত্মচিন্তায় ব্যাপৃত করিবে; প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, সে দিন যে যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তাহার নিমিত্ত অনুতাপ করিবে, এবং যাহা কিছু সৎকার্য্য করিয়াছ, তাহার নিমিত্ত সেই দয়াময়কে ধন্যবাদ দিবে। অভিমান করিও না অভিমান ধর্ম্মপথের একটি মহা কণ্টক। অনেক সময় তস্করে আমাদের মনমধ্যে এরূপ গোপনে অবস্থান করে যে বিশেষ অনুসন্ধা পূর্ব্বক তাড়না না করিলে, অচিরে তাহারা যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অনায়াসে পলায়ন করিতে পারে। সুতরাং সময় থাকিতে সামর্থ থাকিতে আত্মপরীক্ষা দ্বারা দস্যুদিগকে ধৃত করিতে জীবন-পণ চেষ্ট কর। অলসতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজকে পরীক্ষা কর, ও শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ কর, দয়াময় তোমার সহায়তা করিবেন।

আত্মচিন্তা করিতে অভ্যাসের প্রয়োজন; নিয়ম পূর্ব্বক আত্মচিন্তা করা ধর্ম্মজগতে উন্নত হইবার প্রথম সোপান। কিন্তু বিঘ্ন এই, ইহা অনেক সময়ে অপ্রীতিপ্রদ হয়, কেননা আত্মপরীক্ষায় নিজের অনেক দোষ উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে; তাই আমরা আত্মচিন্তা করিতে বিরত থাকি। নিজের দোষ আলোচনা করিতে মানসিক বলের প্রয়োজন। আমরা স্বভাবতঃই প্রসংসাপ্রিয়, কাজেই নিজের দোষ চর্চ্চা করা কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। এই স্বভাব-দৌর্ব্বল্যই আমাদের সর্ব্ব-নাশের কারণ, ইহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ না করিলে আমাদের উন্নত

হইবার আর আশা নাই। এদিকে আত্মপরীক্ষা ব্যতীত আমরা স্ব স্ব অভাব বুঝিতে পারি না, অভাব না জানিলে তাহা মোচন করিব কি রূপে? আরও ভাবিয়া দেখ, আত্ম-চিন্তাভ্যাস ব্যতীত আমরা পর-চর্চ্চায় সর্ব্বদা নিযুক্ত। পরের দোষ আলোচনা করিতে আমরা অধিক-তর পটু। হায়! হায়! সর্ব্বনাশের আমাদের আর বাকি কি? নিজের মম যে নরকে পূর্ণ তাহা ভাবি না।

যিনি আত্মচিন্তা করিতে ভাল বাসেন, তাঁহার পক্ষে পরচর্চ্চা করা অসম্ভব। পরচর্চ্চা করা তাঁহার নিকট নীচপ্রবৃত্তি সম্ভূত কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশেষত আত্মচিন্তাশীল ব্যক্তি আপনাকে অধিক দোষী মনে করেন, পরচর্চ্চা করিতে তাহার রুচিই হয় না। এরূপ আত্মচিন্তা করিতে যিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন, দিবসের এক সময় কেন, প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি নিজকে পরীক্ষা করিতে যত্নবান হয়েন। এবং অনুতাপ দ্বারা ক্রমে চিত্তের নির্ম্মলতা বিধান পূর্ব্বক সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি আত্মাতেই রমণ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকেন। এই আত্মরাম ভাব যিনি লাভ করিয়াছেন, তাহার পাইবার আর কিছু বাকি থাকে না; মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য তিনি সাধন করিলেন।

আত্মচিন্তা সৌকার্য্যার্থে আমাদের সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। এমনকি সাধুসহবাসই আমাদিগকে আত্মচিন্তায় প্রযোজিত করে। মন সর্ব্বদা নিম্নগামী। সম্মুখে উচ্চ আদর্শ থাকিলে পতনোন্মুখ ব্যক্তির চিত্তেও উঠিবার আশা জাগরিত হয়। মহতের প্রতিশিক্ষা, প্রতি-কার্য্য আমাদিগকে পুরুষোচিত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। শিক্ষা আমা-দের সকল সময়েই প্রয়োজন। পদে পদেই আমাদের পদস্খলন হই-তেছে, সুতরাং সঙ্গে কোন অবলম্বন না থাকিলে আমরা কখনই স্থির থাকিতে পারিনা। সাধুসঙ্গই আমাদের সেই অবলম্বন। ঘোর অমা-নিশার অন্ধকারে মহতের শিক্ষাই আলোকরূপে আমাদিগের পথ প্রদর্শক। যেমন আগ্রহের সহিত আমরা সাধুসঙ্গ লাভ করিতে যত্নবান হইব, সেইরূপ যত্নের সহিত আমরা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ

করিব —"দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ" (নারদভক্তিসূত্র) ; এবং দুশ্চিন্তাকে মনমধ্যে স্থান দিব না। বিষয়-ভোগ-চিন্তাই দুশ্চিন্তা, আর তাহা হইতেই আসক্তি জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,---

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে"

আসক্ত চিত্তে বিষয়ের সেবা ও শ্রীভগবৎসেবা একত্র হইতে পারেনা। অথচ বিষয়ের দাসত্ব করিয়া তোমার প্রাপ্য বস্তু পাইবেনা ; গীতায়---

"সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

তাহা হইলে বিষয়াসক্তির কি পরিণাম দেখ, প্রথমে কাম, তার পর ক্রমান্বয়ে ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিবিভ্রম, বুদ্ধিনাশ, অবশেষে বিনাশ। হায়! হায়! তবুও আমরা বিষয়সম্ভোগে লালায়িত!

এইরূপ সাধুসহবাসে যখন আমরা স্ব স্ব পূর্ব্বকৃত কুকার্য্য স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হই এবং মনের উপর ইন্দ্রিয়নিচয়ের সম্পূর্ণ আধিপত্য দর্শনে একান্ত ব্যথিত হইয়া আপনাদিগকে উপায়হীন মনে করি, সেই সময় দয়াময় ভগবান আমাদিগের কাতরতা দর্শনে কৃপা করিয়া এই বিপদসঙ্কুল সংসারারণ্যে একমাত্র সহায়, এই দুস্তর তরঙ্গায়িত অনন্ত ভবজলধিতে একমাত্র তরি, নিঃস্বার্থ প্রেম ও জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে অভয় দানার্থ আমাদের নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীগুরু পাদ-পদ্ম-আশ্রয়ের উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। ইহা আমাদের অবস্থাবিশেষে অনুভবের বিষয়।

ভক্ত-নিষ্ঠা।

ভক্ত ভগবানের প্রেমের পাত্র। ভক্তের সহিত ভগবানের ভালবাসা সম্বন্ধ। তাঁহাকে না দেখিলে ভক্ত একদণ্ডও বাঁচেন না, এবং

ভক্তকে ছাড়িয়া ভগবানও থাকিতে পারেন না। তিনি লতা গুল্মের ভিতর দিয়াও ভক্তকে দেখেন ও দেখা দিয়া থাকেন। দয়াময় স্তম্ভের ভিতর হইতে নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রহ্লাদকে দেখা দিয়াছিলেন; মার্কণ্ডেয়কে শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া মঙ্গলময় শিবরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন; পরীক্ষিৎ যখন মাতৃ-উদরে, দয়াময় বিষ্ণুতেজঃ হইয়া তাহাকে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্তের প্রেমে ভগবান আবদ্ধ;—যিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি অসীম অনন্ত, ভক্তের সরল হৃদয়ের সরল বিশ্বাসে আবদ্ধ হইয়া তিনি সীমাবদ্ধ জীবের ন্যায় লীলা করিয়া থাকেন—স্বেচ্ছাময় হইয়া ভক্তেচ্ছার অধীন হইয়া থাকেন। ভক্তের অপার মহিমা!

ভক্ত, তোমাকে নমস্কার। আজ তোমার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে সরলতা ও ভক্তি শিক্ষা দাও। আমি বড়ই অবিশ্বাসী, ভগবান আমার ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, তাঁহাতে ত আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ও ভক্তি নাই, তোমার বিশ্বপ্রেমিকতা, তোমার পরোপকারিতা, তোমার নিঃস্বার্থতা প্রত্যক্ষ করিয়াও তোমাতে বিশ্বাস ও ভক্তি করিতে পারিলাম না। ভক্ত দেখিলেই সন্দেহ হয়, বুঝি কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্য, বুঝি আমাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য, আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কোনও ভণ্ড সাধু সাজিয়া আসিতেছে। নিজে কপটাচারী চোর বলিয়া সমস্ত জগৎকে কপটাচারী মনে করিতেছি, অনধিকারী হইয়া পরের দ্রব্যে সত্ত্ব স্থাপন পূর্ব্বক "আমার, আমার" করিয়া আসিতেছি বলিয়া সর্ব্বদাই আশঙ্কা, পাছে কেহ আমাকে অধিকারভ্রষ্ট করে; স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া আপনাকে ফাঁকি দিতেছি। ভক্ত! তুমি যে বিশ্বাসে তরু লতাকেও প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া থাক, আমাকে সেই বিশ্বাস শিখাইয়া দাও—যাহাতে আমি অবনত মস্তকে তাঁহার চরণধূলি লইয়া কৃতার্থ হই। হউন তিনি কপটাচারী, সরল বিশ্বাসে ভক্ত বলিয়া সেবা করিলে প্রকৃত ভক্ত সেবারই ফল পাইব। ভক্ত তুমি সরল বিশ্বাসে ভগবানকে জগন্ময়

ভাবিয়া তরুলতার আলিঙ্গনে শ্রীভগবানের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া থাক, আর আমি কি সরল বিশ্বাসে ভক্ত বলিয়া কপটীর সেবা করিয়া ভাগবত সেবার ফল পাইব না ? নিশ্চয়ই পাইব।

পুরাকালে কোন এক ভক্তনিষ্ঠ রাজা ছিলেন; ভক্তের সেবাই তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য। ভক্তবেশে যে কেহ আসিতেন, তাঁহাকেই তিনি ভগবানের ন্যায় ভক্তি করিতেন ও যথা সাধ্য সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার প্রীতি সাধন করিতেন।

রাজার এইরূপ ভাব দেখিয়া এক দিন চারিজন চোর পরম বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করতঃ রাজার সভায় উপস্থিত হইল। রাজা দেখিয়াই প্রেমে পুলকিত, আন্তরিক ভক্তির সহিত স্বহস্তে তাহাদের পদ প্রক্ষালণ করতঃ পর্য্যঙ্কে বসাইলেন এবং স্বয়ং তাহাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। পরে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া রাণীকে তাহাদের সেবা করিতে বলিলেন। রাণী অতি সরলা ও ভক্তিমতী—পতিই তাঁহার গুরু ও দেবতা। পতি পরম ভক্ত পরম বৈষ্ণব, রাণী কেন না ভক্তিমতী হইবেন ? সাধুর সহবাস করিলে নিশ্চয়ই প্রকৃতি সাধু হইবে। রাণী পতির আজ্ঞা পাইয়াই পরম আনন্দের সহিত ভক্তি সহকারে তাহাদের পদসেবা করিতে লাগিলেন। রাত্রি সমাগত হইলে রাজা সেই কপট ভক্তদিগকে অন্তঃপুরেই একটী ঘরে শয়নের স্থান করিয়া দিলেন।

যাহার যে স্বভাব সে সহজে তাহা ছাড়িতে পারে না। দস্যুগণ ভক্তের বেশ ধরিয়া রাজার নিকট এত আদর এত যত্ন পাইয়াও ভক্তের মহিমা বুঝিল না। তাহারা সেই পাপবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ খুজিতে লাগিল। এতক্ষণ অনেক কষ্টে ভক্ত সাজিয়া ছিল, এক্ষণে নিশীথ সময়ে সকলে নিদ্রিত হইলে তাহারা রাণীর গৃহে প্রবেশ করতঃ তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল, এবং সমস্ত অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল।

কিন্তু পলাইবে কোথা ? ভগবৎ-প্রিয় জনের সেবা শুশ্রূষাই যাঁহার

যাঁহারা ব্রজ, যিনি বিষয় বিভব সর্ব্বস্ব ভক্তসেবার নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়াছেন, ভগবান তাঁহাকে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন—তাঁহার সুখ শান্তি বিধানের নিমিত্ত, তাঁহার মঙ্গল সাধনের জন্য, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভগবান সতত যত্নবান—ভগবান তাঁহার দ্বারের প্রহরী হইয়া সর্ব্বস্ব রক্ষা করিয়া থাকেন। তাই, আজ চোরেরা পলাইবার চেষ্টা করিয়াও পথ পাইল না, ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া অন্তঃপুরেই ঘুরিতে লাগিল। চোরেরা রাত্রিকালে চুরি করিল, ভাবিয়াছিল, কেহ দেখিতে পাইবে না, অক্লেশে পলায়ন করিবে। কিন্তু তাহা হইল না; জগতের কোনও প্রাণী তাহাদিগকে দেখিল না বটে, কিন্তু সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বময় ভগবান সমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন; দস্যুগণ তাঁহাকে ফাঁকি দিতে পারিল না। তিনি আজ ভক্তরক্ষার জন্য চোরদিগকে মায়ারজ্জুতে আবদ্ধ করিলেন।

ভগবন্! এই বিশ্ব সংসার তোমার রাজ্য; তুমি অণুপরমাণুরূপে সর্ব্বত্র রহিয়াছ। আমরা পাপ করি আর মনে করি, কেহ দেখিতেছে না, পাপ করিয়া ফাঁকি দিয়া পালাইব। দয়াময়! কোথা পালাব কাকে ফাঁকি দিব? তুমি যে সর্ব্বত্র আছ, তুমি যে আমার অন্তরেও অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান! প্রভো! তোমায় ফাঁকি দিতে গিয়া নিজের দুঃখ নিজেই বাড়াইতেছি, ক্রমেই মায়ায় জড়িত হইয়া পথ হারাইয়া ঘুরিতেছি। আমার শান্তি কোথা? শান্তিদাতা! তুমি এই অভাগাকে তোমার মহিমা বুঝাইয়া দাও, তোমার সর্ব্বময়ত্বের ভাব প্রাণে লাগাইয়া দাও, তাহা হইলে আর তোমায় ফাঁকি দিবার চেষ্টা হইবে না, আর তোমায় লুকাইয়া পাপ করিতেও যাইব না।

প্রাতঃকালে দাস দাসীরা উঠিয়া দেখিল, রাণী হত হইয়া পড়িয়া আছেন, গাত্রে একখানিও অলঙ্কার নাই, বক্ষঃস্থলে ছুরিকা বিদ্ধ, রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল—এ সর্ব্বনাশ কে করিল? পরে বাহিরে দেখিল, সেই চারিজন (কপট) ভক্ত কারাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের নিকট

রাণীর অলঙ্কারগুলি সব রহিয়াছে। তখন সেই দস্যুগণকে ধরিয়া বন্ধন করত রাজার নিকট প্রেরণ করিল।

রাজা দূর হইতে বৈষ্ণবগণকে এরূপ বন্ধনাবস্থায় দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া 'কি কর কি কর' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ও ভক্তনিষ্ঠ, তাঁহার প্রাণ নিতান্ত কোমল, ভক্তের কষ্টে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া গেল। শ্রীভগবান যে তাঁহার ভক্তের প্রাণ কি উপাদানে গড়িয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। ভক্তের প্রাণ সততই দয়ায় পরিপূর্ণ। আমরা সংসারী জীব, আমাদের প্রাণ সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে কঠিন হইয়া গিয়াছে, পরের দুঃখে আমাদের প্রাণে বেদনা লাগেনা। যীশু খ্রীষ্টকে বধ করিবার সময়ও তিনি ঘাতুকদিগের নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"দয়াময়! ইহারা কি করিতেছে বুঝিতে পারিতেছে না ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।" ইহা কম দয়ার পরিচয় নয়। জগাই মাধাই শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে মারিল, তাঁহার বক্ষঃস্থল বহিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল, তিনি বাহু তুলে প্রেমভরে বলিলেন—"আয় জগাই মাধাই আয়, মেরেছিস বেশ করেছিস—একবার হরি ব'লে কোলে আয়।" দয়াল প্রভু! আমরা জগাই মাধাই অপেক্ষাও অধম, আমাদের একবার কোলে টেনে লইয়া তোমার দয়াল নামের পরিচয় দাও।

তখন দাসদাসীরা রাজাকে বলিল, "মহারাজ! ইহারা বৈষ্ণব নয়, দস্যু, রাণীকে হত্যা করিয়া অলংকারাদি গ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু রাজার প্রাণ ভগবানের আবির্ভাবে ভগবানের ন্যায় হইয়াছে; তিনি বলিলেন, তোমরা কি করিতেছ, ইঁহারা বৈষ্ণব—বৈষ্ণবের প্রাণে ব্যথা দিও না, ইহাতে সর্ব্বনাশ হইবে, ইঁহাদের বন্ধন খুলিয়া দাও। রাণী আপনার কর্ম্মফলে হত হইয়াছেন, ভক্তগণকে প্রসন্ন কর, ইঁহাদের পাদোদক লইয়া রাণীর সর্ব্বাঙ্গে দাও; ভক্তের কৃপা হইলে রাণী জীবন লাভ করিবেন। তখন দাস দাসীরা দস্যুগণের বন্ধন খুলিয়া দিল এবং তাহাদের পা ধোয়াইয়া সেই চরণামৃত রাণীর সর্ব্বাঙ্গে

ছিটাইয়া দিল। সরল বিশ্বাসের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! আজ রাজার অটল বিশ্বাসে সেই কপট ভক্তগণের পাদোদক স্পর্শে রাণীর দেহে জীবন সঞ্চার হইল। ভগবান তোমার মহিমা তুমি জান আর তোমার ভক্তই জানে। তোমার ভক্তের প্রাণে তুমি যে কি অটল বিশ্বাস দিয়াছ তাহা আমার ন্যায় অবিশ্বাসী কিরূপে ধারণা করিবে। তাই, দয়াময়, প্রার্থনা করি, দয়া করিয়া আমার প্রাণে সরল বিশ্বাস দাও, যেন তোমার ভক্তের দাসানুদাসেরও সেবার উপযুক্ত হইতে পারি।

সাধুসঙ্গের কি মহৎ ফল! বৈষ্ণব সেবায় বিশ্বাসের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা!! এই ব্যাপার দেখিয়া দস্যুদিগের প্রাণে বিবেক আসিল, তাহারা তখন কাঁদিয়া রাজার পায়েপড়িল, এবং সেইদিন হইতে দস্যু বৃত্তি ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য অনুষ্ঠানাদি এবং উপাসনা করিতে লাগিল।

প্রাণের কথা।

১। ভগবানকে দূরে মনে করিও না, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া জান।

২। প্রাণে ভগবদ্ভাব থাকিলে বেশ জ্ঞান হয় যে, ভগবান অতি সন্নিকটে আছেন; কিন্তু ভগবদ্ভাববিরহিত জনের পক্ষে তিনি অতি দূরবর্ত্তী।

৩। ভগবান সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। গাভীর সর্ব্ব শরীরেই দুগ্ধ আছে; কিন্তু দোহনপ্রণালী অনুসারে দোহন করিলে স্তনদেশ হইতেই তাহা ক্ষরিত হয়। সেইরূপ ভগবান সর্ব্বময় হইলেও কেবল উপাসনাপ্রণালীদ্বারা ভগবৎপ্রতিমূর্ত্তিতেই তাঁহার অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে।

৪। যতদিন বালক অতিশিশু—গমনাদি কার্য্যে অসমর্থ—মা বই আর কিছুই জানে না, ততদিন মা তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও

থাকিতে পারেন না, ততদিন বালকের যখন যা' আবশ্যক বালক না চাহিলেও মা আপন হইতে তাহা যোগাইয়া থাকেন। সেইরূপ আমরা যদি অহংকার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করি তাহা হইলে আমাদের সুখের আর অবধি থাকে না। মঙ্গল ময় ভগবান আমাদের মঙ্গল সাধন করিবেন—আমাদের যখন যা' প্রয়োজন আমাদের অজ্ঞাতসারে পূর্ব্বেই তাহা উপস্থিত করিবেন।

৫। আনন্দ আত্মার স্বরূপ; যতটুকু এদিকের ভাব যাইবে, ভগবানে যতটুকু নির্ভর আসিবে, ততটুকু আনন্দ পাওয়া যাইবে।

৬। আমাদের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা ভগবতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চয় করা বড়ই দুষ্কর, সেরূপ করিতে যাওয়াও সম্পূর্ণ বাতুলের কাজ। ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ যাহা বলেন, তাহাতে সবল বিশ্বাস রাখা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৭। ভগবল্লীলাদির মীমাংসা বা বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদিগের উচিত নহে; কেবল কাতরভাবে দীনতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেই লীলামাহাত্ম্য বুঝিতে পারিব।—ভগবল্লীলা অতি গুহ্য।

বিরহোচ্ছ্বাস।

(শ্রীগুরুর তীর্থগমনে ভক্তের উক্তি)

কি শুনি কি শুনি হায়! শুনে প্রাণ ফেটে যায়!
কোথা যা'বে গুরুদেব! আমাদের ছাড়ি'?
কোথা যাও ভক্ত-স্নেহ-কুল-বৃন্ত ছিঁড়ি'?—
এত যদি ছিল মনে, তবে কেন ভক্তগণে
প্রেম ভক্তি প্রদানিলে, চক্ষু ফুটাইলে?
পাষাণ-সমান প্রাণ স্নেহে গলাইলে?
যাবৎ বিচ্ছেদ রবে অশ্রুধারা প্রবাহিবে!—

কালের চলৎ চক্রে ঘুরিয়া পড়িল!
ভক্তকুল-মহাবন্ধু ছাড়িয়া চলিল!!
আমাদের আশা যাঁরে সততই আশা করে,
তাঁর আশা আমাদি'কে আজিবে ছাড়িল!
অভক্ত-দীনের বন্ধু ছাড়িয়া চলিল!!
দীনবন্ধু দীনবন্ধু, ভক্তাভক্তগণবন্ধু
অশেষ গুণের সিন্ধু প্রবাসে চলিল!

যাবে যদি, যাও দেব! দেব দরশনে!
যথায় বিমল সুখ শোক পাপ তাপ দুখ-
হারী, সেই মহা তীর্থধাম দরশনে!
যাও তবে যাও দেব! শান্তি নিকেতনে!!
বিনোদ যুগল বেশে নেহারিয়া শ্রীনিবাসে
উথলিবে মনপ্রাণ প্রমোদ-স্বপনে!
হেরিবে কিশোরী প্রেমে কিশোরের বামে!!—

* * * * *

যে স্থানে ভকতগণ করে পদ পরশন
সেই খানে থাকে সদা ভক্ত-প্রাণ হরি।
তাই বুঝি লীলাময় অধম পাতকিচয়
অভক্ত নিকট হ'তে ভক্তে নিলা হরি?
অধম পাতকি-জন সঙ্গ পরিহরি?
দয়াময় দীনবন্ধু! দীনহীনজন বন্ধু!
ভকত-বৎসল হরি, ভক্তি শিখি নাই।
আশা তব ভক্ত ধনে দর্শন, পদস্পর্শনে,
পরম পাতকী জন যদি কণা পাই!
পাতকি-তারণ! দিলে সে আশায় ছাই!!

তব নাম-সুধা পানে বিভোর ক'রেছে প্রাণে
যে বিশ্বপ্রেমিক, তাঁর বিপদ কি আছে?
তথাপিও ভ্রান্তমতি, না জানি ভকতি নতি,
সংসার-নরক কীট যাচি তব কাছে;—
তুমি নাথ দীনবন্ধু, অনাথ জনের বন্ধু,

বিপন্ন জনের হরি তুমি বিনা নাই,
কি স্বদেশে কি বিদেশে প্রেমানন্দে কেঁদে হেসে
ভাবময়! ভক্ত দীনবন্ধু তব পাই।
দীনবন্ধু! নমি পায়, যাচি তব করুণায়,
রোগ শোক দুঃখ দৈন্য পাপ তাপ হারী!
অনলে, পর্ব্বতে, জলে, বিষে, হস্তি-পদতলে
প্রহ্লাদে রক্ষিয়াছিলে, নৃসিংহ মুরারি!
সেরূপে হে কৃপাসিন্ধু! দয়াময় দীনবন্ধু!
তব ভক্ত দীনবন্ধু রেখোহে সদাই।
দেখ' নাথ ভববন্ধু আমাদের দীনবন্ধু,
কুশলে মঙ্গলে যেন তাঁরে ফিরে পাই॥
যতনে রক্ষিত ধন করিলাম সমর্পণ,
কুশলে গচ্ছিত ধনে ফিরে যেন পাই!
তোমার শ্রীপদে হরি এই ভিক্ষা চাই!!

চোর-ধরা।

'কোথা তুমি?' ব'লে হরি, খুঁজিব না আর,
হেথা সেথা অন্বেষিয়া
ঘুরিব না বেড়াইয়া,
এবার পেয়েছি আমি সন্ধান তোমার;
যেথানে রয়েছ তুমি
জানিতে পেরেছি আমি,
কোথায় লুকা'বে মোরে বলনা এবার?
আর না ছাড়িব তোমা হৃদয়-আধার!

অই যে গগণ ভেদী গিরির শিখরে,
রত্নাকর-তলদেশে,
আকাশে নীলিমা-শেষে,
চির-স্বপ্রকাশ রূপে নেহারি তোমারে;
উজ্জল কিরণ-ময়
রবি তব আলো দেয়,
অনিল তোমারি স্নেহ বিতরণ করে;

ললিত বিহঙ্গ-স্বরে
তোমারি সুস্বর ঝরে,
টল টল সুকোমল প্রসূন মাঝারে
তোমারি দেহের রূপ
হেরি আমি অপরূপ,
শ্রীঅঙ্গ সৌরভ পাই তাহারি ভিতরে;
সোণালী চাঁদের মাঝে
তব চন্দ্রানন রাজে,
গ্রহগণ কহে তব মহিমা অপার;
অপার অতল সিন্ধু
তোমারি প্রেমের বিন্দু,
বিশ্ব জুড়ি' রহিয়াছে হে বিশ্ব-আধার!
ধরা কিন্তু কভু আমি পাইনা তোমার।

এখন পেয়েছি আমি তোমার সন্ধান,
হৃদি-শতদল মাঝে
তব মূর্ত্তি সদা রাজে,—
আত্মারূপে তুমি হরি, নিত্য অধিষ্ঠান.
কি কাজ খুঁজিয়া তবে
এখানে ওখানে ভবে?
কেন তবে বৃথা আমি করি অভিমান
তোমায় পাইনা বলি'?
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি'
মনসুখে আজি নাথ, করিব আরতি;
এবার হে ননীচোরা!
আপনি পড়েছ ধরা,
আর কোথা যা'বে ওহে অগতির গতি?
হৃদয়-কপাট রুধি'
রাখিব হে নিরবধি,
যাইতে দিব না হরি, কভু তোমা' আর;
ভকতি-প্রেমের ডোরে
বাঁধিয়ে রাখিব জোরে।
ভকতি-বাঁধন সে যে অক্ষয় অমর!
এবার ধ'রেছি তোমা' প্রেমের সাগর!

(গান)

সাহানা—ঝাঁপতাল।

চাঁদের পানে চাহ যদি, চাঁদের আলো মুখে হয়।
মেঘের কোলে হেলে দুলে এদিক সেদিক চ'লে যায়॥
ভবের খেলা এম্নি তর, দেখা শুনা বড়ই দায়।
ভক্তিভাবে ভ'জলে পরে সব কর্ম্ম সাধন হয়॥
যা'কে চা'বে তা'কেই পা'বে কষ্টই কিন্তু অতিশয়।
প্রাণ খুলিয়ে ডাক' যদি রবেনা আর কোন ভয়॥

খট্‌ভৈরবী—একতালা।

দেখা দিলে কি মান যা'বে? (দীনে)
আমি তব ঠাঁই কৃপা নাহি চাই,
(কেবল) চোখের দেখা একবার তাওকি নাহি দেবে?
জানি হরি তুমি দেবারাধ্য ধন,
ভক্তিভাবে তোমায় পূজে দেবগণ,
তা' ব'লে কি দেখা দিলে পতিতপাবন,
পতিতের সঙ্গে পতিত হ'য়ে যা'বে?
তা'ই যদি হরি ভাবহে অন্তরে,
না হয় দেখা দিও থাকিয়ে অন্তরে,
(যদি) না রও অধিক কাল, থেকে কিছু কাল
না হয় হরি আপন ঘরে চ'লে যাবে॥
(যদি) সরল হ'য়ে দেখা দিতে পাও ভয়,
(না হয়) বাঁকা হ'য়ে দেখা দিও দয়াময়!
(যদি) দেখিতে এ মুখ হও হে বিমুখ,
(না হয়) আড় নয়নে হরি আমার পানে চা'বে॥
(যদি) হয় হে এ চিতে নিতে ও চরণ,
সঙ্গে রেখ সদা প্রহরী আপন—
সত্য দয়া তপ শৌচ চারি জন,
(তারা) যেন আক্রমণ করে আমায় সবে॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

"ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎ কিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎসমম্॥"

প্রার্থনা।

ওহে দয়াময়, আলয়, অখিল-ভুবন-পতি!
জুড়াতে জীবন, হে বজীবন! তোমা বিনে নাই গতি।
তোমারি কৃপায় ভক্তি যদি পাব, তবেই জুড়ায় প্রাণ;
বিনা ভক্তি ধনে যোগ যাগ ধ্যানে না মিলয় ভগবান্।
কেমনে ভকতি হয় ভবপতি! সে ভাব জাগায়ে দাও।
ভকতি বিবোধি, ওহে গুণনিধি! যা' আছে কাড়িয়া লও।
ভকতি বিহীন অসার জীবন রাখিয়া কি হবে আর?
পরাণ ভরিয়া হরি না বলিয়া বাঁচিয়া কি ফল আর?

তুমি কে?

তুমি কে? বুঝিতে পারিনা, ধরিতে পারিনা, দেখিতেও পাইনা; বুঝিতে বুঝিতে, ধরিতে ধরিতে, ভাবে ভাবে মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে লুকাইয়া যাও, তুমি কে? তুমি কি আমার পরম শত্রু, না আনন্দ বিধাতা পরম মিত্র, বলিয়া দাও। আশা করি ধরিব, প্রাণের কথা বলিব, তোমাকে জিজ্ঞাসিব, তোমার পরিচয় পা'ব, তোমাকে চিনিব, কিন্তু তুমি যেন চোরের মত লুকাইয়া আসিতেছ; আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছে, তুমি মিত্রই হও, আর শত্রুই হও বা আমার কেহ নাই হও, একবার দেখা দাও, একবার পরিচয় দাও আশা মিটিয়া যাক্, চিন্তা দূরে যাক্, ভয় ও সন্দেহ দূরে পলায়ন করুক্।

একবার ভাবি তোমার যখন পরিচয় পাইলাম না, তোমাকে যখন ধরিতে পারিলাম না, তোমাকে যখন প্রাণের কথা বলিতে পারিলাম না, তুমি যখন আমার কষ্ট বুঝিলে না, তখন তুমি আমার কেহই নও; কিন্তু প্রাণ তথাপিও কেন তোমায় দেখিতে চায়, কেন তোমার পরিচয় পেতে চায়, কেন তোমার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল হইতেছে জানিনা। দেখা না দিয়া ভালবাসিতেছ, ভাল ... য়া প্রাণ টানিতেছ, পরিচয় না দিয়া, সম্বন্ধ না জানাইয়া ... উপকার করিতেছ, আপনি প্রেম করিয়া, ব্যাকুল না হইয়া ... াকে ব্যাকুল করি... বল, তুমি কে। বড়ই বাসনা, বড়ই ... প্রাণ বড়ই ... হইতেছে, বল, বল, তুমি আমার কে ... তোমাকে সর্ব্বদাই মনে পড়ে,—অনুমান হয়, আমার সঙ্গে সঙ্গেই আহার, আমার সঙ্গে সঙ্গেই বিহার, আমার সঙ্গেই গমনাগমন ও কথাবার্ত্তা করিতেছ; কিন্তু অমন করিয়া কথাবলা, কথাশোনা, প্রাণ কেড়ে লওয়ার অর্থ কি? যদি দেখা না দিবে, প্রাণ টান কেন? ছাড়িয়া দাও, তোমাকে ভুলিয়া যাই। হে চিন্তামণে! চিন্তা করিতে গিয়া জগত পানে চাহিয়া প্রাণ আরও কেমন করিতেছে; এক একবার ভাবিয়া আকুল হইতেছি, কে আমাকে বুদ্ধি, বিদ্যা, বল, ভরসা, সহায়, সম্পদ, ধন, মান দিতেছে! কে আমার পিতা হইয়া লালন, পালন ও সৎ শিক্ষা দিয়া আবার অদৃশ্য হইল! কে আমায় গর্ব্ভে ধারণ করিল! আবার কে আমার গুরুমহাশয় হইয়া, কতমত ভয় প্রদর্শন করাইয়া কাছে কাছে রাখিয়া, আপন করিয়া বর্ণমালা হইতে নানাবিধ শিক্ষা প্রদান করিল! কে আমাকে দেশে বিদেশে পরিচিত করাইল! কে আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া আমায় আশাতীত বিষয় প্রদান করিল! কে আমাকে অশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রদান করিয়া কখন সুখী, কখনও দুঃখী, কখনধীর আবার কখন বা ভাবোন্মত্ত করিতেছে?— কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি না; কেবল বোধ হইতেছে, এ সকল কিছুই আমার শক্তিতে হয় নাই। —— আমাকে যে ব্যাকুল

করিতেছে, যাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছি, যিনি ভাল বাসিয়া এইরূপে আমাকে সাজাইতেছেন, যাঁহার ইচ্ছায় সকল হইতেছে, সেই কি তুমি নও ?—এত করিলে, এত ভাল বাসিলে, এত ভাবাইলে, কেবল দেখা দেওয়াই কি বেশী হইল ?—কত অসম্ভব ভাবে আমাকে ভাবিত করিলে, কত অলৌলিক কার্য্য করাইলে, বুঝাইলে, কেবল দেখা দেওয়া কি এত ভারি হইল? বুঝিতেছি যেন আমা ছাড়া আর সকলেই তোমাকে দেখিতেছে, দেখিয়া তোমারই আদেশ পালিতেছে, তোমাতেই মজিয়া আছে, তোমারই ভাবে বিভোর হইতেছে। কি দিবা, কি রাত্রি, যখন যে দিকে তোমাকে জানিবার জন্য চাহিয়া থাকি, তখনই কাঁদাইয়া প্রাণ ব্যাকুল করিয়া চলিয়া যাও, দেখা দাও না, বল বল, তুমি কে। বেশ তোমাকে সকল কথাই বলিতেছি, তোমার প্রদত্ত জিনিষ ভোগ করিতেছি, এবং তোমার জন্যই ব্যাকুল হইতেছি, বল তুমি কে। কি বলিয়া ডাকি বলিয়া দাও প্রাণ শীতল হউক। সেদিন রাত্রে আকাশ পানে চাহিয়া মনে হইল নক্ষত্রমালা তোমাকে যেন নীরবে কি প্রাণের কথা বলিয়া ভাবে বিভোর হইতেছে, বেশ চিনিয়াছে, আশা মিটাইয়া দেখিতেছে। চাহিয়া রহিলাম, চখে জল আসিল, প্রাণ ব্যাকুল হইল, একটু কাঁদিলাম, তবু দেখা দিলে না। চক্ষু নিম্নদিকে ফিরাইয়া প্রাসাদপুঞ্জ বৃক্ষ শ্রেণী ও ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী লোক সমূহে দৃষ্টি করিলাম দেখিলাম তুমি যেন তাহাদের আনন্দের তুমি যেন তাহাদের চিরদুঃখ শান্তির তুমি যেন তাহাদের অভীষ্ট ফলের একমাত্র প্রদাতা ও তাহাদের নিকট পরিচিত; তখনও দুঃখ আসিল,—কি অন্তরীক্ষে, কি ভূমণ্ডলে সকলেই পাইল, সকলেই তোমাকে দেখিল, সকলেই তোমাকে প্রাণের ভাব জানাইল, সকলেই শান্তি পাইল, কেবল আমি নয়! ভাবিতে ভাবিতে এবারও কাঁদিলাম, ব্যাকুল হইলাম, হাতবাড়াইলাম, বুক্ পাতিয়া দিলাম, ধরিতে পারিলাম না; ধরিতে ধরিতে আবার কোথায় পলায়ন করিলে জানি না। চিন্তা করিয়া কাঁদিয়া

আগ্রহ করিয়াও যখন পাইলাম না তখন ভাবিতেছিলাম,—কে আশা দিয়া নিরাশ করিতেছ! কেন আমাকে অসহ্য যাতনা দিয়া নিজে সুখে হাসিতেছ! কেন আমার সহিত অমন খেলা খেলিতেছ, কেন দেখা দিতেছ না, কেন পরিচয় পাইলাম না, এক বার বলিয়া দাও, তুমি কে; দেখা না দিবে তো বলিয়া দাও, কি ব'লে ডাকি! তোমার নাম বা আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। কি ব'লে ডাকি, কোন্ সম্বন্ধে তোমাকে আত্মীয় ব'লে, প্রাণের প্রাণ ব'লে, জীবনের লক্ষ্য ব'লে, শান্তির আকর ব'লে পিপাসার জল ব'লে, জীবনের চিরবন্ধু ব'লে ডাকি, বল বল তুমি কে! কিছুই ভাল লাগে না, কিছুতেই এ প্রাণ তৃপ্ত হইয়া আশা হইতে বিরত হয় না, কিছুতেই যেন সাধ মেটে না। স্ত্রী পাইলাম, পুত্র পাইলাম, অর্থ পাইলাম, আত্মীয় বন্ধু পাইলাম, যশ পাইলাম, কত কি পাইলাম, কিন্তু পাইলাম না কেবল তোমাকে। শাস্ত্র পড়িলাম, অনেক জটিল কথাব মীমাংসা করিলাম, অনেক বিষয় বুঝিলাম, ও অপরকেও বুঝাইলাম, কেবল বুঝিলাম না তুমি কে! এ বড়ই পরিতাপ!——অনেক দিন থেকে দেখিতেছি, কোন একটী বিষয় কঠিন বলিয়া বুঝিতে না পারিলে যেমন একটু চিন্তা করি, অমনি কে যেন বুঝাইয়া দেয়, সেই বোধ হয় তুমি। কত বিষয় বুঝাইলে কত লোককে বুঝাইবার কথা বলিয়া দিলে, কত লোকের ভ্রম অজ্ঞান অশান্তি দূর করিবার জন্য বলাইলে, বুঝাইলে উপদেশ দেওয়াইলে, কিন্তু বুঝাইলেনা, জানাইলে না, হাসাইলে না, মাতাইলে না, বলিলে না,—তুমি কে! ছাড়িব না,—যতদিন বলিয়া না দাও, যতদিন দেখা না দাও, ভাবিব, ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হইব, যাহা যাহা মনে হইবে, তাহাই বলিব। কাঁদিব, তবু ছাড়িব না এই পণ করিলাম; মুখে বলিয়াই নিবৃত্ত থাকিব না, স্থির করিলাম; না দেখিয়া না বুঝিয়া না অনুভব করিয়া চিন্তানল নিবৃত্ত হইবেনা, না হয় মরিব, না হয় ধরিব এই পণ!—এখনও বলিয়া দাও তুমি কে।

কর্ম্মযোগ।

এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় তৎসমুদায়ই কর্ম্ম। (গীতায় যে "অকর্ম্ম" কথার উল্লেখ আছে, তাহা আমাদের অননুষ্ঠেয় কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।) যখন শ্রীভগবান সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি। গীতায়—

"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি"

কি জড় জগৎ, কি প্রাণী জগৎ, সকলেই ক্রিয়াশীল, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই কোন না কোন কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত। বৃক্ষ মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ পূর্ব্বক নিজের পুষ্টি সাধন ও প্রাণিগণকে ফল পুষ্প প্রদান করিতেছে। নিম্নশ্রেণীর স্থলচর, খেচর ও জলচর প্রাণী হইতে হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মানবজাতি পর্য্যন্ত,—ইহাদিগের মধ্যে কেহই কোন সময়ে একেবারে নিষ্কর্ম্ম নহে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

প্রকৃতিসম্ভূত গুণসকল [সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ] নিশ্চয়ই সকলকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। এই ক্রিয়াসূত্র দ্বারা সকলেই এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি আবদ্ধ। বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে, আমরা তাহার সম্ভোগে পরিতৃপ্ত; আবার আমাদের প্রশ্বাস বায়ু বৃক্ষের প্রাণ-সঞ্জীবন-কারী পদার্থ। কর্ম্মফল সম্বন্ধেও এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। ধনীর সুখভোগাস্বাদ দরিদ্রের দুঃখরাশির সম্মুখে, এবং উক্ত দরিদ্রের সম্মুখে যদি ভোগীর সুখচিত্র প্রদর্শিত না হইত তবে সে নিজকে অত দীন মনে করিত না। অতএব এস্থলেও উভয়ে উভয়ের মুখাপেক্ষী। এইরূপ শ্রীভগবানের সৃষ্ট পদার্থ সমুদায়ই প্রত্যেকের কর্ম্মদ্বারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আবদ্ধ। এই বন্ধন দুঃখের কারণ নহে। ইহা বিশ্বস্রষ্টার এক অপূর্ব্ব লীলা, ইহাই প্রেমময়ের প্রেমবন্ধন।

কর্ম্ম দুই প্রকার, অনুষ্ঠেয় ও অননুষ্ঠেয় অথবা কর্ত্তব্য এবং অ-কর্ত্তব্য। যে কর্ম্ম সাধনে শ্রীভগবানে আমাদিগের চিত্তাভিনিবেশ হয় তাহা কর্ম্মযোগ। পাঠকবর্গ! এই প্রবন্ধে এইক্ষণ হইতে কর্ম্ম বলিতে অনুষ্ঠেয় কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিবেন। যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে শ্রীভগবানের সহিত জীবের মিলন সংঘটন হয় তাহা ক্রমশই বর্ণিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রসঙ্গাধীন দুই একটি প্রশ্ন সংক্ষেপে আলোচনা করি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে কর্ম্ম সাধনে শ্রীভগবানে আমাদিগের চিত্তাভিনিবেশ হয় তাহা কর্ম্মযোগ। এক্ষণে প্রশ্ন এই, শ্রীভগবান কে? আমরাই বা কে? এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই বা কি? সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবান একা ছিলেন, তৎপরে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইল কেন; তাহার উত্তর এই যে তিনি লীলাময়, লীলা করিতে তিনি বড়ই ভালবাসেন। আদিতে শ্রীভগবান নিজকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন, মনে মনে তাহার উপায় এই স্থির করিলেন, "অহমেব বহু স্যাম্, অহমেব প্রজায়েয়।" আমি বহু হইব, আমি প্রজা হইব, হইয়া নিজকে নিজ উপভোগ করিব। কথাটি কিরূপ, উদাহরণ দ্বারা আরও আমরা সুন্দর রূপে বুঝিতে চেষ্টা করি। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজাধিরাজ, মনোহর সুসজ্জিত গৃহে সুবর্ণ পালঙ্কে অর্দ্ধশয়িতভাবে বিশ্রাম করিতেছেন, গৃহভিত্তিতে ব্রজের মুরলীধর শ্যামসুন্দরমূর্ত্তি অঙ্কিত। দ্বারকাধিপতি নিজের নটবর মোহন রূপ অবলোকন করিয়া শ্রীমতী হইয়া সেই মধুর রূপ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। পাঠকবর্গ! বুঝুন শ্রীভগবান এমনই রসিক, এমনই লীলাপ্রিয়। সুতরাং শ্রীভগবান রসিক লীলাময়, আমরা তাঁহার লীলার সামগ্রী, আর এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার লীলাক্ষেত্র। লীলার প্রধান অঙ্গ বিরহ ও মিলন। কিন্তু এই লীলার ভিতর অনেক রহস্য আছে; একদিকে কর্ম্মীর কর্ম্মানুষ্ঠান, জ্ঞানীর, জ্ঞান-চর্চ্চা ও ভক্তের কৃষ্ণানুশীলন; অন্যদিকে সাধুচরিত্রের ধর্ম্মযুদ্ধ

ন কের ঈশ্বরবিদ্বেষিতা ও পাপীর শাস্তি; সকল রহস্যেরই উদ্দেশ্য শ্রী ... বানের সহিত মিলন। যৎক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এই রহস্যের গুহ্য তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই লীলার ভাবে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে শিক্ষা না করি উন্নতশির বহু মূল্য সুন্দর অট্টালিকার সুসজ্জিত ত্রিতলোপরি দাসদাসী পরিবেষ্টিত স্বর্ণ পালঙ্কে শয়ান অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি হইতে জীর্ণ পর্ণ কুটীরে দরিদ্রতা লাঞ্ছিত, দ্বিপ্রহরের নিদাঘ পীড়িত ক্ষেত্র হইতে আগত, পরিশ্রম-কাতর, বুভুক্ষু কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই অভাবের দাস। এই লীলা ক্ষেত্রে আসিয়া আমরা কি করিতে কি করিতেছি তাহা বুঝিতে পারিলে এরূপ দুর্দ্দশায় আমাদের আর অধিক দিন কাটিবে না। সুতরাং এই সংসারে ভক্তের অভীষ্ট ভগবান। ভক্ত জগতের সামান্য সুখের প্রার্থী নয়, ভক্ত সংসারে ধন, জন কামনা করেন না, তিনি একমাত্র শ্রীভগবানকে চান। এবং সকল জীবেরই, কর্ম্মী হউক জ্ঞানী হউক বা অতি পাষণ্ড হউক, অভীষ্ট সেই রসিকশেখর; কিন্তু অনেকে এই ভবের বাজারের জাঁক জমক দর্শনে আত্মহারা হইয়া মগ্ন রহিয়াছেন। বোধ হয় প্রাপ্য বস্তু বোধে প্রালব্ধ বস্তু সম্ভোগে রত, কিন্তু কয়দিন? যেমন প্রালব্ধ বস্তু সুখ প্রদানে ক্ষান্ত হইল, অমনি ভ্রম উপলব্ধি করিয়া "বৃথা জীবনের মহামূল্য সময় নষ্ট করিলাম" বলিয়া ভ্রান্ত ব্যক্তি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। অতএব কোন বস্তু আমাদের অভীষ্ট; কোন বস্তু আমাদের প্রকৃত প্রাপ্য, যাহা পাইলে আমরা চিরকালের নিমিত্ত পরিতৃপ্ত হইয়া যাই, ইহা আমাদের চিন্তা করিবার বিষয়। আমরা সুখ চাহি না, দুঃখ চাহি না, ধন চাহি না, বন্ধু চাহি না, চাই কেবল একমাত্র সেই ভগবানকে। কেমনে সেই ভক্তজন-হৃদয়-দেবতাকে পাওয়া যায়! কেমনে আমরা সেই বিশ্বের আরাধ্য শ্রীপতির চরণে আমাদের এই ক্ষুদ্র মন প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারি! ইহাই জানিবার সংসারে সাধকের আকাঙ্ক্ষা, আর শ্রীভগবানই তাঁহার অভীষ্ট

মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভার্থ বাহিত করে এবং ক্রমে তাহার মনোবৃত্তিগুলিও বিকাশ প্রাপ্ত আমাদের তিন প্রকার ঋণ শাস্ত্রে উক্ত আছে। মনু বলিয়াছেন

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ।

অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানোব্রজত্যধঃ॥

পাঠ্যাবস্থা ঋষিঋণ পরিশোধ করিবার প্রশস্ত সময়। কেহ মনে করিবেন না যে এই ঋণ পরিশোধ বড়ই অপ্রীতিপ্রদ ব্যাপার। তাঁহারা ভিক্ষালব্ধ ধনে বা বনজাত সামান্য ফল মূল আহরণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া নির্জ্জন অরণ্য-প্রদেশস্থ কুটীর মধ্যে বাস করতঃ লেখনী সঞ্চালনে অবিরত পরিশ্রম দ্বারা আমাদের নিমিত্ত যে মহামূল্য রত্ন-ভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা একবার আমরা দর্শন করিয়া কি তাঁহাদের শ্রম সার্থক করিব না? সেই অক্ষয় রত্ন/ভাণ্ডার হইতে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধন গৃহীত হইয়া আসিলেও আজ পর্য্যন্ত তাহা নিঃশেষিত না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং পাঠকবর্গ! এই ঋণ পরিশোধ করিতে যাইলে আমাদেরই কৃতার্থতা ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের গবেষণা পূর্ণ শাস্ত্র পাঠে আমাদেরই চিত্তের মলিনতা দূর হইবে, জ্ঞানের সুনির্ম্মল শুভ্র জ্যোতিঃ আমাদেরই অন্ধকার হৃদয় উদ্ভাসিত করিবে, এবং অবশেষে আমরা অমূল্য ধনের অধিকারী হইয়া অনায়াসে এই ভীষণ সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

ক্রমে যৌবনকাল উপনীত হইলে আমাদের মনোবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ রূপে বিকসিত হয়। অথচ এইক্ষণে শ্রীভগবান আমাদের লইয়া লীলা প্রসঙ্গ করিতে সময় বুঝেন। একদিকে বিষয়ের তীব্র প্রলোভন অন্য দিকে রসিকশেখরের বংশীধ্বনি। সেই জন্যই মনু আদেশ করিয়াছেন পাঠ্যাবস্থায় গুরুগৃহে থাকিয়া চিত্তসংযম অভ্যাসের পর আশ্রমী হইবে,—

চতুর্থমায়ুষোভাগমুষিত্বাদ্য গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষোভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥

সেই সকল নিয়ম বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই অবনতি। যাহা হউক, মনোবৃত্তিগুলির পূর্ণতা ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই সংসারে কোন কার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি এবং আমাদের অভীষ্ট বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। সুতরাং যৌবনকালই সাধনার উপযুক্ত সময়, আর সাধনই একমাত্র আমাদিগকে সেই প্রেমময়ের চরণের দিকে অগ্রসর করিতে পারে। এবং এই ক্ষণে আমরা সাধনার বলে প্রাণের গভীর অনুরাগ ও হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভাব লইয়া তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করিতে অভিজ্ঞ ও সমর্থ। যৌবনকালে আমরা যে যে বৃত্তির অনুসরণ করিব মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই সেই বৃত্তি আমাদিগের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিবে। সুতরাং সাধক যুবক এই সময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া সংসার-যুদ্ধে ব্রতী হইবেন   (ক্রমশঃ)

চিন্তামালা

(প্রশ্নোত্তরমালা)

প্রশ্ন। মহাশয়! আপনারা "ভক্তি—ভক্তি" করিয়া নিজেরাও খুব মাতিয়াছেন আর অপরকেও মাতাইতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিতেছি। কিন্তু বলুন দেখি, ভক্তি বস্তুটি কি?

উত্তর। মহাশয়। ভক্তি কি, বলিবার পূর্ব্বে [illegible] আপনার বুঝিবার সুবিধার জন্য, আমি আপনার এ প্রশ্নের মধ্যেই ভক্তি দেখাইয়া দিতেছি। দেখুন, আপনি এই যে ভক্তি জানিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ঐ ইচ্ছাই আপনার ভক্তি। কেননা ঐ ইচ্ছার মূলে জ্ঞাতব্য বিষয় যদি উৎকৃষ্ট ও সুন্দর হয়, তবে তাহা আস্বাদন ও সেবন করিবার লোভ আপনার নিশ্চয়ই আছে। যাহার তত্ত্ব-জিজ্ঞা-

সায় এরূপ লোভ না থাকে, তাহাকে আমরা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর মধ্যে গণ্য করিতে পারিনা। তাহাকে কুতর্ক নিষ্ঠ পাষণ্ডগণের মধ্যে পরিগণিত করিতে পারা যায়। আপনি অবশ্য সে শ্রেণীর নহেন। আপনার 'ভক্তি কি' জানিবার ইচ্ছা শুধু কৌতুহল চারতার্থের জন্য নহে তাহা আমি স্বীকার করিয়া লইতে পারি। আপনি সত্য করিয়া বলুন দেখি, যে ভক্তি যদি সুন্দর হয় তবে তাহা জানিবার পুর্ব্বেই তাহা আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য আপনার একটু লোভ হইতেছে কি না; আর সেই লোভ আছে বলিয়াই আপনি 'ভক্তি কি' জিজ্ঞাসা করিতেছেন কি না।

প্রঃ। মহাশয়! ইহা সত্য কথা। উৎকৃষ্ট ও সুন্দর বস্তুর প্রতি সকলেরই লোভ হইয়া থাকে। ভক্তি উৎকৃষ্ট ও সুন্দর হইলে যদিও তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ ও আস্বাদন করিবার ভাগ্য আমার নাই, কিন্তু অবশ্যই তাহা মহা মান্য করিব, এবং সহজেই তাহা মিষ্ট লাগিবে। শুষ্ক ও বৃথা তর্ক করিবার জন্য আমি আপনাকে প্রশ্ন করি নাই, যথার্থ বিষয় শুনিবার জন্যই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।

উঃ! আমিও তাহাই বলিতেছি, এবং আপনার প্রশ্ন শুনিয়াই আপনাকে ভক্তমধ্যে গণ্য করিয়াছি। দেখুন, বিষয়-ব্যাপারে বিক্ষিপ্তচিত্ত জীবগণের মধ্যে প্রকৃত ভক্তি-জিজ্ঞাসু অতি অল্প। যিনি ভক্তি জিজ্ঞাসা করেন তিনি নিজেই কেবল কৃতার্থ হন না, অন্যান্য ভক্তি জিজ্ঞাসুগণেরও মহৎ হিতসাধন করিয়া থাকেন। ভক্তিসিদ্ধান্তে ভক্ত মাত্রেরই কাজ আছে। যাহা হউক এক্ষণে আপনার কথায় আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবার জন্য সাধকের রুচি অনুসারে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ উপায় বা পথ আছে। তন্মধ্যে আবার কর্ম্ম ও জ্ঞান যদি ভক্তিশূন্য হয়, তবে তাহা কোন ফলপ্রদ হয় না। ভক্তি স্বতন্ত্রা হইলেও কর্ম্মী ও জ্ঞানীর নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের সহকারিনী হইয়া থাকে এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানের আকারেই প্রকাশ পায়।

কিন্তু শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ হইতেছে "ঈশ্বরোপাসনা"। ঈশ্বরোপাসনা কোন না কোন আকারে পৃথিবীর সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তি কোন জাতি বা লোক বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে, ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে; সাধকের যোগ্যতানুসারে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই উদয় হইতে পারে। "ঈশ্বরোপাসনাই" হইল ভক্তি শব্দের প্রধান অর্থ। ভগবানে রুচি হইল তাহার প্রাণ বা প্রধান ভাগ। শ্রুতি বলিয়াছেন —

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনা-
মুষ্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নাম ভক্তি; ইহকাল পরকালের সুখ-ভোগাদিতে নিস্পৃহ হইয়া মন যখন কৃষ্ণ-চিন্তায় ও কৃষ্ণানুরাগে সরল হয়, তখন ভক্তি ইন্দ্রিয়পথে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপে উদয় হইয়া থাকে। শুদ্ধ ভক্তি উদয় হইলে কোন ইন্দ্রিয় লালসা থাকে না। ইন্দ্রিয়গণ ভক্তি সংস্পর্শেই অতিশয় চরিতার্থতা লাভ করে। সম্পূর্ণরূপে ভোগ-বাসনা শূন্যতাই যদি মুক্তি হয়, তবে ভক্তের মুক্তিও অবশ্যম্ভাবী। এক্ষণে সরল ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণে অবিচ্ছিন্ন মনো-গতির নামই ভক্তি ——তাহা যে ভাবে ও যে আকারেই প্রকাশ পাউক। ভক্তি উদয় হইলে সকল কার্য্যই শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশে বা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কখনই মন শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। যত দিন শ্রীকৃষ্ণে মনের অবিচ্ছিন্ন অনুকূল গতি উপস্থিত না হয়, তত দিন শুদ্ধ ভক্ত হইতে পারা যায় না। শুদ্ধ ভক্তির উদয় হইলে আর বিষয়-ভোগে স্পৃহা থাকে না; পরন্তু প্রেমানন্দের উদয় হইতে থাকে।

প্রঃ। আপনার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণে লোভই ভক্তি।

উঃ। শ্রীকৃষ্ণে লোভ ভক্তি বটে। কিন্তু ভক্তি বলিলে শুদ্ধ সেই লোভই বুঝায় না, সেই লোভাত্মক শ্রবণ কীর্ত্তন ও সেবনাদি

কার্য্যও ভক্তি-পদ-বাচ্য। ভক্তির দুইটি লক্ষণ ধরিলে শ্রীকৃষ্ণে লোভকে ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও সেবনাদি কার্য্য তটস্থ লক্ষণ বলিতে পারা যায়। সৎসঙ্গ ও সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে লোভ উপস্থিত হয়। লোভ উপস্থিত হইলে লোভের বস্তুকে লাভ করিবার জন্য স্বতঃই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে। যথাক্রমে ভজন পরিপক্ক হইয়া প্রেম-সূর্য্যের উদয় হইয়া থাকে। এই প্রেমারই প্রয়োজন। প্রেমাই ভক্তের পরম পুরুষার্থ। অনন্ত সুখের খনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমারই বশীভূত। হৃদয়ের নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়া শ্রীশ্রীভগবানের পূজা কর। তিনি অবশ্যই আয়ত্তের মধ্যে আসিবেন। তিনি আয়ত্তে আসিলে আর কিছুরই অভাব থাকে না।

এস্থলে ইহা বক্তব্য যে, যে ব্যক্তি কখন নিষ্কাম ভাব কাহাকে বলে জানে না এবং নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিয়া কি প্রকার সুখের উদয় হয় তাহার তত্ত্ব রাখে না, তাহার পক্ষে ভক্তিসুখ আস্বাদন বড়ই দুঃসাধ্য। কেননা ভক্তিভাব নিষ্কাম ভাবেরই অব্যবহিত পূর্ব্বা-বস্থা। হৃদয় উচ্চ ও সারগ্রাহী না হইলে প্রকৃত নিষ্কাম ভাব উদয় হয় না। তুচ্ছ ও ক্ষণিক বিষয়সুখে যাঁহারা বিমুগ্ধ, জড় ও ক্ষণভঙ্গুর বিষয়সহযোগে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাই যাঁহারা সুখের পরাকাষ্ঠা মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে ভক্তি সুখ আস্বাদন নিতান্ত দুরূহ। ভক্ত আত্মসুখ চায় না। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা "সর্ব্বভূতে ভগবান" দর্শন করিয়া পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন, আত্মসুখ তাৎপর্য্য না রাখিয়া পরের সেবা করিয়া যাহা লাভ হয় তাহাই নিষ্কাম ভক্তের প্রাপ্য। অত্যন্ত মহত্ত্ব না থাকিলে মহৎ বস্তুকে ধারণ করা যায় না। পরব্রহ্ম, পরমার্থ বা প্রেম অতিশয় মহৎ বস্তু। তাহা লাভ করিতে হইলে মহৎ হৃদয়ের প্রয়োজন। হৃদয়কে শুদ্ধ আপনার স্ত্রী, পুত্র, বা দুই চারিজন আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই আবদ্ধ না রাখিয়া "সর্ব্ব জীবে সমদয়া" অভ্যাস করিতে হয়। হৃদয় এক প্রকারে

খুব উচ্চাভিলাষী ও উন্নত না হইলে সর্ব্বোচ্চ সর্ব্বাশ্রয় বৃহদ্বস্তু কখন লাভ করা যায় না। "সর্ব্ব ভূতে সম দয়া"র নামই বৈরাগ্য। প্রথমতঃ ভক্তিদেবী বৈরাগ্যাকারেই হৃদয়মন্দিরে উদয় হইয়া থাকেন। বৈরাগ্য নীরস, অসুখকর, বা অপকৃষ্ট সামগ্রী নহে। বৈরাগ্যবিহীন ও বৈরাগ্যযুক্ত হৃদয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, যে হৃদয় বৈরাগ্য উদয়ের পূর্ব্বে পুত্র কলত্র ও দুই চারিজন মাত্র পরিজনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, বৈরাগ্য উদয়ে সেই আবদ্ধতা বা সীমাবদ্ধতা দূর হইল। নিখিল সদ্বৃত্তিনিচয়ের আধার স্বরূপ হৃদয় তখন মুক্ত হইয়া বিভূতা ওাবজ্ঞতা প্রাপ্ত হইল। দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি মধুর সদ্বৃত্তিগুলি উপাধি ও উপসর্গবিহীন হইয়া সবল হইতে লাগিল ও অত্যন্ত সুখরূপা ভক্তি দেবীর অঙ্গ পুষ্ট করিতে লাগিল। যে হৃদয় ছোট ছিল তাহা বড় হইল, যাহা নিকৃষ্ট ছিল তাহা উৎকৃষ্ট হইল, যাহা সভয় ছিল, তাহা নির্ভয় হইল। সেইজন্য বলিতেছি, বৈরাগ্য নীরস অসুখকর ও অপকৃষ্ট সামগ্রী নহে। ভগবদ্ভক্তগণ পরমাদরে বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় যাঁহারা এইরূপ বৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহারাই ধন্য ও সমাজের শীর্ষস্থানীয়। আধুনিক পণ্ডিত ও বড় লোকের মধ্যে পরলোকগত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়কে আমরা, সম্পূর্ণরূপে না হউক, পর বৈরাগ্যযুক্ত বলিতে পারি; কেন না তাঁহার দয়ার সীমা ছিল না। তাঁহার আর কোন গুণ না থাকলেও শুদ্ধ এই গুণেই তাঁহাকে আমরা একজন ভগবানেরই ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিতে পারি! প্রকৃত কথা বলিতে কি, ভগবৎ প্রেম লাভ করিতে হইলে হৃদয় যত অধিক স্নেহযুক্ত হয় ততই ভাল। কেননা স্নেহেরই গাঢ় অবস্থাকে প্রেম বলে।

প্রঃ। মহাশয়! দেখিতেছি, ভক্তি অতি উচ্চ জিনিষ। ভক্তি উদয় ও অভ্যস্তা হইলে ভগবৎ প্রেম বা পরমার্থ লাভ হইয়া থাকে। পরমার্থ লাভ হইলে আর কিছুরই অভাব থাকে না, ইহা সকল সম্প্রদায়েরই সাধুগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এখন বলুন

দেখি, আমি কেমন করিয়া বিশেষ রূপে ভক্তি লাভ করিতে পারিব।

উঃ। ভক্তি পথের পথিক হইতে হইলে সৎগুরুর নিকট দীক্ষা ও সৎসঙ্গ করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হয়। যদি বিশেষ শুনিতে ইচ্ছা হয় তবে দীক্ষা ও শিক্ষার কথা আপনাকে বারান্তরে বলিব।

(ক্রমশঃ)

ময়ূর।

কার প্রেমে হেন রঙ্গে নাচিতেছ শিখি রে ?
কি দেখিয়া হ'ল এত আনন্দ তোর রে ?
গগনে জলদোদয়,
তাহে কেন প্রেমোদয় ?—
চাতকের প্রায় কভু নহ তুমি শিখি রে !
তবে কেন মেঘে হেরে আনন্দে নাচিছ রে ?

ঘন ঘন-সন্নিবেশে গগন ছাইল রে,
নর, নারী, পশু, পাখী আবাসে চলিল রে।
কেবল তুমি রে পাখি !
বারিবাহে দেখি' দেখি'
পুচ্ছের বিস্তার করি' প্রেমেতে নাচিছ রে।
মরি কিবা গ্রীবাভঙ্গী কিবা পদক্ষেপ রে !!

বারেক পুচ্ছের দিকে ফিরাইছ আঁখি রে,
আবার বারেক প্রেমে জলদে হেরিছ রে;
কেন হেন দেখা দেখি
বল মোরে বল শিখি !
কি ভাব উদয় হয় হেরিয়া জলদেরে,
পুচ্ছের সহিত তার কি সম্বন্ধ আছে রে ?

এইবার বুঝিয়াছি শিখি! প্রাণে প্রাণে রে,
কেন তোর এ আনন্দ হেরিয়া জলদে রে;-
জলদবরণ হরি
নটবর বংশীধারী,
পীতবাস,শিরে চূড়া, তাহে শিখিপাখা রে,
গোকুল-আনন্দ, গোপীজন-মনোহর রে!--

সেই ভাবময়-ভাব জাগি'ছে হৃদয়ে রে,
তাইত জলদে হেরি' নাচিতেছ তুমি রে;
জাগি'ছে হৃদয়ে তব,
প্রেমময় ভবধব
তোমার পাখাটি প্রেমে ধরেছেন শিরে রে,
তাই পুচ্ছ বিস্তারিয়া প্রেমেতে নাচি'ছ রে।

তোমার প্রেমের শিখি, বলিহারি যাই রে!
হইয়াছ আত্মহারা হেরিয়া জলদে রে!
ভাসিছ প্রেম-তরঙ্গে,
নাচিতেছ কত রঙ্গে;
তোমার প্রেমের-সিন্ধু উথলি পড়ি'ছে রে!
যে হের'ছে তোরে, সেও আনন্দে মাতি'ছে রে!

পাখী তুমি, এতভাব তোমার হৃদয়ে রে!
কি ছার মানব আমি কিবা দর্প করি রে!
হেরিয়া জলদে তব
উপজিল হেন ভাব;—
কতবার গগনেতে হেরেছি জলদে রে,
বারেক এমন ভাব হয় নাই হৃদে রে!

হেরিয়াছি কতবার শিখি! তোর পাখা রে,
শিখিপাখাধারী হরি জাগেনি হৃদয়ে রে!
শুনিয়াছি তাঁর নাম,
শুনিয়াছি গুণগান,

শুনিয়াছি ভক্তমুখে লীলার প্রসঙ্গ রে;—
মরুময় এ হৃদয় প্রেমবিন্দু নাহি রে!

কাল জলদে হেরি' নাচিতেছ তুমি রে!
সদাকালে হেরিয়াছি শিখিপাখা, মেঘে রে,
কদম্ব বিটপি-বর,
ভক্তগণ দেহ তাঁর,
তথাপি জাগেনি প্রাণে ভাবময়-ভাব রে।—
পাখী তুমি, আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ শতগুণে রে!

শিখি! আজ নতশিরে তোর কাছে যাচি রে,
দাও ভিক্ষা দাও মোরে তোর ভাবকণা রে;
আজ বড় সাধ মনে,
নাচিব তোমার সনে
গগনে জলদ পানে চাহিয়া চাহিয়া রে,
হারাইব আপনারে হেরে তোর পাখা রে;

ভগবৎ-তত্ত্ব।

রসোহহম্ অপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ (গীতা।)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রত্যেক শ্লোকটী এক একটী মন্ত্র। কি ভাবে কোন বিষয় মনন করিতে হয়, সেই ভাব ও বিষয় প্রত্যেক মন্ত্রে নিহিত থাকে। এই রহস্য মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কীলকে স্পষ্ট প্রকাশ আছে।

বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদী দিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে॥
সর্ব্বমেতদ্ বিজানীয়াৎ মন্ত্রানামপি কীলকম্।
সোহপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সততং জপ্য তৎপরঃ॥

অমৃতাত্মক শশধরধারী পূর্ণমঙ্গলময় শিবের জড় দেহ নাই, তাঁহা বিশুদ্ধজ্ঞানময়। সত্ত্বরজস্তমঃ তিনটী গুণ বিষয়ক যে বেদ তাহার দিব্য বা অলৌকিক ভাবে দর্শন সেই বিরূপাক্ষেই হইয়া থাকে। লোকে যে শ্রেয়ঃ বা বর প্রার্থনা করে তাহার নিমিত্ত একমাত্র সেই বরদ মঙ্গলময় ঈশান। কায়মনবাক্যের অধীশ্বর সেই শিবের প্রতি আত্মার অর্পণই নমস্কার। এই সমস্ত সকল মন্ত্রেরই কীলক অর্থাৎ খিলস্বরূপ। খিল খুলিয়া দিলে যেমন গৃহের মধ্যে প্রবেশ হয় এবং গৃহের আভ্যন্তরিক অবস্থা দৃষ্টিপথে আইসে, তেমনি এই ভাবটি আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক মন্ত্র পাঠ এবং তাহার গূঢ় অর্থ দর্শন করিবার চেষ্টা করিলেই তাহার অনুভূতি আইসে, নচেৎ নহে। যিনি এই ভাবটি তৎপর হইয়া সতত জপ করেন, তিনি পরম মঙ্গল লাভ করেন। চণ্ডীর এক একটী শ্লোক এক একটী মন্ত্র; এবং তাহাতে সাতশত শ্লোক আছে বলিয়া উহার অপর নাম সাপ্তশতী। গীতায় ও তৎসম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই। এখন মন্ত্ররহস্য ভেদ করিবার উপায় কি, তাহা ঋষি বাক্যে পাওয়া গেল। এক্ষণে গীতা হইতে অন্য কোন আলোক পাওয়া যাইতে পারে কি না দেখা যাউক।

উদ্ধৃত শ্লোকটী ভগবদ্গীতার ৭ম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক। গীতার এক একটী অধ্যায়ের এক একটী বিশেষ লক্ষ্য আছে, এবং প্রত্যেক শ্লোক উক্ত মূল লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া রচিত। ৭ম অধ্যায়ের লক্ষ, জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ। বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় এবং তাহার ক্রমানি পর্য্যালোচনা করা বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বিষয় অনুসারে বিজ্ঞানে বিভেদ হয়, যথা নীতি-বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইত্যাদি। উক্ত ৭ম অধ্যায়ে জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার স্বরূপ কি এই সমস্ত বিষয় যে পর্য্যালোচনা হইয়াছে, তাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান শব্দের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা জীবের ও ঈশ্বরের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ। উদ্ধৃত শ্লোকটী দ্বারা যদি পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্য-সিদ্ধি ও ভাবার্থ আইসে, তাহা হইলে উহার

প্রকৃত অর্থোপপত্তি হইল বুঝিতে হইবে, নচেৎ উহার বাক্যার্থবোধে যে জ্ঞান জন্মে তাহা শব্দজ্ঞান মাত্র। সে জ্ঞানে জীবের কোন ফল হয় না। অন্ন পরিপাচিত না হইলে যেমন দেহের কোন উপকার হয় না, দেহের মলরূপে নির্গত হইয়া যায়, আর পরিপাচিত হইলেই দেহের অংশভূত হইয়া পুষ্টি ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে; তদ্রূপ জ্ঞানের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের দেহ ও আত্মার কি সম্বন্ধ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে, ও তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মাইলে, তাহা আমাদের আত্মজ্ঞানের পুষ্টি ও উন্নতি সাধন করে। তাহা না হইলে অনেক সময়ে দৈহিক মলের ন্যায় আত্মজ্ঞানের বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সৌরজগতের একটী অতি ক্ষুদ্র গ্রহের একাংশে কুরুক্ষেত্র মধ্যে চতুর্দ্দশপাদমাত্র নরদেহে বিরাজমান। শশী ও সূর্য্য তাঁহা হইতে লক্ষ লক্ষ যোজন অন্তরে অবস্থিত। অসীম সমুদ্র অনেক দূরে। এই অবস্থায় তিনি বলিয়াছেন "আমি শশী ও সূর্য্য উভয়েরই প্রভা, সলিলের রস, আকাশস্থ শব্দ, জন মাত্রের পৌরুষ ও প্রণবরূপ মন্ত্র"। পূর্ব্ব সমস্ত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহার সহিত সূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রভৃতির দৈশিক পার্থক্যই দৃষ্ট হয়, কোন প্রকার যোগ দৃষ্ট হয় না। তবে তিনি যে বলিলেন, "আমি শশিসূর্য্যের আভা" ইত্যাদি, তাঁহার অর্থ কি? দেহাবচ্ছিন্ন সামান্য মানবরূপধারী হইয়াও কি তাহার সূর্য্যাদির আভা, সলিলের সলিলত্ব প্রভৃতির সহিত কোন যোগ আছে, এবং তাহার সত্তাতে কি উহাদের সত্তা? এইরূপ তর্ক মনে উদয় হইলে সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তা, ইহা আমাদের স্থির নিশ্চয় করা উচিত। কারণ তাঁহার বাক্যই বেদ ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কথাটী গুরুবাক্যানুসারে স্থির সত্য বটে, কিন্তু তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে আমাদের স্থূল দেহই এই জ্ঞানের প্রধান প্রতিবন্ধক। তজ্জন্য ভগবান নিজেই পরে বলিয়াছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

মানব দেহ আশ্রয় করায় মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে অবজ্ঞা করে অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে সক্ষম হয় না। তাহারা ভূতাদি সৃষ্টি-কর্তৃত্ব, আমার যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভাব তাহা না বুঝিয়া এইরূপ ভ্রমে পতিত হয়।

একটী বিষয় সত্য বলিয়া ধারণা থাকিলেও তাহা কিরূপে হয়, এইটী আমাদের মতন করিয়া বুঝিবার জন্য যদি কোন অনুকূল যুক্তি পাওয়া যায়, তবে ঐ সত্যটী আমাদের মনে আরও বদ্ধমূল হইয়া যায়। বক্র পথটী সোজা বা সরল পথ অপেক্ষা দীর্ঘতর তাহা আবাল বৃদ্ধ সকলেই জানেন, তত্রাচ তাহার অনুকূল যুক্তি জ্যামিতিতে দেওয়া হইয়াছে দেখা যায়। তদ্রূপ এই বিষয়ের কোন অনুকূল যুক্তি আছে কি না তাহাই দেখা যাউক।

আমাদের দেহ অন্য সমস্ত দ্রব্য হইতে একটী অবচ্ছিন্ন পৃথক পিণ্ড বটে, কিন্তু তাহার পার্থক্য কত দূর? জলাশয়ের জলের কোন অংশ শৈত্য প্রযুক্ত যমিয়া গিয়া তুষার-খণ্ডবৎ যখন ভাসিতে থাকে, তখন তাহা জল হইতে একটী অবচ্ছিন্ন পিণ্ড বলিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহার জলই যে উৎপত্তির কারণ, এবং তাহা শৈত্যের অভাবে পুনর্ব্বার যে জলে মিলিত হইয়া অভিন্ন ভাব থাকিবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেহটীও তদ্রূপ। এই অনন্ত বিশ্ব সাগরে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ মরুৎ, ও ব্যোম, এই পঞ্চ মহা ভূতের অংশ মাত্র একত্র ঘনীভূত হইয়া এই দেহ সংঘটন হয়। এইরূপে গঠন জন্য বলিয়া এই শরীরের একটী নাম "সংঘাত" গীতায় উল্লেখ আছে। আবার তুষার খণ্ড যেমন একবারেই বৃহৎ আকার ধারণ করেনা,— প্রথমতঃ অল্প একটু জল যমিয়া ক্ষুদ্র একটী খণ্ড হয়, ও পরে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জলচয় ক্রমশঃ যমিয়া যমিয়া উহার আয়তন বৃদ্ধি

করিতে থাকে ; তদ্রূপ আমাদের এই দেহ ও প্রারম্ভে একটী ক্ষুদ্র বিন্দুমাত্র থাকিয়া ক্রমে ঘনীভূত হইয়া এই বিশ্বার্ণবের মহাভূত সকলকে সর্ব্বত্র আহরণ করিয়া সংবর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইতেছে দেহের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বারা ঐ ভূতচয় আহৃত হয় বলিয়া, আমাদের খাদ্যের নাম আহার। দেহ স্বতন্ত্র হইলেও যদি আহারের উপর আমাদেব দেহের ও জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে ঐ আহারকেই আমাদের সত্তার নিধান বলা যাইতে পারে। আবার বায়ু যে আমাদের প্রাণ তাহার ত আর কথাই নাই। সেই প্রাণ ত কাহারও দেহেব মধ্যে প্রচুর ভাবে নাই ; অতি অল্প কাল মাত্র নিশ্বাস দ্বারা বাহিরের বায়ু দেহের মধ্যে প্রবেশ না করিলেই, আমাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল বলিয়া থাকি। কিন্তু তৎকালে তাহা বাহির হয় নাই, বাহ্য বায়ুব গতায়াত রোধ ও তাহার সহিত দেহের আভ্যন্তরিক যন্ত্রের যোগ নাশেই আমরা যাহাকে "আমাদের প্রাণ" বলিয়া এত আদরের জিনিষ মনে করি, তাহা নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের দেহ-পরিমিত প্রাণ-বায়ু অর্থাৎ এক নিশ্বাসে যে বায়ু দেহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা আমাদের প্রাণ ধরিলে আমরা ক্ষণস্থায়ী মাত্র হইতাম। অনন্ত আকাশে আমাদের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্র বায়ু বেষ্টন করিয়া থাকে বলিয়া আমরা সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়া সুদীর্ঘ কাল জীবন ধারণ করি। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয়! আমাদের প্রাণ যে দেহের বাহিরে ও রহিয়াছে, আমরা যে প্রাণ সাগরে ডুবিয়া আছি, তাহা আমরা একবারও ভাবি না।

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু ধরাতলের নিকটে ঘনীভূত হইয়া আছে। ঐ বায়ুর স্তর, যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, ততই সূক্ষ্ম ও তরল দেখা যায়। সেই নিয়মানুসারে উহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভাবে অনন্ত আকাশে ব্যাপিয়া আছে, এইরূপ অনুমান অনায়াসে করা যাইতে পারে। আমাদের নিশ্বাস-কার্য্য দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু কতক পরিমাণে

নিঃসারিত হইলে উপরস্থিত বায়ুর ভারে নিম্নস্থ বায়ু অল্পায়াসে দেহমধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের দেহমধ্যে প্রাণ সঞ্চালনের যে যন্ত্রগুলি আছে এবং যাহার ব্যাপারে দেহ ও জীবন রক্ষা হয়, তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে। যাহা ইতিপূর্ব্বে দৃষ্ট হইল, তাহাতে ঐ প্রাণময় কোষ যে বিশ্বকোষের একাংশ এবং তাহার সহিত সম্পূর্ণ রূপে যন্ত্রিত, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ জীবের ঐ প্রাণ সাগর আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু যিনি ঐ অনন্ত প্রাণ সাগর সৃষ্টি করিয়া তাহাকে নিয়মাবদ্ধ করিয়াছেন ও সর্ব্বদা তাহার সংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তিনিই ঐ প্রাণ সাগরের কর্ত্তা ও প্রাণময় ঈশ্বর। তিনি আপন নিয়মানুসারে দেহিরূপে একদেশে আবির্ভূত হইলেও তাহার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপর কর্তৃত্বের নাশ হয় না। তৎকালে তিনি দেহী হইয়াও পূর্ণব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণের "নবনীরদ শ্যাম" রূপ কেবল মাত্র তাহার রূপের পরিচয় নহে, উহাতে আর একটী সুন্দর বৈজ্ঞানিক ভাব নিহিত আছে। বায়ুমধ্যে বাষ্প সূক্ষ্মাকারে যখন থাকে তখন তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, এবং তাহা সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। কিন্তু যখন উহার কতক গুলি জমিয়া গিয়া শ্যামল মেঘাকারে পরিণত হয়, তখন উহা দৃষ্টি পথে উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের দেহধারণ সূক্ষ্ম কারণ-রূপ বাষ্পের জলধর রূপে আবির্ভূতির ন্যায়। অবতার কথাটীতে এই ভাবটী নিহিত আছে। দৃশ্যপটকে অবতরণিকা এবং নটের অবতরণ বলে। পূর্ণব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ডই স্বরূপ। সেই রূপ গোপন করিয়া যখন অন্য কোন ভাবে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাই তাঁহার অবতার। অবতারের রূপ মাত্রটীই তাঁহার স্বরূপ জানিতে দেয় না বলিয়া তাহাকে হিন্দু শাস্ত্রে মায়া বলে এবং ইংরাজি ভাষায় তাহার নাম (মাস্ক্) অলীক সাজ।

(ক্রমশঃ)

---*---

উদ্দেশ্য ।

—:*:—

জীবনের উদ্দেশ্য আমার
জানিছ কি করুণানিদান ?
অবশ্য সে সব গুলি   হৃদিপদ্মসহ তুলি,
সুচারু চরণতলে করেছি প্রদান !

কোমল কটাক্ষপাত করি,
বারেক দেখহ নাথ তুমি,—
মরমের প্রান্তদেশে   সুদীন কাঙ্গাল বেশে
যে সব উদ্দেশ্যগুলি রহিয়াছি ঘুমি' !

জীবনের পূর্ব্বাহ্নে আমার
জাগিয়া আছিল এরা সবে ;
কিন্তু, পরে মর্ম্মদেশে   মজিয়াছে নিদ্রাবশে
জীবন-মধ্যাহ্ন মোর আরম্ভিল যবে ।

জাগাইতে কতই যতন
করিয়াছিলাম দয়াময় !
সে যত্ন হয়েছে ব্যর্থ,   হইয়াছি অসমর্থ,
তাইত লয়েছে দীন তোমার আশ্রয় ।

এ জগতে দয়া মায়া নাই—
সকলে কঠিন অতিশয় ! —
পার্থিব সাহায্যআশে   নিরখিলে আশে পাশে,
সবাই ফিরায় মুখ হইয়া নির্দ্দয় !

দীন বেশে কাতর বদনে
যদি যাই কাহারো সদন—
অমনি সে ক্রোধভরে   যেতে বলে স্থানান্তরে,
সার হয় অভাগার বিফল রোদন !

দীনবন্ধু! অনাথ শরণ,
তাই আজি তোমার সকাশে
আসিয়াছে দীন হীন, ও পদে করিতে লীন
সুষুপ্ত উদ্দেশ্যচয় —আশার আশ্বাসে।

আমার সাধের ধন গুলি
বহু দিন নিদ্রায় মগন,
কৃপাকরি নিরখিয়া দেহ প্রভু জাগাইয়া
জাগিয়া কর্ত্তব্য কাজ করিবে সাধন।

অথবা জাগিয়া কাজ নাই—
সুখে আছে নিদ্রার কৃপায়;
জাগিলে নিরাশা আসি, বরষি' অনলরাশি
পাছে দগ্ধ করি নাথ! দেয় সে সবায়!

তবে মোর শেষ নিবেদন,
বিভো! তব পদ-শতদলে—
অবনীতে যত দিন রহিবে এ দীন হীন
সত্যেরে ত্যজিয়া যেন কভু নাহি চলে!

জগতের সাধি' ক্ষুদ্র হিত
যেন এ জীবন স্রোতস্বিনী
বহি যায় ধীরে ধীরে, মিলিতে অনন্ত নীরে
কুল কুল কুল নাদে মৃদুল গামিনী।

প্রদোষ তিমির আসি যবে
জীবন করিবে আচ্ছাদন,
গাহি' তবে তারস্বরে "মুকুন্দ মুরারে হরে"
হই যেন অনন্ত নিদ্রায় নিমগন।

(গান)

সুরট মল্লার—একতালা।

হরি কি গুণ আছে তব নামে!
নিলে ঐ নাম প্রাণে পড়ে টান!
(তোমার) নাম নিতে নিতে বাসনা হয় চিতে
দেখতে তোমায় নয়নে॥

ঐ নামের গুণ একি চমৎকার!
নাম নিলে হয় প্রেমের সঞ্চার,
(তখন) ভাবি এ সংসার সকলি অসার,
নামে মোহ-ঘুম ভাঙ্গে॥

কোন্ দ্রব্য দিয়ে গঠেছ এ নাম!
নাম নিলে স্বর্গ হয় তুচ্ছ জ্ঞান;
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব নিতে চায় না চিত্ত,
অপদার্থ সব মনে হয়;—
ঐ (হরি) নাম কেবল সত্য সত্য সত্য,
ঐ (হরি) নাম কেবল পরম পদার্থ,
ঐ পদার্থ বিনে সকলি অনিত্য,
মাহাত্ম্য তার কে জানে?

নামে কেন হয় মনের বিকার?
নামে কেন হয় আনন্দ অপার?
হয় অনুমান, করুণা-নিদান!
নামের সঙ্গে মিশে রয়েছে;—
মনে হয় জীবে তরা'বার তরে
নাম-রজ্জু ফেলে রেখেছ সংসারে,
সেই রজ্জু যে জন ধ'রেছে সজোরে
সেই তরে জীবনে॥

(সেই) রজ্জু হৃদে মন বাঁধরে বাঁধরে,
ছিড়্‌বেনা সে শত জন্ম জন্মান্তরে,
সে এমনি শক্ত রশী অক্ষয় অবিনাশী—
ভয় রবেনা পতনে॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তি ভক্ত্যাঃ পরং পদং ॥

——ঃ*ঃ——

ভক্তি।

সংসার মরুতে
শান্তির বারিতে
নিষিক্ত করিতে
মানব-প্রাণ—
কে তুমি রূপসি!
জ্যোতি পরকাশি'
অমিয় বরষি'
গাহি'ছ গান?

স্বরগের বীণা
তুমি কি নবীনা?—
ভবেতে শুনিনা
এরূপ তান,—
শ্যামের বাঁশরী
কিম্বা মূর্ত্তি ধরি'
মর্ত্তে সুধা-বারি
করিছ দান?

যে হও সে হও,
পৃথিবীর নও!
তুমি মোরে কও,
কোথায় থাকি'

সাধিলে এ তান,
শিখিলে এ গান,
মোহিতে পরাণ
পীযূষ মাখি?

সুষমা সুঠামা
নয়নাভিরামা
অনন্ত নীলিমা
ভরিয়া তানে
কারে ডাক ধনি!
কল-নিনাদিনি!
দিবস রজনী
অধীর প্রাণে?

মন, প্রাণ, হিয়ে
চরণে সঁপিয়ে
যাহারে হৃদয়ে
পূজিতে, ধনি!
গেছে কি চলিয়া
তোমাকে ত্যজিয়া
হায়! সে "কালিয়া"
নয়নমণি?

বিরহ অনল
হইয়া প্রবল
করি'ছে বিকল
তোমার হিয়া,
তাই কি কাতরে
ডাকিছ সুস্বরে
পরাণবঁধুরে
পরাণ দিয়া ?

জানিনা কেমনে
তোমা হেন ধনে
বিরহ দহনে
দহিল "কালা";
ভাবিলনা মনে
ক্ষণ অদর্শনে
ও কোমল প্রাণে
হ'বে কি জ্বালা ?

শ্যামের বিরহ
কেমন অসহ,
ভুঞ্জি অহরহঃ
বুঝেছ এবে ;
বল দেখি, ধনি !
ইহাসম ফণী
আছে কিনা, শুনি,
বিশাল ভবে।

ডাক-ডাক-ডাক
"শ্যাম" ব'লে ডাক !
পরাণ জুড়াক
মধুর নামে !

বলিলে ও নাম
হ'বে পূর্ণকাম,
পা'বে গুণধাম
হারাণ শ্যামে।

ওগো প্রিয়ম্বদা !
দিয়া "নাম"সুধা
নাশ ভবক্ষুধা
মরি'ছি জ্বলে ;
কিবা ঐ নাম,
নাহি মোর জ্ঞান,
কি হ'বে বিধান
আমার ভালে ?

হলাহল দিয়া
হৃদি আবরিয়া
বলেতে পশিয়া
প্রাণের ঘরে,
আমারি এ "মন"
সদা সর্ব্বক্ষণ
আমারি নিধন
বাসনা করে।

ত্যজি' স্বাধীনতা
পর পদানতা
গোলামের জুতা
হয়েছি আমি;
রিপুর শাসনে
পাপের তাড়নে
কাঁপি'ছে সঘনে
হৃদয়-ভূমি।

হইয়াছে অন্ত
স্নশীল স্নশান্ত
শত পুণ্যবন্ত
গুণের মোর,
কিছু নাহি আর
বলিতে "আমার"
হেবি চারিধার
দুঃখেতে ঘোর।

শুনিয়াছি, ভক্তি!
আছে তব শক্তি
জীবে দিতে মুক্তি,
তাইগো—আশে
ঘুচা'তে বেদনা
মিটা'তে বাসনা
এসেছি দেখনা
তোমার পাশে।

প্রচণ্ড প্রতাপে
ঘোর পাপ-তাপে
কুরীতি কলাপে
তাড়ায়ে দূরে
বস, বরাননে!
হৃদয়-আসনে,
ডাক "শ্যাম"ধনে
মধুর স্নরে।

অমৃতের পারা
তব স্বরধারা
করি' মাতোয়ারা
পরাণ মন
বহুক স্নধারে
লহরে লহরে
হৃদয় কন্দরে
সরব ক্ষণ।

শুনিয়া স্নগীতি
আসিবে গো সতি!
হ'য়োনা বিরূপ
যাঁহার স্বরূপ
যবে সে শ্রীপতি
তোমার ঠাঁই,
দেখাতে সে রূপ,
জগতে নাই।

ক র্ম্ম যো গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে এই জগত সংসার শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে তাঁহার লীলাভূত অনেক রহস্য আছে। এইক্ষণে কর্ম্ম-বিষয়ক তাঁহার একটী লীলার রহস্যো-দ্ঘাটনের সহিত যৌবন প্রারম্ভে আমাদের ধর্ম্মযুদ্ধ-বিষয় পর্য্যা-

লোচনা করা যাউক। কর্ম্ম ও অকর্ম্ম লইয়াই আমাদের যুদ্ধ, অর্থাৎ অকর্ম্ম হইতে চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তির প্রয়াস-করণকেই ধর্ম্ম যুদ্ধ কহে। আমরা মানব-রূপে সর্ব্বদা অবিদ্যার বশীভূত। আরও শাস্ত্রে আছে,

"পাপেন পাপং পুণ্যেন পুণ্যং উভাভ্যামেব মনুষ্যদেহঃ"

সুতরাং আমরা যে পাপে লিপ্ত হই, তাহার কারণ-নির্দ্দেশ শাস্ত্রই করিয়াছেন। কিন্তু মানব জীবনের যে একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে, তাহার সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নাই। আমরা যে চিরকালই এই পাপরূপ পিশাচের অধীনে থাকিয়া অনন্ত কাল জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিব তাহা কাহারও আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতারও অভিপ্রেত নহে। অতএব আমরা সর্ব্বদা অবিদ্যাকে পরাভব করিতে যত্নবান হইব, ইহা সেই আদি পুরুষ দয়াময়ের ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়, আর সেই নিমিত্তই তিনি আমাদের চিত্ত সুখাভিমুখি করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যখন আমরা কর্ম্মক্ষেত্র-দ্বারে উপনীত হইয়া সংসার নাট্য-শালায় নানারূপ অভিনয় দর্শন করি এবং নিজেরাও অভিনয় করিতে অগ্রসর হই, তখনই সকলের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় চিত্ত বিকার-ভাবান্বিত হয়,—এই যে পিশাচগণের ভয়ঙ্কর তাণ্ডব নৃত্য; অট্টঅট্ট হাসে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তাহারা সংসার ভীষণ হইতে ভীষণতর করিতেছে, এই যে ভীমাকৃতি উলঙ্গিনী ডাকিনী-গণ প্রচণ্ড পদক্ষেপণে ধূলিপটল উড্ডীয়মান করত চতুর্দ্দিক অন্ধকার সমাচ্ছন্ন করিতেছে! * * * কোথায় হৃদয়-তন্ত্রী-স্পর্শ-কারি বীণা-ঝঙ্কার-সমন্বিত সুললিত সংঙ্গীতধ্বনি! কোথায় জ্যোৎস্না-বিধৌত, সুমধুর সৌরভ-পূরিত শান্তি-কাননের মন-প্রাণ-স্নিগ্ধকারি মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল! * * *

যখন শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আমরা একান্ত প্রপীড়িত হই, সংসারের নানারূপ আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইয়া আমাদের সম্পূর্ণ চিত্ত বিভ্রম উপস্থিত হয়, তখন লীলাময়ের লীলায় আমাদের শ্রদ্ধা চঞ্চল হওয়া অবশ্য বিচিত্র নহে। তখন মনে হয়, ভগবন্! তোমার

একি লীলা! আমাদের এই হিংস্র জন্তু-পরিপূর্ণ বিপদ-সঙ্কুল সংসার অরণ্যে পাঠাইয়া তোমার এ লীলা করিবার তাৎপর্য্য কি? এই যে অসহনীয় সংসার যন্ত্রণা, এই যে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ,—এই সকল কি তোমার লীলা খেলার অঙ্গ? আমরাত সুখ চাই, কিন্তু সুখের পথে এত কণ্টক কেন? আমাদিগের অভীষ্ট অনায়াস-লভ্য হইলে তোমার লীলার কি বিঘ্ন ঘটিত? এই সংসার রণ-ক্ষেত্রে অনেকেই দেখিতেছি আমাদের বিপক্ষতাচরণ করিতে দণ্ডায়মান। আবার শত্রুদল অবলোকন করিলে আমরা আরও হতাশ হই। ইন্দ্রিয়গণ আজ নিজজন হইয়া আমাদের শত্রুতা সাধনে তৎপর। কেমন করিয়া নিজজনের বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হইব! যাহাদের সুখে সুখী, যাহাদের দুঃখে দুঃখী, কেমন করিয়া তাহাদের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করি। যেমন কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে মহাবীর অর্জ্জুন রণ স্থলে শত্রুপক্ষ অবলোকন করিয়া পরম সুহৃদ্ সারথি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই সংসার যুদ্ধে সকল বীরই এই জীবন-ব্যাপী ভীষণ সমর-কথা স্মরণ করিয়া তাহা হইতে বিরত থকিতে চায়। বস্তুতই ইন্দ্রিয়গণ আমাদের নিজজন, বস্তুতই কুরুপক্ষ পাণ্ডবগণের মিত্র; কিন্তু সময়ে মিত্রও শত্রু হয়, পরস্পরের ব্যবহার দোষেই হউক আর বন্ধুতা-সম্পর্ক বর্দ্ধিত করিতেই হউক। কেন পার্থ শত্রুদল নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছিলেন। তিনি কি বুঝিতে পারেন নাই যে দুর্য্যোধনাদি তাঁহার শত্রু। তাহা নহে, কিন্তু অর্জ্জুন, আত্মীয়গণের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবেন, ভাবিয়া আকুল হইতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, দয়াময়! এই রাজ্য লাভার্থ আবার আত্মীয়গণের সহিত যুদ্ধ কেন! তোমার নিকট প্রার্থনা করি এই ভীষণ রণ প্রত্যাখ্যান কর। কিন্তু দয়াময় ছাড়িলেন না, যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় যেমন পাণ্ডবগণের শত্রু-সংঘর্ষণ ঘটিয়াছিল, সেইরূপ তাঁহারই ইচ্ছানুক্রমে যে এই সকল শত্রু আজ আমাদিগের

সম্মুখীন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন! পাঠকবর্গ। শ্রীভগবানের ইচ্ছাই বিজ্ঞান, সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক ইচ্ছার মূলে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নিহিত আছে, তৎসম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নাই। উপস্থিত তাঁহার এই ইচ্ছা সম্বন্ধে কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইলে তাহা আমরা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। বহির্জগতে যেমন আমরা কোন কার্য্য দুই বিরুদ্ধ শক্তির কোন একটীর প্রাধান্য বশতঃ তৎ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে দেখি, অন্তর্জগতেও সেইরূপ একটী ক্রিয়ার সাধন বিপরীত দ্বিবিধা শক্তির কোনও একটীর প্রাধান্য সাপেক্ষ। মধ্যাকর্ষণী শক্তি যদি মধ্যপ্রসারিণী শক্তিকে পরাভব করিতে না পারিত, তাহা হইলে যেমন পৃথিবীস্থিত দ্রব্যাদি শূন্য পথে তাড়িত হওত ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে অনন্ত পথ ভ্রমণ করিয়াও কোথায় বিশ্রাম পাইত না, তদ্রূপ নিবৃত্তিপক্ষীয় অন্তঃকরণ বৃত্তি প্রবৃত্তিপক্ষীয় ইন্দ্রিয় আদি শক্তিকে জয় না করিতে পারিলে তাহাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া এই সংসারশূন্যে অনন্ত কাল ঘূর্ণিত হইয়াও নিবৃত্ত হইতে পারে না। কেননা, প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় তাহার নিবৃত্তি হয় না, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

মনোবিজ্ঞানের একটী সিদ্ধান্ত এই যে, কোন দুই বিপরীত বৃত্তির একটীর অভাবে অপরটীর চিত্তে ধারণা করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে সুখ দুঃখ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই সংসারে ইহাদিগের মধ্যে কোন একটীর অভাব হইলে অপরটীর বিষয় ধারণা উপস্থিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত হইত, অথবা আমরা তাহার ধারণাই করিতে পারিতাম না। সেই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতায় যোগের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন,

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্য যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্॥

আর "সমত্ব" অর্থাৎ দ্বন্দ্বভাব-শূন্যতাকেই তিনি যোগ বলিয়া পূর্ব্বের শ্লোকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, সৎ অসৎ, এই সমস্ত আমাদিগের মানসিক বৃত্তি বিশেষ এবং ইহারা পরস্পর পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই আমাদিগের চিত্তে পৃথক পৃথক ভাবে অনুভূত হইয়া এক একটী পৃথক পৃথক বৃত্তি বলিয়া প্রতীত হয়। এই বৈপরীত্য ভাব না থাকিলে আমাদিগের চিত্ত গঠিত হইতে পারিত না। অথবা এই বৈপরীত্য ভাব দুরীকরণ করিতে পারিলে আমাদিগের চিত্ত উপাধি বিহীন হইয়া সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য, সদসতের অতীত পরমাত্মায় সংমিলিত হয়।

এক্ষণে আমাদিগের সদ্বৃত্তি-সম্ভূত কর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনা করা হউক। পূর্ব্বে শত্রুপক্ষীয় সেনাদল অবলোকন করিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি কিন্তু আমাদের সহায় যে অনেক প্রভূতবলশালী মিত্র আছেন সেই বিষয় তৎকালে অজ্ঞ থাকা প্রযুক্ত আমরা বৃথা নিরাশাসাগরে ডুবিতে যাইতেছিলাম। সত্য, শৌচ, ক্ষমা, ধৃতি, দয়া ইত্যাদি সদ্বৃত্তির অনুশীলন-দ্বারা আমরা অনায়াসে দুর্জ্জয় রিপু সমূহ.ক সংগ্রামে পরাজয় করিয়া সৎচিদানন্দ স্বরূপ বিভুর সহিত মিলিত হইতে পারি ইহাই কর্ম্মযোগের প্রধানতম উদ্দেশ্য। কিন্তু কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীবাত্মা প্রথমে জয় পরাজয় শঙ্কা করিয়া নানারূপ সংশয়ে পতিত হন। কোনরূপ আশঙ্কা বা সন্দেহ নিরসনার্থ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ করতঃ বলি-তেছেন—

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥

হে অর্জ্জুন! তোমার শত্রুগণ পূর্ব্বেই আমাকর্ত্তৃক নিহিত হইয়াছে সুতরাং তুমি নিমিত্তমাত্র হওত ইহাদিগকে রণে জয় করিয়া যশো

লাভের সহিত সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর ; অতএব আর কোনরূপ শঙ্কা না করিয়া যুদ্ধার্থে বদ্ধপরিকর হও। তবে যত কাল না আমরা এই ভাবের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিব ততদিন কিরূপ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে তাহাই কর্ম্মযোগের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ চিত্তাভিনিবেশ অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদিগের কর্ত্তব্য দ্বাদশ অধ্যায়ে তিনি নিজমুখেই বলিতেছেন,—

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥

"মৎকর্ম্ম" অর্থে শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থ কর্ম্ম; কিরূপ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মঙ্গলময়ের তাহা অনুমোদিত ও প্রিয় হয় তাহাও তিনি নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

অথচ আমরা সকলে পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরস্পরের মঙ্গল সাধনে রত হই, ইহাই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা ও বিধান। এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যিনি পরিচালনা করিতেছেন তাঁহার কর্ম্মের সীমা আমরা কখনও করিতে পারি না, তথাপি তিনি সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং সেই পরম পিতারও, আমরা পরস্পরের সহায় এবং হিতাকাঙ্ক্ষী হই, ইহা একান্ত অভিপ্রায়। কিন্তু এই কর্ম্মযোগে আর একটী তাৎপর্য্য আছে। গীতায় সখা অর্জ্জুনের প্রতি সর্ব্বজীব-কল্যাণ-সাধক শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

অর্জ্জুন! কর্ম্মে তোমার অধিকার হউক, কিন্তু তাহার ফলে যেন তোমার আসক্তি না থাকে। কথাটী কিরূপ একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা তাহা আলোচনা করিতে পারি। স্বামী অতিথি-সেবা-পরায়ণ,

স্ত্রী অভ্যাগত ব্যক্তিগণের আদর অভ্যর্থনায় নিযুক্তা; কিন্তু কেহ কি অনুমান করিতে পারেন যে উপরোক্ত পতিব্রতা রমণীর মনে কোন রূপ আত্মাভিমান আছে। পত্নী কি মনে করিতেছেন যে এই সকল কার্য্য আমি করিতেছি, আর ইহার ফলভাগিনী আমি; কখনই না, কার্য্যকালে তাঁহার মনে এরূপ কোন ভাবই উদয় হয় না। স্ত্রী সর্ব্বদা পতির অনুগামিনী হইয়া কৃতার্থ হইতে চান; কেবল স্বামীতেই তিনি অনুরক্তা। এক্ষণে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানে ও জীবে যে সম্পর্ক, তাহা অতি মধুর এবং আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না বলিয়াই ফলাভিলাষী হই। পুত্র, স্নেহের প্রস্রবণ, দয়ার সাগর পিতার কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়া কি কিছু চাহিতে পারে? পতিব্রতা সাধ্বী রমণী তাঁহার অতি ভালবাসার হৃদয় দেবতার নিকট কি কিছু বিনিময় প্রার্থনা করেন? আহা! শ্রীগৌরাঙ্গদেব কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন,—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

শ্রীভগবান আমাদের অতি ভালবাসার বস্তু আর তাঁহারই কর্ম্ম আমরা এই সংসারে সাধন করিতেছি এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস-সম্পন্ন ভাবের অধিকারী হইতে পারিলে আমাদের আর কোন কামনা থাকিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

চিন্তামালা।

(প্রশ্নোত্তরমালা।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্র০। মহাশয়! আপনি গত বারে দীক্ষা ও শিক্ষার কথা বলিব বলিয়াছিলেন। অদ্য তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

উঃ। আসুন, অদ্য আমরা সেই কথার আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হই। পরমার্থ বড়ই গম্ভীর ও উপাদেয় সামগ্রী, তাহার যে অঙ্গ লইয়াই আলোচনা কর, লাভ আছে। আমি পূর্ব্বে যে বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছি, ভক্তের অন্তঃকরণে প্রথমতঃ সেই বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। তখন হৃদয় বড়ই মহৎ ও মধুর হয়। সে ভাব একবার যে অনুভব করিয়াছে, তাহা আর সে কখন ভুলিতে পারেনা। বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দীক্ষার ভাব উদয় হইয়া থাকে। উচ্চ ও মধুর বলিয়া যাহাকে ভালবাসা যায়, সহজেই প্রাণ তাহার সেবা করিতে চায়। কোন ভাবকে প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়া তাহাকে অনন্যভাবে রক্ষা করিব বলিয়া ব্রতী হওয়ার নাম সেই ভাবে দীক্ষা। দীক্ষা শব্দের অর্থ ব্রত ধারণ। বস্তুতঃ ব্রত বিশেষ ধারণের প্রথম সংস্কারকে দীক্ষা শব্দে অভিহিত করিতে পারা যায়। সকল দেশেই মনুষ্য আপন আপন স্বভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ব্রত ধারণ করে। চুরি ডাকাতি হইতে শ্রীকৃষ্ণ সেবা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যেরই সেবক আছে। যে যে কার্য্য প্রাণপণে করিয়া থাকে, তাহাকে সে কার্য্যে ব্রতী বা দীক্ষিত বলা যায়। উদয়পুরের মহারাণা স্বদেশ-বৎসল ছিলেন, স্বদেশকে ম্লেচ্ছ হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি অম্লান বদনে সকল ক্লেশই সহ্য করিয়াছিলেন। যাঁহারা রাজপুনাতার ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একথা জানেন। উদয়পুরের মহারাণাকে আমরা স্বদেশ রক্ষায় ব্রতী বলিতে পারি। "উদয়পুর

যবনের হস্তে যাইবে না”—ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সর্ব্বস্ব পণ। মহারাণা স্বদেশভক্তের অগ্রগণ্য। এইরূপে স্বভাবের বৈচিত্র্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভক্ত বা ব্রতধারী দেখিতে পাওয়া যায়। পরমার্থ পথের দীক্ষাও ঐ প্রকার। মহত্ত্বসেবী মহাত্মাগণের সঙ্গ করিয়া ও শ্রীভগবানের তত্ত্ব ও গুণ বর্ণনকারী উপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা মহত্ত্বে মহতী রুচি উপস্থিত হয়। রুচি উপস্থিত হইলে তৎসঙ্গে তাহার সেবা করিব বলিয়া একটী প্রতিজ্ঞারও উদয় হইয়া থাকে। এই প্রতিজ্ঞা গীতায় ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

দীক্ষার কথা আরও বিশেষ করিয়া বলিবার পূর্ব্বে আপনাকে একটী কথা বলিয়া রাখি। শাস্ত্রে এরূপ উক্তি আছে এবং অনেক সাধু মহান্ত ও হিন্দুগণ অদ্যাপি বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, যখন সৎ-ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং পাষণ্ড অথচ পরাক্রান্ত নৃপতিগণ কর্ত্তৃক ধার্ম্মিকগণ নিপীড়িত হইয়া থাকেন, তখন সৃষ্টি পালন ও সং-হার-কারী শ্রীশ্রীভগবান নৃসিংহ বামনও কৃষ্ণাদি রূপে লোক মধ্যে লোকের ন্যায় অথচ মহাশক্তিসম্পন্ন হইয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তখন তিনি কখন আচার্য্য, কখন রাজা, কখন মন্ত্রী, কখন বা সহকারী রূপে অতি সুশৃঙ্খলায় কার্য্য করিয়া থাকেন। আপামর সাধারণ লোকেও ভগবানের সেই শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পায়। তুমি আমি সদাই যাঁহার অনুসন্ধানে ব্যগ্র, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যদি সেই শ্রীশ্রীভগবান আমাদের নয়ন গোচর হইয়া, আমরা অনায়াসে যাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছিনা, তাহারই উপদেশ প্রদান করেন, তবে আমরা কত আনন্দিত হই! বড়ই আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। আর অদ্যাপি আমরা সেই আনন্দই উপভোগ করিতে পারি, যদি যোগ্য পাত্র হই। একথা আর এক সময় বলিব। এখন দেখুন, সেই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া আচার্য্য রূপে কি বলিয়াছেন। ভগবান পরমার্থ উপদেশ করিয়া বলিতেছেন,

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"

প্রণিপাত সেবা ও পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন দ্বারা সদ্‌গুরুর নিকট পরমার্থ জানিবে। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ জ্ঞান উপদেশ করিবেন"। পরমার্থ পথে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন; শ্রীশ্রীভগবান নিজ মুখে, বলিতেছেন। মনঃ কল্পিত ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে না, তাহা এক প্রকার নাস্তিকতা মাত্র। যাহা শাস্ত্র, সদ্‌যুক্তি ও সজ্জনগণের অসম্মত তাহা কখন ধর্ম্ম হইতে পারে না। যাঁহারা শ্রীশ্রীভগবান ও তাঁহার উপদেশের অনুবর্ত্তী তাঁহাদিগকেই সজ্জন বলা যায়। এইরূপ সজ্জনের নিকট যাইয়া ও তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়া যথাবিধি ভগবৎমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয়। শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইয়া প্রেমপিপাসু উচ্চহৃদয় ভক্তকে নিত্য প্রেম স্বরূপের নাম মন্ত্রাদি প্রদান করিয়া থাকেন। গৃহস্থ সদাচারী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নিকটেই দীক্ষিত হইবার ব্যবস্থা আছে। ভগবত্তত্ত্বে সুনিপুণ ব্যক্তিই গুরু-স্থানীয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্ ॥

ভাবার্থঃ— সর্ব্বতোভাবে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ও একান্ত শ্রেয়ঃ জানিবার জন্য গুরু-পাদ-পদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। যিনি বেদ ও ভগবৎ রসজ্ঞ অর্থাৎ পণ্ডিত ও সাধু তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিবে। শ্রীশ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদি গুরু। তিনি সৎ সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য স্ব শিষ্য কমলযোনি ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন,—

প্রবুদ্ধে জ্ঞানভক্তিভ্যামাত্মন্যানন্দচিন্ময়ী।
উদেত্যনুত্তমা ভক্তির্ভগবৎপ্রেমলক্ষণা ॥
প্রমাণৈস্তৎ সদাচারৈঃ সদাভ্যাসৈ র্নিরন্তরম্।
বোধয়ন্নাত্মনাত্মানং ভক্তিমপ্যুত্তমাং লভেৎ ॥

যস্যাঃ শ্রেয়স্করং নাস্তি যয়া নির্ব্বৃতিমাপ্নুয়াৎ।
যা সাধয়তি মামেব ভক্তিং তামেব সাধয়েৎ ॥ [ব্রহ্ম সং

ভাবার্থঃ—জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে ভগবৎ প্রেম রূপা ভক্তি দেবীর উদয় হইয়া থাকে। পরমার্থ নির্ণায়ক শাস্ত্রানুগত সজ্জনগণ যাহা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন নিরন্তর সেই প্রকার অভ্যাস করিলে আত্ম-তত্ত্ব স্বতঃ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। তখন ভগবৎ প্রেমের ও আবির্ভাব হয়। সেই "সা কস্মৈ পরম প্রেম-রূপা" ভক্তি অপেক্ষা প্রকৃত শ্রেয়স্কর আর নাই। তাহাতে সচ্চিদানন্দরূপিণী নির্ব্বৃতি লাভ হইয়া থাকে। পরমা শান্তির নাম নির্ব্বৃতি। আমি স্বয়ং সেই নির্ব্বৃতি স্বরূপ। যাহা আমাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ, সেই ভক্তি সাধনা কর। (ক্রমশঃ)

ভগবৎ-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জীবদেহ আপাততঃ একটী পৃথক পিণ্ড বলিয়া দৃষ্ট হইলেও তাহা বিশ্বব্যাপী বহির্জগৎ হইতে স্বতন্ত্র কিনা দেখিতে গিয়া দেখা গেল, যে তাহা পৃথক নহে; বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণ রূপে অনুস্যূত। প্রাণ বায়ু দেহের বাহিরে, তদ্ব্যতীত প্রাণ বায়ু সঞ্চালক উত্তাপও দেহের বাহিরে এবং যে ধরার উপর জীবের অধিষ্ঠান তাহাও দেহের বাহিরে। এই সকল গুলির একবারে অভাব হইলে কি হয় তাহার কথা দূরে থাকুক, উহাদের মধ্যে একটীর অভাব হইলেই জীব আর থাকিতে পারে না। তজ্জন্য জীবকে বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তদধীন জীবিত ভিন্ন অন্য ভাবে ভাবনা করা সম্পূর্ণ ভ্রম। আরও দেখা গিয়াছে যে পুরুষের অধীনত্ব নাই। তিনি নর-রূপধারী হইয়াও পূর্ণব্রহ্ম বা ঈশ্বর-পদ-বাচ্য। যিনি বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা তাঁহার পক্ষে কোন রূপ ধারণ করা বিচিত্র নহে, এবং ঐ রূপ ধারণ করায় ঈশ্বরত্বের কোন ব্যত্যয় হয় না। যে স্থলে দেহ ধারণ পূর্ব্বক লোকদিগকে শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা হয় নাই, সে স্থলে আকাশ

বাণী দ্বারা নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই আকাশ বাণীর কথা কেবল হিন্দু শাস্ত্রে আছে এরূপ নহে, তাহা অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে'ও দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের "মানুষী তনুর" সহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই রূপ সম্বন্ধ একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" ইত্যাদি শ্লোকটীর অর্থ বুঝিবার আর কোন বাধা থাকে না। তিনিই জলের কল্পনা করিয়া উহার উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং উহার রস প্রভৃতি গুণ সকলের বিধান করিয়া নিয়ন্তা স্বরূপে উহাকে সর্ব্বদা সেই সেই নিয়মাধীনে রক্ষা করিতেছেন। শশী সূর্য্যের প্রভা, নর-পৌরুষ ও প্রণব মন্ত্রও তাঁহারই কল্পনাসম্ভূত এবং তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত। আমরা কোন দ্রব্য করিয়াছি বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমরা প্রকৃত কর্ত্তৃপদ বাচ্য নহি। কারণ আমাদের কর্ত্তৃত্ব কেবল দ্রব্য সংযোজনা করা মাত্র। যোজনা দ্বারা যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে, তাহার উপর আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। এই জন্য আমাদের কার্য্য সম্বন্ধে আমরা নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু দ্রব্য যাঁহার তেজোঽংশসম্ভূত এবং যাঁহার দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষিত ও চালিত তিনিই তাহার প্রকৃত কর্ত্তা। যখন কোন ঘটনা-ব্যাপারে কোন দ্রব্য সংযোজনা আমাদের কর্ত্তৃক হইয়াছে ভাবি, তাহাও আমরা কতকগুলি বৃত্তির নিয়মাধীন হইয়া করি। এই সকল বৃত্তির প্রযোজক এক মাত্র ঈশ্বর এবং ঈশ্বর ভিন্ন কর্ত্তা আর কেহ নাই। সমস্ত কার্য্যই তাঁহা হইতে হয়। এখানে গীতা বলিতেছেন,—

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার আর একটী তাৎপর্য্য আছে। ঐ শ্লোকটীতে সাধন মার্গের আর একটী গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে পঞ্চভূতের উপাসনার বিধান আছে এবং ঐ উপাসনা হিন্দুদিগের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। যাঁহারা আহ্নিক সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া থাকেন, তাঁহা-

দের এ বিষয় আর অবিদিত নাই। এই উপাসনা হিন্দুদিগের অন্যান্য উপাসনা হইতে শ্রেষ্ঠ; কারণ ইহা নিষ্কাম ও মুক্তিপ্রদ। সকল দ্রব্যকে ভগবৎ সত্তায় লয় করাই ঐ উপাসনার উদ্দেশ্য এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার জন্যই বলিয়াছেন যে, জলে, অনলে, অনিলে, মন্ত্রে, তন্ত্রে, সর্ব্বত্রই তিনি এবং সকলই তাঁহার সত্তা। এই সাধন শিক্ষা দিবার জন্য বিষ্ণু স্বয়ং দ্রবীভূত হইয়া জলময়ী গঙ্গারূপ ধারণ করেন, ইহা তন্ত্রে প্রকাশ; আর সেজন্য আপঃ নারায়ণ বলিয়া খ্যাত; অগ্নি ব্রহ্মার রূপ এবং পবন শিবাংশসম্ভূত।

উপাসনা (উপ + আসন) অর্থাৎ উপ সন্নিকটে, আসন অধিষ্ঠান বা স্থান। ক্রমশঃ ঈশ্বরসন্নিধান লাভ করাই উপাসনার উদ্দেশ্য। ভজনা (ভজ্ + অন) ও ভক্তি (ভজ্ + তি) উভয়ই একধাতু নিষ্পন্ন, এবং সকল দ্রব্য ঈশ্বরের ভাগ বা অংশ এই জ্ঞান লাভ করাই ভজনার উদ্দেশ্য। এই জ্ঞান লাভ হইলে পর, জীব যে সম্পূর্ণ রূপ ঈশ্বরাধীন-জীবিত এই দৃঢ় বিশ্বাসের নাম ভক্তি। পরা ভক্তি জন্মিলে জীব একবারে ঈশ্বরের হইয়া যায়। যে বৃত্তিতে "আমি আমি" বলি সে ভাবের অধীশ্বর ঈশ্বর বলিয়া উপলব্ধি হয়। জীব তখন ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু না দেখিয়া "সোঽহম্" অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে অভেদ জ্ঞান করে। এরং অনন্ত কারণসাগরে বটপত্রশায়ী বিষ্ণুর ন্যায় ভাসিতে থাকেন। ঈশ্বর সকল ভাব ধারণ করেন বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম ভগবান। ভগ অর্থে ষড়ৈশ্বর্য্য যথা,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাম্ ভগ ইতি স্মৃতম্॥

আবার অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি অষ্টবিধা শক্তির নাম ঐশ্বর্য্য। এই সকল শক্তির আধার যিনি, তিনিই ভগবান। বস্তুর স্বরূপকে তাহার তত্ত্ব (তৎ + ত্ব) বা মূলকারণ বলে। ঐশ্বরিক শক্তিই দ্রব্যভেদের এক মাত্র কারণ ও সকল দ্রব্যের একমাত্র মূল কারণ বলিয়া তাহা তত্ত্পদবাচ্য। বহির্ম্মুখাবৃত্তিতে যখন জগৎ প্রকাশ পায়,

তাহা ঈশ্বরের সৎ বা ব্যক্ত ভাব। অন্তর্মুখাবৃত্তিতে যখন জগতের অনুভূতি সমস্ত অতি সূক্ষ্ম অনির্ব্বচনীয় ভাবে লীন হয়, তাহা ঈশ্বরের তৎ বা অব্যক্ত ভাব। ব্যক্ত অব্যক্ত ভাবের আধার প্রণব; তাহাতে আর কোন ভাবের অভাব নাই এবং তাহাই একমাত্র পরব্রহ্মবাচক। স্থূল কথা এই, জল ঐরূপ হইয়াছে কেন? জিজ্ঞাস্য হইলে হিন্দুশাস্ত্র মতে তাহার উত্তর—ভগবৎ শক্তি ও ইচ্ছা। মৃত্তিকা ঐরূপ হইয়াছে কেন? তাহারও উত্তর—ভগবৎ শক্তি ও ইচ্ছা। বায়ুতে প্রাণ রক্ষিত হয় কেন? তাহারও উত্তর—ভগবৎ শক্তি ও ইচ্ছা। এতদতিরিক্ত হিন্দু শাস্ত্র আর বেশী শিক্ষা দিবার শক্তির গর্ব্ব করেন না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরও শিক্ষা ঐরূপ। তাহাতে কোন বিষয় কি প্রণালীতে অর্থাৎ কাহার পর কোন অবস্থা ঘটে তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু কেন যে ঐরূপ হয় তাহা স্থির করিতে পারেন নাই, এবং কারণ নির্দ্দেশ করাও মানবের ক্ষমতাতিরিক্ত বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেন। আমরা ঘটনাক্রম দেখিয়া ও তদনুসারে দুই একটী কার্য্যে ঈশ্বরেচ্ছায় সফলতা লাভ করিয়া অনেক সময় আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান মনে করি, এবং সেই মদে মত্ত হইয়া মূল ভগবৎ তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া থাকি। তাহা না করিয়া যখন জলপান দ্বারা উৎকট তৃষ্ণা নিবারণ করি, তখন যেন ভাবিতে পারি—"রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই জলের রস হইয়া আমার তৃষ্ণা দূর করিতেছেন। যখন রাত্রে মৃতপ্রায় থাকিয়া অরুণোদয়ে পুনরুত্থিত হই ও জগৎ দর্শন করি, তখন যেন ভাবি—"প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার নেত্রপথ পরিষ্কার করিয়া জগৎ দেখাইতেছেন। যখন কৌমুদীকান্ত দর্শনে নেত্র ও মন প্রফুল্লিত হয়, তখন যেন আবার ভাবি—"প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ" অর্থাৎ তিনি আনন্দময়রূপে অমৃত বর্ষণ করিতেছেন। যখন গুরুমুখনিঃসৃত ঈশ্বর-স্তুতি, এবং গীতা গায়ত্রী প্রভৃতির পাঠধ্বনি শ্রবণ করি, তখন যেন ভাবি—"শব্দঃ খে" অর্থাৎ আকাশে শব্দরূপে সেই শ্রীকৃষ্ণই বংশী

খাদন করিতেছেন। যখন আসন প্রাণায়াম, ধ্যান ধারণাদি সাধন উপযোগী কোন কার্য্য করি, তখন যেন ভাবি — সেই শ্রীকৃষ্ণই "পৌরুষং নৃষু" অর্থাৎ পুরুষরূপে অন্তর্যামীই সমস্ত কার্য্য করিতে-ছেন। অহরহঃ এইরূপে ভগবৎ-সত্তা উপলব্ধি হইতে থাকিলে তখন নিম্নের শ্লোকে যে যোগ ক্ষেমের কথা আছে বোধহয় তাহার ভাব আসিতে পারে —

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

হ রি দ য়া ম য়।

রে অবোধ মন! বলি কথা শোন,—
শ্রীহরিরে কেন দূষ অকারণ?—
প্রভু যে আমার, কৃপা পারাবার,
সর্ব্বজীবে তাঁর দয়ার সঞ্চার,
হৃদয়ে বসাই' পালেন সদাই,
প্রজা হিত বই আন কাম নাই।
তু' বড় পামর, কৃতঘ্ন অন্তর!
তাই নিরন্তর শত উপকার
পাইয়াও তবু বলিলি না কভু
হরি দয়াময় করুণা-আলয়।

ওই দেখ মন! দেবারাধ্য ধন
গোলোক ত্যজিল ভবেতে আসিল,
ধরিল মাধুর্য্য ছাড়িয়া ঐশ্বর্য্য;
আপনি আচরি' জীবে দয়া করি'
আসি' কতবার শিখান আচার,
যে পথে যাইলে থাকিবে কুশলে
প্রভু দয়া ক'রে দেখা'ল জীবেরে;
দুষ্ট মন আমার! তবু বার বার
বল নিরদয় মঙ্গল আলয়!

সুপথে না যা'বি কথা না শুনিবি,
কুপথে চলিবি যাতনা পাইবি,
আপন দোষেতে মরিবি দুখেতে,
প্রভু ভগবান দোষী কি কারণ?
রে অবোধ মন! সুখেতে যখন
থাকয়ে মগন, বলনা তখন
হরি দয়াময় মঙ্গল-আলয়;
ভাবনা বারেক আনন্দ এতেক
শ্রীহরি কৃপায় হইল উদয়।
তবে কি লাগিয়া দুখেতে পড়িয়া
দূষ ভগবানে মজিয়া অজ্ঞানে?
দুখে মগ্ন হও তাঁরে দোষ দাও,
সুখে ভেসে যাও গুণ নাহি গাও;—
বড় অবিচার মনরে আমার!
ধিক্ স্বার্থপর কৃতঘ্ন অন্তর!

সুখে ভুলে রও! দুখে দোষ দাও!!
দয়াময় তবু ভুলিবেনা কভু;—
সুখেতে দুখেতে রাখিয়া বুকেতে
পালিছেন হরি দীন দুঃখহারী।

মরি কি করুণা! দেখনা দেখনা!
কুপথে যাইলি কাঁটা ফুটাইলি
সে কাঁটা তুলিতে সকরুণ চিতে
করি'ছে যতন জগত জীবন,
(এ দুখ বেদন তাহারি কারণ)।
যে দুখ সহিছ যে জ্বালা পাইছ,
ও সকল মন সুখেরি কারণ।
দু'দিনের তরে শ্রীহরির ক্রোড়ে
বস' স্থির হ'য়ে নয়ন মুদিয়ে,
কাঁটাটি উঠিবে যাতনা যাইবে,
আনন্দ পাইবে প্রেমেতে ডুবিবে;—
অথির হইবে যাতনা বাড়িবে,
যতই নড়িবে কাঁটা বিঁধে যা'বে।—
তোমার দুখেতে ব্যথিত প্রাণেতে
আপনি যে জন করিছে যতন,
কোন প্রাণ ল'য়ে হেন দয়াময়ে
বল নিরদয় পাষাণ হৃদয়?

মনরে আমার! যুড়ি দুটী কর
বড়ই কাতরে যাচিতেছি তোরে—
সদা প্রাণ ভোরে বল উচ্চ স্বরে
হরি দয়াময় মঙ্গল-আলয়॥
বল' বল' মন সদা সর্ব্বক্ষণ,
প্রভু ভগবান করুণা-নিদান।
সুখে বল হরি, দুঃখে বল হরি,
সম্পদে শ্রীহরি, বিপদে কাণ্ডারি,
হরি হরি হরি, বল প্রাণ ভরি'
হরি দয়াময় মঙ্গল-আলয়।
সদা কর গান শ্রীহরির নাম,
শুনিয়া সে তান জুড়াক পরাণ;
বল—জয় জয়, শ্রীহরির জয়,
জয় দয়াময় করুণা-আলয়।
পতিত পাবন, অনাথ শরণ,
বল, জয় জয় হরি প্রেমময়,
হরি দয়াময় মঙ্গল-আলয়।

—*—

ভক্ত সাধনা।

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

করুণাসিন্ধু শ্রীভগবান দুর্ব্বল জীবের জন্য সুখ-সাধ্য শ্রীনাম প্রচার করিয়াছেন। নাম অন্ধের যষ্টি, তাই নাম গ্রহণ করিবামাত্র ভগবানের সন্নিকর্ষ লাভ হয়, দয়াময় ছুটিয়া আসিয়া শ্রীহস্ত বাড়াইয়া অন্ধকে ধরিয়া লন। নাম সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন দুর্ব্বল নিশ্চেষ্ট জীবের ভেলা স্বরূপ, নাম আশ্রয় করিলেই শ্রীভগবান চরণ দিয়া জীবকে উত্তীর্ণ করিয়া লন। নামের অসীম ক্ষমতা, অথবা শ্রীভগবানের অপার করুণা! তাই দয়াময় বলিতেছেন "আমার ভক্ত

যেখানে নাম সংকীর্ত্তন করে সেই স্থানেই আমার নিত্য অধিষ্ঠান ”। ভক্ত—ভগবন্নামানুরাগী প্রিয় ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রেমের বস্তু। ভগবান তাঁহাকে বড়ই ভালবাসেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইলে প্রেমময় বড়ই ব্যথা পান। ভক্ত যে অবস্থায় থাকুন — ভগবানকে তিনি যেখানে যেভাবে রাখুন, তাহাতেই তাঁহার প্রীতি। ভক্ত যে সংসারে আসিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে করিতে পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের জন্য একাজ সেকাজ করিতে করিতেও “জয় হরি শ্রীহরি ” বলিয়া থাকেন, ভগবান ভক্তমুখে এই নাম শুনিতে বড় ভালবাসেন, তাই দয়াময় ভক্তছাড়া থাকিতে পারেন না।

ভক্ত সধনা কসাই বংশ জাত। মাংস বিক্রয়ই তাঁহার জীবিকা। কিন্তু তিনি স্বভাবতই ভগবন্নিষ্ঠ ও দয়াপ্রবণ ছিলেন। তিনি স্বহস্তে হিংসা করিতে পারিতেন না, মাংস কিনিয়া আনিয়া পথের ধারে বসিয়া বিক্রয় করিতেন; এবং দিবা নিশি হরিগুণ গান করিতেন ও সাধু ভক্ত দেখিলেই সেবা লইতেন।

একদা কোন বৈষ্ণব সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। সধনার মুখে হরিনাম শুনিয়া নিকটে আসিলেন। বৈষ্ণব দেখিলেন সধনার বাটকারার সহিত এক খণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে। এই প্রস্তর খণ্ডটী কি সধনা তাহা জানেন না, তবে তাঁহার এইমাত্র ধারণা ছিল যে, এটী সামান্য প্রস্তর নয়, কারণ তুলাদণ্ডের একদিকে এই প্রস্তরটী রাখিয়া অন্যদিকে যাহা দিতেন তাহাতেই “পাষাণ” ঠিক হইত। যাহাহউক বৈষ্ণব দেখিবামাত্র চিনিয়াছেন; বিগ্রহসেবানুরাগী ভক্ত শালগ্রাম এই অবস্থায় রহিয়াছেন দেখিয়া ব্যথিত হইলেন এবং পথ হইতে এক খণ্ড প্রস্তর গ্রহণ করিয়া বিনয়নম্র বচনে সধনার নিকট সেই শালগ্রামটী বিনিময় চাহিলেন। বৈষ্ণবের বিনয় দেখিয়া সধনা লজ্জিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, প্রভো! দুই খানিই প্রস্তর খণ্ড, বিনিময়ের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এই

পাথরখানি আমার বিশেষউপকারে আইসে” এই বলিয়া প্রস্তরখণ্ডের গুণ কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব শুনিলেন না, শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছে, তিনি পুনরায় ঐ পাষাণখণ্ড ভিক্ষা চাহিলেন। তখন অগত্যা বৈষ্ণবের প্রীতির জন্য সধনা সেটী তাঁহাকে দিলেন।

বৈষ্ণব আনন্দের সহিত ঐ শালগ্রাম শীলাটী বাটী লইয়া গেলেন, এবং অভিষেক করত তাঁহার যথারীতি সেবা করিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের লীলা অতি গুহ্য ও অগম্য! আজ ভগবান বৈষ্ণবের বাটী তুলসী চন্দন চর্চ্চিত হইয়া, যথাযোগ্য সেবা পাইয়াও সধনাকে ভুলিতে পারিলেন না, তাঁহার সেই সরল ব্যবহার ও অকপট হৃদয়ের হরি গুণানুবাদ তাঁহার প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছে। দয়াময় বৈষ্ণবকে স্বপ্নযোগে বলিলেন “আমাকে সধনার কাছে রাখিয়া আইস, তাহার গান শুনিতে আমি বড় ভালবাসি”। বৈষ্ণব তাহাই করিলেন। প্রাতে উঠিয়া বৈষ্ণব শালগ্রাম লইয়া সধনার বাটীতে গেলেন এবং তাহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন “সধনা আমি তোমাকে বঞ্চনা করিয়া এই প্রস্তর লইয়া গিয়াছিলাম, ইহা সামান্য প্রস্তর নয়, ইনি শালগ্রামরূপী নারায়ণ। ভগবান তোমার প্রতি বড়ই প্রসন্ন! তুমি ধন্য! তোমার মুখে হরিগুণগান শুনিবার জন্য দয়াময় তোমার নিকট আসিয়াছেন। তুমি বড় ভাগ্যবান! এইরূপ বলিয়া বৈষ্ণব প্রস্থান করিলেন। সধনার প্রাণ টলিল; সেই দিবস হইতে সধনা এই কুৎসিত ব্যবসা ছাড়িয়া নারায়ণকে লইয়া কোনও নিভৃত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন; এবং ভিক্ষা করিয়া নারায়ণের সেবায় ব্যাপৃত হইলেন।

কিছু দিন পরে সধনার প্রাণে বড় সাধ হইল একবার পুরুষোত্তমে গিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিরা আসেন। গ্রামের অন্যান্য লোকও সেই সময় জগন্নাথদর্শনের জন্য বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহারা সধনাকে কিছু তণ্ডুল কিছু দাল ইত্যাদি দিতেন, সধনা তাহাতে নারায়ণের ভোগ দিয়া আপনি প্রসাদ পাইতেন। সধনাকে তাঁহারা

ঘৃণা করিয়া ছুইতেন না। কতকদূর গিয়া প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে ছাড়া ইয়া চলিয়া যওয়ায় সধনা ভিক্ষার্থে গ্রামে বাহির হইলেন।

ভগবানের কি লীলা! চক্রপাণির কি চক্র! আজ মায়াচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া কতলোক কতদিকে ছুটিতেছে কত লোক কত কাজ করিতেছে তাহার সীমা নাই! কিন্তু ভক্তের ভয় নাই, ভগবৎ চরণাশ্রিত ব্যক্তি কখনও ঘুরিয়া বেড়ান না। যে ঝঞ্কাটই আসুক, যে পরীক্ষার মধ্যেই নিপতিত হউন, ভক্ত কখনও ভগবচ্চরণ হইতে দূরে গমন করেন না। তিনি কখনও মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হন না। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

বাস্তবিক ভক্তের কোনও ভয় নাই। তবে ভক্তের পরীক্ষা কেন? ভক্তের কাছে মায়া আসে কেন? মায়া জানে, ভক্তের নিকট তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। তবুও সে আসে তাহার কারণ ভগবানের মায়া ভগবদ্ভক্তের মহিমা বাড়াইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া থাকে। "মুগ্ধ জীব! ভক্ত তোমার শ্রেণীর নহেন! ভক্ত সামান্য মানুষ নন!—তুমি মায়ার ছায়ামাত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাও, কিন্তু ভক্ত অসামান্য রূপরাশি প্রত্যক্ষ করিয়াও গ্রাহ্য করেন না।" যেন এই কথা সদর্পে বলিবার জন্যই মায়া ভক্তের নিকট আসিয়া থাকে। ভগবান ভক্তের গৌরব দেখাইতে ভালবাসেন, তাই আজ সমাজে অতি ঘৃণিত কসাই সধনাকে বিষম পরীক্ষায় ফেলিবার উদ্যোগ করিলেন।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া সধনা নিকটস্থ কোনও এক বাটীতে গিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। সধনা ভগবানের জিনিষ, কসাই হইলেও তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী, সুতরাং অতি সুন্দর। সধনা ভিক্ষা চাহিবামাত্র একটী যুবতী বাহিরে আসিল এবং সধনার যথোচিত সমাদর করিয়া বলিলেন "আসুন ভিক্ষা লউন"। সরল হৃদয় সধনা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতরে গমন করিলেন। রমণী তাঁহাকে একটী ঘরের

মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নানারূপ ভাব ভঙ্গী করিতে লাগিল। সধনা নাম জপ করিতেছেন, তাঁহার অন্য দিকে দৃষ্টি নাই। রমণী অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না, অবশেষে আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া পাপীয়সী নির্লজ্জভাবে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। সধনার মন টলিল না। কেনইবা টলিবে? যিনি একবার ভগবৎসঙ্গসুখ অনুভব করিয়াছেন, নাম সুধাপানে যাঁহার মন একবার মাতোয়ারা হইয়াছে, তুচ্ছ বিষয়সুখ, সামান্য ইন্দ্রিয়সুখ তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিবে কিরূপে? সধনা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। রমণী হিতাহিত জ্ঞান একেবারে হারাইয়াছে, দুষ্ট রিপুগণের প্রলোভনে পড়িয়া সর্ব্বনাশী আজ আপনার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ক্ষণিক ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য আজ মুগ্ধা নিজের সুখ শান্তি চির দিনের তরে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। অহো! বিষয়ের কি প্রলোভন! কামাদি রিপুগণের কি অসীম পরাক্রম! আজ দেবী রাক্ষসীর ভাব ধারণ করিয়াছে। পাপিষ্ঠা আপনার ধর্ম্মকর্ম্ম খাইয়াও নিবৃত্ত নহে, ভক্তের যথাসর্ব্বস্ব খাইবার জন্যও মুখব্যাদন করিয়া আসিতেছে। সধনার এরূপ উদাসীন ভাব দেখিয়াও দুষ্টা নিবৃত্ত হইল না। রমণী বলিল, “কি ভাবিতেছ? আমি প্রকৃতই তোমার, এই ঘরবাড়ী সকলই তোমার তুমি আমাকে গ্রহণ কর।” সধনা স্পন্দহীন অবনত-মস্তক। তখন সে পাপিষ্ঠা বাহিরে গেল এবং গৃহান্তরে নিদ্রিত স্বামীর মস্তক কাটিয়া আনিয়া বলিল, এই দেখ তোমার শঙ্কা দূর করিয়াছি, এইবার নিশঙ্ক চিত্তে আমাকে গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া দুষ্টা সধনার সম্মুখে গেল। কিন্তু সধনার বাহ্যজ্ঞান নাই, তাঁহার নিমীলিত চক্ষু দিয়া ধারা বহিতেছে অধর থর থর কাঁপিতেছে। যখন সেই পাপিষ্ঠা দেখিল সধনা হইতে তাহার দুরভিসন্ধি পূর্ণ হইল না, তখন মায়াবিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল “এই দুষ্ট ভিক্ষার ছলে আসিয়া দুরভিসন্ধিক্রমে আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়াছে”।

তখন প্রতিবেশিগণ গোলমাল শুনিয়া ছুটিয়া আসিল, এবং রমণীর ক্রন্দন দেখিয়া সধনাকে অপরাধী জ্ঞানে রাজদ্বারে প্রেরণ করিল। সধনা নির্ভীক নিশ্চিন্ত, আজ দুষ্টের কুচক্রে তাঁহার কি দশা ঘটিবে সে চিন্তা আদৌ নাই, পূর্ব্ববৎ প্রফুল্লচিত্তে নাম গ্রহণ করিতেছেন। সেই দুষ্টা মায়াকান্না করিয়া সধনার উপর দোষারোপ করতঃ কাতরস্বরে বিচার প্রার্থনা করিল। সধনার সেই সাম্য মুর্ত্তি দেখিয়া বিচারপতি সন্ধিগ্ধহৃদয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি। ভক্তের হৃদয় দয়াপূর্ণ, রমণীর দুর্দ্দশার কথা অনুমান করিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল, মুগ্ধা মোহবশে পতির সর্ব্বনাশ করিয়াছে এখনই জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে, ভক্ত তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিয়াও অন্যের প্রাণ রক্ষা করিবেন। এইরূপ সংকল্প করিয়া সধনা বলিলেন "হাঁ! আমিই উহার স্বামীকে মারিয়াছি"। অগত্যা বিচারপতি তাঁহাকে শূলে দিবার আজ্ঞা করিলেন। জানি না ভগবানের এ কি খেলা! চক্রপাণির এ কি চক্র! আজ ভগবৎসেবাপরায়ণ ভগবন্নিষ্ঠ বিনা অপরাধে শূলে যাইবার দণ্ড পাইলেন।

যাহা হউক, পাপেরই জয় হইল। কিন্তু শান্তি কোথা? পাপিষ্ঠা অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে লাগিল। আর থাকিতে পারিল না। বাড়ী গিয়া সকলকে বলিয়া ফেলিল, সে স্বহস্তে তাহার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে ক্রমে এই কথা বিচারপতির কাণে উঠিল। তখন তাঁহারা সধনাকে প্রসন্ন করিয়া বিদায় দিলেন। পরিণামে ধর্ম্মেরই জয় হইল। ভক্ত নামমাহাত্ম্য জগতে প্রকাশ করিয়া ভগবদ্দর্শনোদ্দেশে পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন।

সধনার আনন্দের সীমা নাই। তিনি শ্রীহরির গুণগান করত নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছেন। এইরূপে যখন কটকে আসিয়া উপস্থিত, তখন দেখেন শ্রীশ্রীজগনাথদেবের কয়েক জন সেবক পথে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সধনা আনন্দে অধীর, জয় শ্রীহরি! জয় জগন্নাথ!

বলিয়া পথে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সেবকগণ তাঁহাকে প্রেমের সহিত কোলে লইয়া পরিচর্য্যা দ্বারা সুস্থ করিলেন। আজ পতিত পাবন শ্রীহরির নামগুণে অস্পৃশ্য কসাই জগন্নাথসেবকগণের সঙ্গ লাভ করিলেন। যিনি কসাই বলিয়া প্রতিবাসিগণ ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিয়া আগে চলিয়া আসিয়াছেন, আজ জগনাথসেবকগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া লইলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আদেশে সধনাকে লইবার জন্যই তাঁহারা এখানে উপস্থিত। প্রভুই তাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন। ভক্ত যেমন ভগবানকে দেখিবার জন্য অধীর, ভগবানও ভক্তকে দেখা দিবার জন্য লালায়িত। ভক্তমুখে শুনিয়াছি প্রভুকে কণামাত্র প্রাণদিলে প্রভু আপনার যথাসর্ব্বস্ব ভক্তকে দিয়া থাকেন। প্রভু দয়াময়! ভক্তবৎসল! পাণ্ডাগণ পাল্কীকরিয়া সধনাকে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। ভক্ত ও ভগবান উভয়েরই আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সকলে হরি হরি বোল! বলিয়া উঠিল।

ঝিঁঝিট—একতালা।

ওহে দয়াময়! দাওহে আশ্রয় এ দীন দাসেরে ও রাঙা চরণে।
দিবস শর্ব্বরী যেন হরি, হরি! তোমার সুমধুর নামামৃত পানে॥
তব প্রেমে যেন ম'জে থাকি হরি! অহরহঃ তব গুণগান করি,
যেন বলি' হরি দেহ পরিহরি এই ক'র' হরি! আমার হে নিদানে॥
তুমি বিনা হরি! এ পাতকী জনার কেহ নাহি আর করিতে উদ্ধার,
যেন দয়াময়! হ'যোনা নিদয়, অসময়ে আমায় কৃপা বিতরণে॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তি ভক্ত্যাঃ পরং পদম্॥

শ্রীগৌরাঙ্গ।

আইল গৌরাঙ্গ প্রেমের তরঙ্গ
উঠিল এ জগ মাঝে।
দুকূল ভাসিল যত লোক ছিল
ভাসিল তাহার মাঝে।
পুণ্য কি পাতকী দ্বিজ কি চণ্ডাল
সকলেই এক হ'ল।
হরি হরি ব'লে প্রেমের পাথারে
সকলে সাঁতার দিল॥
কলসী পুরিয়া প্রেম সুধা ল'য়ে
আনন্দে নিতাই যায়।
যাহারে নেহারে দন্তে তৃণ ধ'রে
বলে প্রেম লহ ভাই॥
দুষ্টের প্রহারে রক্ত-ধারা বহে
তবু আনন্দেতে বলে।
মারিলি রে ভাই করিলিত ভাল
নেচে আয় হরি ব'লে॥
দয়াল দুভাই গৌর নিতাই
সদাই নয়নে ধারা।
জীবের দুঃখেতে বুক ফেটে যায়
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা॥

এতই করিল জীবের লাগিয়া
তবুত অধম নর।
হরি না ভজিল প্রেমে না ডুবিল
মোহেতে র'ল বিভোর॥
শেষে প্রভু মোর শ্রীগৌর সুন্দর
কাঁদায়ে আপন জনে।
কাঙালের বেশে ভ্রমি দেশে দেশে
প্রেম দেন জনে জনে॥
এমন দয়াল শ্রীগৌর আমার
দুঃখ দেয় জীব তাঁয়।
হরি ব'লে ভাস প্রেমের পাথারে
হাসিবেন গোরা রায়।

ক র্ম্ম যো গ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই কর্ম্মযোগে নিষ্কাম ভাবের অনুশীলন সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা প্রসঙ্গ বিরুদ্ধ হইবে না। কেননা, কর্ম্মযোগের একমাত্র লক্ষ্য শ্রীভগবানের সহিত জীবের মিলন। কিন্তু সকামভাব-প্রসূত কর্ম্ম এই সংসারে আমাদিগের বন্ধনস্বরূপ হয় এবং সংসারাবদ্ধ জীব সেই প্রেমময় আনন্দঘন ভগবান হইতে অনেক দূরে অবস্থান করে। সুতরাং সকাম কর্ম্ম অতীব নিন্দনীয়। আরও শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

অর্থাৎ ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে একান্ত আসক্ত চিত্ত সুতরাং তদাকৃষ্ট চিত্ত ঐ সকল ব্যক্তিগণের সমাধি (পরমেশ্বরাভিমুখী চিত্তের একাগ্রতা) সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বের আর একটি

শ্লোকে ভগবান কাম্য কর্ম্ম-বিষয়ক বুদ্ধি হইতে নিষ্কাম কর্ম্ম-বিষয়ক বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন,—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

ভাবার্থঃ—ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিই আমাকে এই দুস্তর সংসারসাগর উত্তীর্ণ করিবে, এইরূপ যে বুদ্ধি, তাহা এক অর্থাৎ এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিষ্ঠা হয়। কিন্তু তদ্বিপরীত অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কর্ম্মফলের নানা প্রকার ভেদ হেতু বহু শাখা-বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ চঞ্চল ভাবাপন্ন হইয়া বহু দিকে ধাবিত হয়। স্থূল কথা, কাম্য কর্ম্ম বিষয়ক বুদ্ধি কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, কিন্তু এই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করাই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য। এবং কাম্য কর্ম্মবীজ যত দিবস পর্য্যন্ত আমাদিগের মন হইতে সমূলে উৎপাটিত করা না যায় তত কাল আমরা শ্রীভগবানের প্রিয় বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীহরি বলিতেছেন,—

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

বস্তুতই শ্রীভগবানের যিনি অতীব প্রিয় এবং তিনি যাহার প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর সেই হৃদয়-দেবতার সহিত "দেনা পাওনা" সম্বন্ধ এক প্রকার অসম্ভব এবং ইহা বড়ই অরসিকতার নিদর্শন। সাংসারিক দৃষ্টান্তেও ইহা আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। প্রিয়জন প্রিয়জনের প্রিয় কামনার বশবর্ত্তী হইয়া যদি কোন কার্য্য সম্পাদন করেন, তবে উভয়ের মধ্যে প্রীতি বিনিময় ব্যতীত আর কিছুরই সম্ভাবনা হয় না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অতলস্পর্শী গভীর প্রেমসিন্ধু হইতে কিরূপ ভাবতরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল গত সংখ্যার পত্রিকায় আমরা তাহার একটী উচ্ছ্বাস পাইয়াছি। প্রভু বলিতেছেন "আমি সর্ব্বদা তাঁহার চরণানুগত, তিনি আমাকে (আদর পূর্ব্বক) আলিঙ্গন করুন কিম্বা (অশ্রদ্ধা করিয়া) নিষ্পেষিতই করুন বা আমাকে

দর্শন না দিয়া মর্ম্মপীড়া দেন, সেই লম্পট যাহাই করুন না কেন, তিনিই আমার প্রাণনাথ আর কেহ নহেন।" সুতরাং যে ভগবানের সহিত আমাদের এইরূপ মধুর সম্পর্ক তাঁহার সহিত আমাদের ব্যবহার স্বার্থপ্রেরিত হইলে বড়ই পরিতাপের কথা। আমরাত কত সময়ে মোহবশতঃ শ্রীভগবানকে স্বার্থপরতার ভাব দেখাইয়া তাঁহার কোমল প্রাণে বেদনা দিতে কুণ্ঠিত হই না। যিনি না চাহিতেও ক্ষুধার সময় অন্ন দিতেছেন, পিপাসায় সুশীতল বারি দানে আমাদিগের তৃষ্ণা দূর করিতেছেন, যে বায়ু ব্যতীত আমরা একদণ্ড জীবন ধারণ করিতে পারি না, অহরহঃ যিনি সেই প্রাণরূপী বায়ু আমাদিগের নাসিকাদ্বারে সঞ্চালন করিতেছেন সেই দয়াময়কে আমাদের কি ভাবে সন্দর্শন করা উচিত তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হয়। যিনি অন্ধকারপূর্ণ মাতৃগর্ভে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে আমাদের নিমিত্ত মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করেন, যাঁহার কৃপায় আমরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া জগতের কত শত অভিনব বস্তু দর্শনে প্রফুল্লিত চিত্ত হই, কর্ণদ্বারা সুললিত মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হই, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কত সুখের আস্বাদন করি, যিনি আমাদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, পক্ষিদিগের কণ্ঠে সুমধুর স্বর সংযোজনা করিয়া আমাদের কর্ণের তৃপ্তি বিধান করেন, মুকুলিত প্রসূনে মধুর সৌরভের সঞ্চারণ দ্বারা আমাদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তুষ্টি সম্পাদন করেন সেই দয়াময়ের নিকট আমাদের আবার প্রার্থনীয় কি? কই, আমরা তাঁহার এই সকল উপকারের নিমিত্ত কি বিনিময় প্রদান করিতেছি? ক্ষুধার সময় আহার করিতে করিতে একবার কি তাঁহার অসীম দয়ার কথা চিন্তা করতঃ তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্যবাদ প্রদান করি, পিপাসায় জল পান করিতে করিতে একবার কি দয়াময়ের করুণার কথা ভাবি, বিহগের কলকণ্ঠ নিঃসৃত সুমধুর কূজন শ্রবণ করিয়া সেই প্রেমময়

পরমপিতার মহিমা একবার কি ধ্যান করি, বিস্তৃত শ্যামল নবদূর্ব্বা-দলাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে ভ্রমণ কালে সুবিমল স্নিগ্ধ প্রাতঃ সমীরণ সেবন করিতে করিতে কি প্রাণময় ভগবানের স্মরণে প্রাণ মন পুলকিত হইয়া উঠে? পাঠকবর্গ! সেই শুভদিন আমাদের প্রার্থনীয়, যে দিন শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশটি পালন করিতে সমর্থ হইব,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যৎ জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

আরও একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান বলিতেছেন,—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥

পাঠকবর্গ! যে সকল মহাত্মা ভগবানের এই অমৃতময় উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন তাঁহারা কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে নির্লিপ্ত। কর্ম্ম ত আমাদিগকে করিতেই হইবে, কিন্তু ভাববিবর্হিত, অভিমানপ্রসূত কর্ম্মই আমাদের দুঃখের হেতু। এবং এই নিমিত্তই আজ শ্রীভগবানের সংসার আনন্দময় হইয়াও নিরানন্দে পূর্ণ। আজ লীলাময়ের লীলার নিত্য সহচরগণ লীলার ভাবে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে কতই আক্ষেপ করিতেছেন। কেহ শ্রীভগবানের বিরুদ্ধে অনুযোগ পূর্ব্বক কহিতেছেন "বিধাত! তুমি আমার অদৃষ্টে সুখ লিখ নাই"। কেহ কুশল প্রশ্নকারী বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"ভাই! এই সংসার লইয়া কি যে বিপদের, কি যে চিন্তার মধ্যে আছি তাহা ব্যক্ত করিবার নহে"। হায়! আজ কেন সংসারে এত অনুযোগ, এত মর্ম্মোচ্ছ্বাস! ইহার কারণ, আমাদিগের আত্মাভিমান এবং কামনা। আত্মাভিমান আমাদিগের চিত্তকে সঙ্কীর্ণতার ভিতর আবদ্ধ করিয়া নিষ্পেষণ-দ্বারা

ক্রমে তাহাকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিতেছে। এই ভীষণ শত্রু স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারের আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া প্রেমময় ভগবান হইতে আমাদিগকে অতি দূরে নিক্ষেপ করত আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। আর কামনা, অসীম বিস্তৃত উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে মরীচিকা সদৃশ ভ্রান্ত পথিককে অনন্ত পথ ছুটাছুটী করাইয়াও বিশ্রাম দিতেছে না। এদিকে বিশাল তৃষ্ণা হতভাগ্য জীবের প্রাণ কণ্ঠাগত করিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, অতীব ক্লান্ত, পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও সে বুঝিতেছে না। হায়রে মানব! এরূপ দশা তোর কে করিল! কোথায় তোমার বিবেক! কোথায় তোমার বুদ্ধি শক্তি! কে তোমার এ সকল এক কালে হরণ করিল? তুমি আবার অগ্নিপতনোম্মুখ পতঙ্গকে বিদ্রূপ করিতেছ কি! একবার ভাবিয়া দেখ, তোমার অবস্থা তাহারই অনুরূপ। তোমার মানব-বুদ্ধি পতঙ্গ বুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে পারে না। কিংবা তোমার বুদ্ধি তাহার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, কেননা, সে তোমাকে শিক্ষা দিতেছে, আর তুমি তাহাকে অবজ্ঞার সহিত উপহাস করিতেছ। তাই বলি, ধিক্ তোমার বুদ্ধিকে, শতধিক্ তোমার অহঙ্কারকে! আমরা কামনানলে পতিত হইয়া দগ্ধপ্রায়, তবুও শিক্ষা পাইনা, তবুও পুনরায় সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য প্রায় হইয়া ঝম্প দিতে ব্যগ্র। মানব হইয়া এত মূর্খতা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, ইহা অপেক্ষা পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধীভূত হইয়া যাই না কেন? অথবা পতঙ্গ হইয়া আবার মানবের শিক্ষাস্থল হওয়াতেও কৃতার্থতা আছে।

পাঠকবর্গ, আমরা এই দুর্জ্জয় কামনার দাস হইয়া তুচ্ছ বিষয় ভোগে লালায়িত। শ্রীভগবানের কৃপায় আমরা যে বিবেক লাভ করিয়াছি তাহা কামনার পীড়নে আজ অতীব দুর্ব্বল,—আজ ভীম-পরাক্রম সিংহ শৃগালকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, সমৃদ্ধ রাজ্যের অধিপতি হইয়াও অনাহারী বৃক্ষতলাশ্রয়ী ভিখারী। চিত্তভূমি শশ্মানক্ষেত্রে পরিণত — অনন্ত

কামনা অনন্ত চিতানল সদৃশ ধূ ধূ প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহা ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে। দয়াময়! এ ভীষণ দৃশ্য যে আর দেখিতে পারি না, কিন্তু পলাইব কোথায়, হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া আর আশ্রয় কোথায়? হায়! যাহায় হৃদয় কলুষিত, অপবিত্রতায় পূর্ণ তাহার শান্তিভোগ আকাশ-কুসুম-সদৃশ। সে ত্রিদিবে থাকিলেও কৃমিকীটপূর্ণ নরকে অবস্থান করে। সুতরাং হৃদয়ের নির্ম্মলতা বিধান না করিলে আর গতি নাই। কিন্তু নরক কেমন করিয়া স্বর্গে পরিণত হইবে? আবর্জ্জনা-পূর্ণ পূতিগন্ধময় শ্মশান কেমন করিয়া নন্দন কাননে পরিণত হইবে? তাহাও কি সম্ভব? মন! হতাশায় ডুবিওনা। * * * *

শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক প্রার্থনা কর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ।

যিনি শ্রীক্ষেত্রে অন্নচ্ছত্র দিয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন, যিনি একই মহাপ্রসাদ অনির্ব্বিশেষে সকল জাতিকে সেবন করাইয়া, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরম দয়াময় ভগবানের চক্ষে সকলেই সমান, সকলেই তাঁহার প্রতিপাল্য, — চিন্তাশীল ভাবুক ভক্তবৃন্দের নিকট প্রতিপন্ন করিতেছেন, জানি না আজ কেন সেই মহাপুরুষকে হঠাৎ আমার স্মরণ হইল। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকান্তি আজানুলম্বিতবাহু, ধর্ম্মপ্রাণা কুলকামিনীগণেরও চিত্তাপহারী একটী সুন্দর মনুষ্যকেও স্মরণ হইতেছে। ইঁহারা উভয়েই ঈশ্বর, উভয়েই প্রভু, উভয়েই ঠাকুর, উভয়কেই ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে উভয়কেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে। একই অখণ্ড চিদানন্দময় বস্তু দুইটী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। এক জন মহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া জগৎ পরিপালনাদি কার্য্যের জন্য রাজরাজেশ্বররূপে রত্নবেদীর উপর অবস্থান করিতেছেন। আর এক জন দীন হীন কাঙ্গাল বেশে

মুখে কিছু বলিতে না পারিয়াই যেন মুগ্ধা কুলবালার ন্যায় তাঁহার মুখারবিন্দে নয়ন রাখিয়া অনবরত অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। একই ভাবে শ্যাম ও গৌররূপে যুগল মূর্ত্তি হইয়াছে। শ্যাম ঠাকুর হইয়াছেন ভাবের বিষয়, আর গৌর ঠাকুর হইয়াছেন ভাবের আশ্রয়। এক জন প্রভু, অপর জন তাঁহার ভক্ত, এক জন সুন্দর, আর এক জন সেই সৌন্দর্য্যের সেবা ও আস্বাদনকারী। এক জন নাম ধরিয়াছেন জগন্নাথ, জনার্দ্দন বা শ্রীকৃষ্ণ, আর এক জন শ্রীগৌরাঙ্গ, কৃষ্ণচৈতন্য বা মহাপ্রভু। কৃষ্ণ সুন্দর বস্তু, গৌর সেই সুন্দর বস্তুর সেবাকারী। যদি সেবক না থাকিত তবে সেব্য বস্তু লইয়া আর কি হইত? তাই শ্যামের সহিত শ্যামসেবী গৌর উদয় হইয়াছেন। এই যে শ্যাম সুন্দর আর গৌরসুন্দর, এক জন শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি, আর এক জন চলনশীল মনুষ্য মূর্ত্তি, ইহারা আজ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রভু। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিপালক নহেন, তাঁহার স্বামী; আর শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছেন এক জন উৎকৃষ্ট অতুলনীয় মনুষ্য, ভগবদ্ভক্তগণের অগ্রগণ্য। তাঁহার তুল্য ভগবৎ-রসে রসিক পুরুষ আর জন্মে নাই। তিনি শ্রীশ্রীভগবানে ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি নিয়তই ভাবাবেশে থাকিতেন। শাস্ত্রে ব্রজদেবী শ্রীরাধার ভাবকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। শ্রীশ্রীভগবানকে মধুর ও সুললিতভাবে বশীভূত করিবার সামগ্রী শ্রীরাধায় ও আকার ভেদে ভক্ত মাত্রেই নিত্য বিরাজিত আছে। আহ্লাদিনী রাধাশক্তি অংশতঃ ভক্তের মধ্যেও অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীগৌরাঙ্গে তাঁহার পূর্ণাবস্থিতি। যখন হরিপ্রিয়া শ্রীরাধাকে শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয় মন্দিরে ক্রীড়া করিতে দেখি, তখন সহজেই মনে হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ তোমার আমার মত জীব নহেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়াজীর মধুর ভাব পরমাদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে

পাপী ও তাপী জীবগণকে নিস্তার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভক্তপাঠক। জগন্নাথের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর ভাবটী একবার স্মরণ করুন। তিনি আপনাকে শ্রীরাধা বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। নিজে যে শ্রীকৃষ্ণ তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। বহু দিন বিচ্ছেদের পর কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া শ্রীরাধার যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, আজ মহাপ্রভুও সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন। বহু দিনের পর প্রিয়দর্শন ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার সুখ হইতেছে না এইজন্য যে, যে স্থানে মিলন হইয়াছে সে স্থানটী তাহার মনোমত হইতেছে না, আর শ্রীকৃষ্ণের ভাবটীতে বেশ ভাব লাগিতেছিল না, তিনি চাহেন, চিরবসন্ত সেবিত কোকিল কূজিত মধুর শ্রীবৃন্দাবনে মুরলীবাদনপটু নটবরবেশধারী রমণীমোহন নবীন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু এখানে তাহার কিছুই নাই, আছে কেবল হাতি, ঘোড়া, লোক জন, সৈন্য সামন্ত, অতুল ঐশ্বর্য্য, আর তাহারই পরিচালক বা কর্ত্তা রাজবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ। অনেক দিনের পর প্রাণ বল্লভের সাক্ষাৎ পাইলেন, কিন্তু কেমন যেন আর এক রকম ভাবে। তাই শ্রীরাধার সুখ হইতেছে না, তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন বটে, কিন্তু যেন মনের ক্ষোভ মিটিতেছে না, তিনি বলিতেছেন "প্রভো! প্রাণ বল্লভ! তুমি এখানে কেন? আমাদের বৃন্দাবনে চল। বৃন্দাবনেশ্বর! তোমাবিহনে তোমার সেই সুখের বৃন্দাবন শ্মশান হইয়া আছে। আমরা কেবল আশার আশে জীবন ধারণ করিয়া আছি, বৃন্দাবনের আলোক! ব্রজবাসিগণের প্রাণস্বরূপ! শীঘ্র বৃন্দাবনে চল।" মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের সম্মুখে দাড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, আর মনে মনে ঐকথা বলিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এই মধুর প্রার্থনা ভক্তগণের অজস্র সুখের কারণ হউক। ভক্তপাঠক! আসুন, আমরা দুই প্রভুকে প্রণিপাত করিয়া অদ্য বিদায় গ্রহণ করি।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সপুত্রায় সভৃত্যায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥

—×—

আরাধনা।

নমো নমো দীননাথ, নমো নারায়ণ
অধম-তারণ প্রভু,
শিবদাতা ধাতা, বিভু,
শুভময়, প্রেমময়, অনাথ-শরণ।
বিকচ সুনীল পদ্ম,
সুখদ সুবাস সদ্ম
কে আর পূজিবে হরি, বিনা ও চরণ?
ভকতি কুসুম রাশি
লও নাথ! হাসি' হাসি',
দিব্য গতি হয় তোমা' করিলে পূজন,
সহস্র প্রণাম করি হৃদয় রঞ্জন।

অনাদি অনন্ত দেব প্রণমি তোমায়,
অতি শিশু ছেলে ধ্রুব
যা'রে পূজি' পায় ধ্রুব,
যা'র প্রেম অতি ছোট বালকে মাতায়,
প্রহ্লাদ দানবপতি,
ভালবেসে যা'রে অতি
কত ঘোর দুরগমে পরিত্রাণ পায়,—
কেবা করে বিষ পান
রাখিতে ভক্তের প্রাণ,
ভকত বৎসল হেন কেবা আছে? হায়!
কোন জন ভক্তিবলে
বদ্ধ হয় উদূখলে?

নিজে ক্লেশ সহি' দেন ভকতে যা' চায় ?
নমো নমো নারায়ণ, নমো রাঙা পায় ।

নমো নমো নারায়ণ, মুরলী-বাদন
শিরে শিখি-পুচ্ছ-চূড়া,
কটিতটে পীতধড়া,
বক্ষেতে কৌস্তুভ-আভা নয়ন রঞ্জন
হেরি' ও মোহন রূপ,
উছলে ভকতি-কূপ,
দুকূল ভাসা'য়ে বহে যমুনা উজান
নীরদ বরণ শ্যাম,
মরি কি বঙ্কিম ঠাম ।
অলকা তিলকা ভালে নিত্য শোভমান,
প্রণমি তোমায় হরি, মুরলী-বয়ান ।

নমো নমো দীননাথ, নমো দয়াময়
পুরুষ প্রধান তুমি,
ভবময় ভব তুমি,
মোক্ষদাতা ধাতা তুমি, তুমি ব্রহ্মময়,
দেব, দেবেশ্বর, বিভু
মরত-নিবাসী কভু ;
বিশ্বের কুশল তরে কেবা এত সয় ?
তমোময় মৃত্যুঞ্জয়,
বিধি রজোগুণময়,
সত্ত্বগুণান্বিত দেব, আর কেহ নয়
বিনা হরি দীনবন্ধু দেব দয়াময় ।

নমো নমো নারায়ণ বিশ্বের কারণ,
তুমি বিশ্ব-রচয়িতা,
তুমি নাথ, বিশ্বপাতা,
* কাজ তোমায় দিয়ে ; [illegible]

প্রেম ফুলদল নিয়ে
ভকতি-চন্দন দিয়ে
পূজিব হৃদয় মাঝে হৃদয় রতন।
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম,
এ চারি বর্গের ধাম,
যতনে গ্রহণ কর হৃদয় আসন।
বস নাথ! হাসি' হাসি'
দিব্য জ্যোতি পরকাশি'
মনে মনে নিরজনে করি দরশন,
প্রণমি তোমায় হরি, বিশ্ব সার-ধন।

ও চরণ আরাধিতে আমি অভিলাষী
প্রাণের সাধক আমি,
পূজিব তোমায় স্বামী।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ নিত্য মিশামিশি,
জ্ঞানাতীত, জ্ঞানময়,
অনন্ত শক্তিময়,
এই বর দেহ নাথ, করুণা প্রকাশি
যদিও জানিনা তন্ত্র
বেদাদি, বেদান্ত, মন্ত্র,
পূজিবারে পাই যেন পদছায়ে বসি',
কালভয় নিবারণ,
হরি হে কালবরণ!
পূজিব তোমায় নাথ, সুখনীরে ভাসি'
শ্যাম জলধর রূপ বড় ভালবাসি।

ছবি।

কে তুমি ছবি। ঐ যে কাষ্ঠ-বন্ধনার ভিতর থাকিয়াও উজ্জ্বল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া মধুর মোহন হাসি হাসিতেছ। উহা কাহার প্রতিমূর্ত্তি? আয়নায় ঢাকা হ'য়েও, যেন স্নিগ্ধ সুমধুর সুষমায় এই গৃহবাসীকে পবিত্র করে ও কার ছবি রহিয়াছে? বল ছবি! তুমি কার? তুমি কি আমার হবে? আমার বলে কি তোমায় চির দিন এই ঘরে রাখতে পারবেনা? মধুর ছবির সুমধুর ভাবের ভাবুক হ'তে কি পারবো? বল, ছবি! যদি তোমায় আমার বলে ভাবতে দাও তবে আজীবন ঐ সুন্দর ছবিটীতে প্রাণে প্রাণে আকৃষ্ট হই। তাহা কি আমার ভাগ্যে হ'বে? পাপময় এই হৃদয় কি তোমাকে অবাধে পাবার আশা করিতে পারে? ছবি। মনে হয়, তুমি ত আমার প্রাণেশ্বর প্রেমময় শ্রীহরির মূর্ত্তি। কিন্তু তবুও তোমাকে আমার বলিতে মন সঙ্কুচিত হয় কেন? আমার চিত্ত মলিন, তাই কি তোমাকে আমার বলিয়া ভাবিতে পারি না, অথবা সেই নিমিত্ত তুমি আমার হইতে চাহ না? তবে তুমি আমার দিকে চাহিয়া আছ কেন? কথা না বলিয়াও আমার প্রাণ হরণ কর কেন? ছবি তুমি আমার মত পাপীর ধন হবে কি? বল বল, হাসি হাসি মুখ খানিতে বাঁকা নয়ন দুটী ফিরায়ে—যাহা দেখতে, যাহা ভাবিতে, আমি বড় ভাল বাসি—একবার বল, তুমি আমার হইবে, আমার ঘরে চিরদিন থাকিবে। ঘর আমি অবাধে ছাড়িয়া দিব। তুমি আপন ভাবিয়া তাহাতে থাকিবে। ছবি! এঘর তোমারি। পরের ঘরত নয়; আমি যে চির দিন তোমার—একান্তই তোমার। তুমি বুঝি ইহাকে পরের ঘর বলিয়া ভাব? কই, ছবি! তুমিত কোন কথার উত্তর দেও না! তোমাকে আমি প্রাণের কত কথা বলিলাম, কিন্তু তুমিত একটী কথারও উত্তর দিলে না! কিছুইত বলিলে না! কিন্তু তুমি যেন আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছ: নয়নে নয়নে কি কথা বলিতেছ।

আমি ও যেন কিছু বুঝিতেছি; তথাপিও তোমার কমনীয় ওষ্ঠ বিনির্গত মধুময় একটী আশ্বাস বাক্য শুনিতে বাসনা হয়। তাই কাতর ভাবে করজোড়ে বিনতি করি, একবার বল তুমি আমার হইবে।

* * * * * * * * * *

ওঃ! ভুলেছি! তুমি যে ছবি!! ছবির কাছে আমি আর কি অধিক প্রত্যাশা করিতে পারি? আয়নার মধ্যে দঁড়াইলেইত ছবির কাজ করা হইল; তবে আমি ইহার নিকট আর কি পাইতে ইচ্ছা করি। পাগল মন! তোমার ভালবাসার হৃদয়রতনের ছবি দেখেই কি প্রাণ জুড়াইতে চাও। না, ছবি, তুমি আমার ঘরের কেবল শোভা বর্দ্ধনের নিমিত্ত নহে। তুমি এই তৃষিত প্রাণ সুশীতল জলধরমুক্ত বারি সদৃশ। যখন আমি সেই মনচোরার বিরহে একান্ত কাতর হই, তখন ছবি! একমাত্র তুমিই আমকে সান্ত্বনা কর! আবার যখন আমি গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি, তখন তুমিই আবার সেই প্রাণারাম শান্তিময় মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগাইয়া দাও। ছবি! তুমি আমার বড়ই উপকারী বন্ধু। তুমি আমার প্রভুর চিত্র, আমার হৃদয় দেবতার প্রতিমূর্ত্তি, তোমাকে আমি বার বার প্রণাম করি। এইরূপ তুমি আমার গৃহে চিরকাল থাকিয়া আমার তাপিত হৃদয় জুড়াও, তোমাকে সর্ব্বদা এইরূপ নয়নে দেখিয়া সংসার-যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই; আর ছবি! তুমি অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে সেই শান্তিদাতা প্রেমময় চিদানন্দরূপ উদ্ভাসিত কর। কিন্তু ছবি! আমার অন্তরগৃহ বড়ই জীর্ণ, তাহা বিনা সংস্কারে—অযত্নে—ঝড়ের উৎপাতে ভগ্নপ্রায়। তবুও সাধ হয়, আমার সেই দরিদ্র কুটীরে প্রভুকে একবার বসাইব। হয়ত তিনি দয়া করিয়া তাঁহার অনুচরবর্গকে আমার এই ভগ্ন কুটীর সংস্কারিত করিতে আদেশ করিবেন। তিনি রাজরাজেশ্বর, তাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই ত আমার এই জীর্ণ গৃহ নূতন হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে আমার দরিদ্রতা না জানাইলে, গৃহের দুরবস্থা না দেখাইলে, কেমন করিয়া

তাহার পরিবর্ত্তন হইবে ? তাই ছবি! তুমি আমার সহায় হও। তোমাকে যেমন বহির্গৃহে রাখিয়াছি, সেইরূপ যেন তাঁহার আনন্দ-ঘন স্বরূপ মূর্ত্তিকে আমার অন্তরগৃহে রাখিতে বাসনা হয়। তিনি জীববৎসল, নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছা পূরণ করিবেন। আমার ভগ্ন দরিদ্র কুটীর সুসজ্জিত প্রাসাদ হইবে। কেননা, তখন তাহাতে রাজরাজেশ্বরের গৃহ। আমি তাঁহার অনুগতা হইয়া চরণ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব।

ছবি! তুমি পবিত্র দেবদেবী মূর্ত্তিস্বরূপে আমাদিগের গৃহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বদা গৃহবাসিগণের মনে পবিত্র ভাব জাগরিত কর। প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া আমরা তোমার পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে অপূর্ব্ব ভাবে ভাবিত হই। তাই ছবি হিন্দুগৃহে তোমার এত আদর। দীনদরিদ্র হইতে অট্টালিকাবাসী ধনী পর্য্যন্ত সকলেই তোমাকে আদর করে, সকলেরই নিকট তোমার প্রতিপত্তি।* কিন্তু ছবি তুমি যেন কেবল মাত্র গৃহের শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্ত না হও। তোমাকে দেখিয়া আমাদের যেন সেই চিরশান্তিপ্রদাতা প্রেমময়ের ভাব হৃদয়ে উদিত হয়। যদি আমরা এই চিত্রিত ছবি দর্শন করিয়া সেই জীবন্ত প্রাণারাম প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে প্রযত্ন না করি, তবে গৃহে চিত্র রাখিবার সার্থকতা কি ? চিত্রেরই বা প্রয়োজন কি ? না ছবি! তোমার সেই পবিত্র পরমেশ্বরের ভাব মানবহৃদয়ে জাগরিত করিবার শক্তি আছে। তোমাকে আমি সেই প্রেমময়ের প্রতিনিধিস্বরূপ মনে করি। মন তোমাকে দেখিয়া সেই বিশ্বপতির ভাবে ভাবিত হইতে চায় এবং তখন সেই পবিত্রময়ের স্মরণে প্রাণ মন উৎফুল্ল হইয়া উঠে ; নতুবা এই ঘরটীতে ঐ ছবিখানি দেখিয়া আজ সহসা আমার এই সকল কথা মনে উদয় হইল কেন ?

---

*আজ কাল গভর্ণমেণ্ট আর্ট ষ্টুডিও হইতে হিন্দু দেবদেবীর চিত্র কি সহরে কি পল্লিগ্রামে সর্ব্বত্র প্রচারিত। পূর্ব্বে চিত্রের এত বহুল প্রচার ছিল না। পবিত্র চিত্রের এইরূপ প্রচার ও আদর হিন্দুসন্তানগণের মঙ্গলের কারণ।

মন্ত্র-শক্তি ।

মন্ত্রের কি মাহাত্ম্য, মন্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ কি ফল লাভ হয়, বা মন্ত্র জপে প্রাণে প্রাণে কি বল পাওয়া যায়, ইত্যাদি অনেক বিষয়ই উপস্থিত প্রশ্ন হইতে আমাদের আলোচনার বিষয় হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রশক্তি যে কি, তাহা বলিবার বিষয় নয়, অনুভববেদ্য। এই মন্ত্র কি, এবং কোন দেবতার কি মন্ত্র, কোন অধিকারীর কোন প্রণালী অনুসারে কোন মন্ত্র জপ করিয়া মন্ত্রশক্তি লাভ করিতে হয় তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ ও বিধি-পদ্ধতি অনুসারে বলিতে হইলে মন্ত্র সংস্কার এবং মন্ত্র চক্রাদির নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগাদি উল্লেখ করিলে অতি বিস্তীর্ণ এক খানি গ্রন্থ হইয়া যায়। সুতরাং পাঠকবৃন্দ! অল্পাক্ষরেই প্রশ্নের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব, আশা করি। এক্ষণে শ্রীরাধারমণের কৃপাই একমাত্র এবিষয়ে অবলম্বন।

প্রিয় পাঠকবর্গ! মন্ত্র ঈশ্বরের মূর্ত্তি, মন্ত্রশক্তি বলিতে পক্ষান্তরে ঈশ্বরেরই মাহাত্ম্য বলিলে বলা যায়। পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন জীবের কৃতার্থতার জন্য, মন্ত্ররূপেই জীবের অনুভববেদ্য হইয়া থাকেন। উহার আশ্রয় করিলেই জীব পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"

যাহার মনন করিলে জীব পরিত্রাণ পায় তাঁহার নাম মন্ত্র। সুতরাং জীবের পরিত্রাণই মন্ত্র শক্তি, ঐ মন্ত্র শক্তিই পরম পুরুষার্থ। এজন্য মন্ত্রই আমাদের অবলম্বনীয়, মন্ত্রই আমাদের সৎপথের পরিচালক, মন্ত্রই আমাদের বুদ্ধির শুদ্ধিতা- ও নির্ম্মলজ্ঞান-প্রদ এবং ত্রিতাপ সঙ্কুল ভব সংসার হইতে ত্রাণ পাইবার এক মাত্র উপায়। আমরা যে ঘোর সংসার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া অসংখ্য অসংখ্য দেশ ভ্রমণ, অসংখ্য অসংখ্য লোকের সহিত ব্যবহার এবং অসংখ্য অসংখ্য বস্তুর সংসর্গ ও আহারাদি করিয়া ও, বস্তুর যথার্থ সৎ অসৎ

ভাব হৃদয়ঙ্গম করত সংসারাবর্ত্তন হইতে উদ্ধারের উপায় স্থির করিতে পারি না, সেই দুস্তর সংসার সাগব হইতে মন্ত্রই আমাদিগকে পরম নিগূঢ় পরমেশ-তত্ত্ব বুঝাইযা পরিত্রাণ করিতে পারে। মন্ত্র শক্তিই আমাদিগকে সৎপথে চালাইতে পারে, মন্ত্রশক্তি আমাদিগের অনন্ত কালের সংস্কার সম্ভূত ভ্রম দূর কবিতে পারে। মন্ত্রশক্তিই আমাদিগের অজ্ঞান অন্ধকাব দূর করত সর্ব্বব্যাপী ভগবদ্ভাব বুঝাইয়া কৃতার্থ ও ধন্য করিতে পাবে।

ভক্ত পাঠকবৃন্দ! যদি আমাদের প্রকৃত বন্ধু কেহ থাকে, যতক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস বহিবে ততক্ষণ অন্তরে বাহিরে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, চির সম্বল, চির সহায, চির আশ্রয়, চির অবলম্বনীয় কেহ থাকে, তবে তাহা এক মাত্র মন্ত্রশক্তি। মনন করিবার শক্তি যাঁহাব কিছু মাত্র আছে, এবং যিনি শ্রীগুরুর বাক্যে শ্রদ্ধা রাখিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতেছেন, তিনি জানেন মন্ত্রশক্তি কি স্বর্গীয় অমৃত ধারাবাহিনী পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব শক্তি। মন্ত্র যে কি, এবং মন্ত্রের শক্তিই বা কি, মন্ত্র মনন করিলে সেই মন্ত্রই যে ইষ্টদেবের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া দেয এবং মন্ত্র হইতেই যে পরমানন্দ লাভ হয়, ইহাত বলিবার নহে—অনুভবের বিষয। প্রত্যক্ষ ভগবানের মূর্ত্তি স্বরূপ ইষ্ট মন্ত্র যাঁহার হৃদয়ে সংস্কারিত হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত ভক্ত এবং তিনিই ঈশ্বরের মহিমা বুঝিয়াছেন ও মন্ত্রশক্তি (ঈশ্বরের) মাহাত্ম্য বুঝিযা, অনুভব করিয়া অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অতুলনীয় আনন্দ, অনুপম সুখ, অপরিসীম শান্তিতে চিত্ত বিমোহিত করতঃ মানব জনম সার্থক করিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ! তাঁহাকে প্রশ্ন করুন মন্ত্রশক্তি কি! বলিলে সেই মহাত্মাই বলিতে পারিবেন, অন্যের বলিবার প্রকৃত শক্তি কোথায়?

এই বিষয়টী এমনই মধুর যে, বাহিরের বাগ্‌বিস্তারে ইহার উত্তর হইবার নয়। মন্ত্রের মাহাত্ম্য বলিতে গিয়া কোন শাস্ত্রকার সীমা পান নাই—

"চকিতমপিধত্তে শ্রুতিরপি"

এমন কি বেদ বাক্যও যাহার মহিমা কীর্ত্তনে সমর্থ নয়, সামান্য মানবের বাক্যে কি ইহার কিছু মাত্র তত্ত্ব ব্যক্ত হইতে পারে?

তাই বলি, ভক্ত বৃন্দ! মন্ত্রশক্তি অনুভববেদ্য, মন্ত্রশক্তি বুঝিতে হইলে শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করত তাঁহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে, তবেই বুঝিতে পারিবে মন্ত্র শক্তি কি, নতুবা অনন্ত কাল বিচার বিতর্ক ও যুক্তির অনুসন্ধান এবং শাস্ত্রের বচন প্রমাণ মুখস্থ করিলেও এ বিষয় কিছু বুঝিবার নয়। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

যদা তদ্ভক্তসংসর্গাৎ মন্ত্রদীক্ষাং লভেন্নরঃ।
তদা নিবৃত্তিমাপ্নোতি সারাৎ সারাং পরাৎ পরাং॥
যত্র দেহে লভেন্মন্ত্রং তদ্দেহাবধি ভারত।
তৎ পাঞ্চভৌতিকং ত্যক্ত্বা বিভর্ত্তি দিব্যরূপকম্॥
করোতি দাস্যং বৈকুণ্ঠে গোলোকে বা হরেঃ পদে।
পরমানন্দসংযুক্তো মোহাদিষু বিবর্জ্জিতঃ॥
ন বিদ্যতে পুনর্জ্জন্ম পুনরাগমনং নহি।
পুনশ্চ ন পিবেৎ ক্ষীরং ধ্রুবা মাতৃস্তনং পরং॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

ভক্তবৃন্দ! মন্ত্র লাভ করিলে ইষ্ট লাভ হয়, মন্ত্র দীক্ষা পাইলে ইন্দ্রিয়াদি পবিত্র হয়, মন্ত্র লাভ করিলে মানব দিব্য দেহ লাভ করে, মন্ত্র শক্তি বলে জীবের জনম মরণাদি অশেষ ক্লেশ দূর হয়, মন্ত্র শক্তি বলে মানব জীবন মুক্তি ও সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্যাদি সকল রকম মুক্তি ভাগী হয়। মন্ত্র শক্তি জড় দেহে চৈতন্য প্রকাশক মন্ত্র শক্তি অন্ধের নয়ন, মন্ত্র শক্তি ঈশ্বর তত্ত্ব প্রকাশক, মন্ত্র শক্তি দিব্য চক্ষু

প্রদাত্রী, মন্ত্র শক্তি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের পবিত্র প্রেমপ্রদ, মন্ত্র অজ্ঞানান্ধকার নাশক অধ্যাত্ম প্রদীপ, মন্ত্রশক্তি, দেহ, মন, প্রাণ, শক্তির শক্তি সঞ্চারক, মন্ত্র শক্তির আশ্রয় ব্যতীত প্রেমময় ইষ্টদেবকে পাইবার আর উপায় নাই।

ভক্ত বৃন্দ! আপনারা অনেক প্রাচীন ইতিবৃত্তে শুনিয়াছেন, সাধক মৃত দেহকে সজীব করিল, মরা মানুষকে কথা বলাইল, কাঠের মূর্ত্তি মনুষ্যের মতন ব্যবহার করিতে লাগিল ইত্যাদি। পরন্তু এসকল অসম্ভব হইলেও মন্ত্র শক্তি বলে সম্ভব হইতে পারে।

এক সময় ভক্তের মহিমা প্রকাশে ক্ষুণ্ণমনা বিদ্বেষী পাষণ্ডগণ শ্রীগৌরাঙ্গের কোনও ভক্তকে লাঞ্ছিত করিবার মানসে একটী মৃত গোদেহ আনিয়া অলক্ষিতভাবে রাত্রিযোগে ঐ মহাত্মা ভগবদ্গতচিত্ত সাধকের গৃহদ্বারে রাখিয়া প্রাতে নগরের বহু লোককে সমবেত করতঃ তাহাকে গোবধাপদেশে দোষী করিতে লাগিল! দেখিতে দেখিতে সেখানে অনেক লোক সমবেত হইল; মহাত্মা কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া গুরুদত্ত ইষ্ট মন্ত্র একান্ত প্রাণে জপ করিতেছেন। তিনি ইহার কারণ কিছু মাত্র জানিতেন না। প্রাভাতিক নিত্য কর্ত্তব্য ইষ্ট মন্ত্র জপ সমাপন করিয়া যেমন গৃহ হইতে বাহির হইলেন অমনি অসহনীয় অভাবনীয় অতি ভয়ানক দৃশ্য (মৃত্য গোদেহ) দেখিয়া এবং জনগণের অযথা গালাগালি ও তিরস্কার বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইলেন! ইস্টমন্ত্রজপপরায়ণ সাধক কাঁদিলেন না, বিপদে বিহ্বল হইলেন না, এমনকি অধিক্ষণ ভাবিলেন না; কারণ তাঁহার হৃদয়ে মন্ত্রশক্তি প্রকাশিত ছিল, মন্ত্র যে কি জিনিষ তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, মন্ত্র বলে অলৌকিক ব্যাপার অনায়াসে সাধিত হইতে পারে, সে বিষয় তার বেশ বিশ্বাস ছিল, তাই প্রসন্ন বদনে তিনি বলিয়া উঠিলেন—কেন বন্ধুগণ আপনারা

বৃথা কলরব করিতেছেন ? কেন আমাকে গোবধাপবাদে দোষী করিতে চেষ্টা করিয়া আপনারা সত্যভ্রষ্ট হইতেছেন ? আর কেনই বা মাতৃস্তন্যপায়ী গোবৎসকে মা ছাড়া করিয়া নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ব্যবহারে সর্ব্বজীবজীবন করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট অপরাধী হইতেছেন ? আপনারা অনুমতি করুন, আমি ইহাকে ইহার মাতৃসন্নিধানে পাঠাইয়া আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করি। এই বাক্য শুনিয়া যখন সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল রে ভণ্ড! ক্ষমতা থাকে তাহা কর, তখন তিনি একবারমাত্র প্রশান্তমনে ইষ্টমন্ত্রশক্তিসঞ্চার করতঃ গোবৎসের পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যেমন স্পর্শ করিলেন, অমনি বৎস জীবিত হইয়া উচ্চস্বরে হাম্বারব করিয়া ধাবিত হইল সাধক হরিবোল হরিবোল বলিয়া বাহির হইলেন। তখন সকলেই বিস্মিত, সকলেই লজ্জিত হইয়া পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিল—অভাবনীয় অতি অসম্ভব ব্যাপারে সকলেই চমকিত হইলেন। সাধক কিন্তু চমকিত হইলেন না, তিনি জানেন মন্ত্র শক্তির কাছে ইহা একটী অসম্ভব বা অতিরিক্ত ঘটনা নয়।

প্রিয় ভক্ত বৃন্দ! অধিক আর কি বলিব—ক্রূরতম বিষপূর্ণবদন মহা সর্পও মন্ত্র শক্তিতে বশীভূত হয়। জলের প্রধান জন্তু নিরন্তর নরমাংসলোলুপ কুম্ভীর মন্ত্র বলে নিজের হিংসা বৃত্তি ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া যায়, প্রবল পরাক্রান্ত বনচর সিংহ ব্যাঘ্রাদিও মন্ত্র শক্তি বলে এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকে, মন্ত্র বদ্ধ স্থান অতিক্রম করিতে পারে না, এদৃশ্য অদ্যাপিও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে, অনেঁকেরই বোধ হয় ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এইত বাহ্যব্যাপারে আমরা যাহা মন্ত্র শক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই তাহা আলোচনা করিলাম। পরন্তু মন্ত্র জপ পরায়ণ সরল প্রাণ সাধক আজও যাহা প্রত্যক্ষ করেন তাহা অতীব অপূর্ব্ব মন্ত্র শক্তিতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি দমিত, প্রশমিত ও অভিভূত হইয়া আপন আপন কুবৃত্তি ভুলিয়া মন্ত্র

ময় ইষ্ট দেবের ভাবে ভাবিত হইয়া সাধকের পরম মিত্রতার কার্য্য করিয়া থাকে। তখন আর কাম, ক্রোধাদি রিপুকুল সাধকের শত্রু বলিয়াপরিচিত হয না। ইষ্টদেবের ভাব উদ্দীপিত করিয়া বরং সাধকের অতি আদরের বন্ধুই হইয়া থাকে।

মন্ত্রের এই অপূর্ব্বশক্তি কথায় বলিবার নয়। যুক্তি পরতন্ত্র হইয়া বৃথা বিচার তর্ক করিলে মন্ত্র শক্তি হৃদয়ে অনুভব হইবার নয়। যোগশাস্ত্রে এই মন্ত্র শক্তির বিষয় অনেক রকম প্রশংসাবাদ লিখিত আছে, সে সকল উল্লেখ করিলে বিষয়টী অনেক হইয়া পড়িবে। সে যে হউক, যেমন বস্তু শক্তির কাছে যুক্তি পরাভব মানে, সেইরূপ অনুভববেদ্য মন্ত্র শক্তির কাছেও বহির্মুখাবৃত্তি যুক্তি সর্ব্বথা পরাস্ত। একই মৃত্তিকায় একই কৃষকের যত্নে একই দিবসে একই ক্ষেত্রে নিম্ব ও ইক্ষু প্রোথিত হইল, কিছু দিন একত্র বর্দ্ধিত হইবার পর যেমন আস্বাদন করিতে যাইবেন, অমনি অবারিত ভাবে নিম্বের তিক্তত্ব ইক্ষুর মিষ্টত্ব অনুভব করিবেন। কেন ইক্ষু মিষ্ট ও নিম্ব তিক্ত, একই মৃত্তিকার রস গ্রহণ করিয়া উভয়েই কেন এক রকম গুণ বিশিষ্ট হইল না, ইহা যেমন কাহারও বুঝাবার সাধ্য নাই। আবার যে ব্যক্তি ইক্ষু বা নিম্বের আস্বাদ আদৌ গ্রহণ করেন নাই, তাহাকে যেমন মিষ্টত্ব তিক্তত্ব কিছুই বুঝান যায় না, সেইরূপ এক গুরুর কাছে একই দিনে একই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কিছু দিন পরে একজন অবিশ্বাসী অপর ব্যক্তি সামান্য বিশ্বাসযুক্ত. অপর ব্যক্তি মন্ত্র শক্তির প্রভাবে আত্মারাম সিদ্ধ, পূর্ণ, কৃতার্থ। ভক্ত বৃন্দ! বস্তু শক্তির ন্যায় মন্ত্র শক্তিও প্রত্যক্ষ পরন্তু কথায় বুঝাইবার নয়। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মন্ত্র শক্তি বলেই ঋষিগণ অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন, মন্ত্র শক্তি বলে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাণে প্রাণে অনুভব করত চির শান্তি ও চির সুখে জীবন

কাটাইতেন। পৌরাণিক ইতিবৃত্তে সকলেই জানেন যে, মন্ত্র শক্তিতে দেবগণ বশীভূত হইয়া দেববিদ্বেষী অসুরদিগকে আপনাদিগের অনিষ্ঠকর বর দিতেও বাধ্য হইয়াছেন। মন্ত্রশক্তি যে জিতেন্দ্রিয়তার কারণ, মন্ত্রশক্তিই যে মনের প্রশান্ততা সম্পাদক, মন্ত্রশক্তিই যে মনের বল বীয্যপ্রদ মন্ত্রশক্তিই যে ভব রোগের মহৌষধ, মন্ত্রশক্তিই যে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আদিদৈবিক ত্রিতাপ জ্বালা নিবারক শান্তিকারি, তাহা সাধকই জানেন। অন্যের জানিবার বা অনুভব করিবার অধিকার নাই। পরিশেষে এই মাত্র বলিতে পারা যায় মন্ত্রশক্তি জীবের আশ্রয়। মন্ত্র শক্তি হৃদয়ান্ধকারনাশক অধ্যাত্ম প্রদীপ, মন্ত্রশক্তি দেহ, মন, প্রাণ শক্তির শক্তিসঞ্চারক, মন্ত্র শক্তির আশ্রয় ব্যতীত প্রেমময় ইষ্টদেবকে পাইবার আর উপায় নাই।

আপনারা মন্ত্র শক্তি বলে ভগবানের ভাবে থাকিয়া পবিত্র হৃদয়ে ভগবান হৃদয়েশ্বরকে, প্রাণের প্রাণকে, জীবনের সম্বলকে আপন করিয়া, বা তাঁহার হইয়া যে সুখ ও শান্তি এবং যে পরমানন্দ লাভ করিতেছেন, এই বাকজাল বিস্তার কারী অন্তঃসার বিহীন দীনহীনকে সেই ভাবের কণা মাত্র দিয়া কৃতার্থ করুন যেন সাধের মনুষ্যদেহ বিফলে না যায়। শ্রীগুরুদেবের আদরের ও প্রেমের প্রাণের জিনিষ যে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি, তাহার শক্তি অনুভব করিয়া মন্ত্রময় দেবদেবকে হৃদয়ে ভাবিয়া মন্ত্রশক্তিতে আপন শক্তি মিলাইয়া “আমিআমার” প্রভৃতি দুর্ব্বাসনা ভুলিয়া যেন ইষ্টদেবের ভাবে অবশিষ্ট জীবন কালকাটাইতে পারি।

পতি কে ?

পতি তুমি! কেন মন মিছে অহঙ্কার ? বারেক দেখহ ভাই ভাবিয়া অন্তরে
পালক রক্ষক, যেই পতি নাম তার। আছে কি শকতি তব পালিতে কাহারে!

মূঢ় মন মোহবশে এই অহঙ্কার—
পালিছ আশ্রিতে তাদের দিতেছ আহার।
এনে দাও বটে, কিন্তু পাও কোথা হ'তে?
আহারে দেহের পুষ্টি কাহার শক্তিতে ?
মুটে মোরা বোঝা বই, দেন গুণনিধি;
তবে কেন মিছে দর্প করি নিরবধি ?
যার যাহা প্রয়োজন দিয়ে অবিরত
যেজন পালিছে ভাই মোদের সতত,
যার বলে বায়ু সদা করি সঞ্চালন
রাখিতেছে সযতনে মোদের জীবন,
অনল অনিল পৃথ্বী আর ভূতচয়
যার বলে সততই মঙ্গল করয়,
অসীম করুণানিধি পতি সেই জন,
ভৃত্যসম তাঁর আজ্ঞা করহ পালন।
তুমি মন পতির নাম ধর এ সংসারে
জগৎ পতির আজ্ঞা পালিবার তরে।
আবার বারেক ভাই ভাব মনে মনে
তুমি কি রক্ষিতে পার কোন জগজনে!
দূরে যাক অন্য রক্ষা, ভাব একবার
নিজেকে রক্ষিতে শক্তি আছেকি তোমার;
গর্ভবাস হতে ভাই দেখহ ভাবিয়া
কাহার দয়ায় আছ জীবন ধরিয়া—
ভাবহ শৈশবে কেবা রক্ষিল যতনে
সুধা সম দুগ্ধরাশি নিয়া মাতৃস্তনে,
কাহার শক্তিতে বল বল মোরে ভাই
নশ্বাস প্রশ্বাস বাঁচে প্রাণি সমুদয়
প্রতিপলেবাঁচে জীব তাঁর দয়া বলে
কেন তবে মিছা গর্ব্ব কবিছ সকলে,
করুণানিদান হরি পতি সবাকার।
মোহবশে থেক না মন ত্যজ অহঙ্কার,
ভাব সেই সারাৎসার জগত জীবনে,
আত্ম নিবেদন কর তাঁহার চরণে।
সামান্য অর্থের তরে রে অবোধ মন!
কার সেবা না করিতে করিছ মনন ?
পরমার্থ পাবে মন সেবিয়া যাহারে,
তারে ভুলে কেন ব্যস্ত অন্যসেবা তরে?
অই যে কদম্ব মূল করে আলোময়
হাঁসিয়া মধুর হাসি অমিয় ছড়ায়,
নবজলধররূপ শিরে শিখিপাখা,
মোহন মুরলী করে দাঁড়াইয়া বাঁকা।
ক্ষীণ কটি বেড়ি কিবা শোভে পীতধড়া,
নবীন নীরদ যেন সৌদামিনী বেড়া।
গলে দোলে বনমালা নূপুর চরণে,
দাঁড়ায়ে প্রাণের হরি বিভঙ্গিম ঠামে;
অইত রসিক বর তব প্রাণপতি,
যাও ত্বরা তাঁর প্রেমে কর রতিমতি
তাঁর সেবা তরে কর আত্ম সমর্পণ,
আত্মীয় যা কিছু দেখ সব তাঁরি ধন,
প্রেমপূর্ণ আপনার হৃদয় পাতিয়া
বসাও প্রাণেশে ভাই যতন করিয়া,
ভকতি কুসুম মালা গাঁথিয়া পরাও,
প্রাণের মতন করি প্রাণেশে সাজাও
পাখালি চরণ দুটি নয়নের জলে
সাজাও চন্দন আর তুলসীর দলে,
ধরেছ মানব দেহ কর এই সার,
পতিসেবা বিনা ভবে গতি নাই আর।

সুরটমল্লার—একতালা।

যে ধনের তরে বেড়াও ঘুরে ঘুরে এ ভব সংসারে অবোধ মন।
সে ধন ঘরে ঘরে ফেরে দেখেও দেখনারে,
(বল) কোথায় গিয়ে তা'রে করিবি দর্শন ॥
ঐ দেখ যে জন "বাবা বাবা" ব'লে হস্ত প্রসারিয়ে আসে তব কোলে,
পুত্র ভেবে যা'রে সকল গেলি ভুলে ও সে পুত্র নয় পরম পিতা যে স্বয়ং ॥
আদর ক'রে থেকে যে জন দেয় তোরে "মা-মা" ব'লে তুমি ডাকবে যাহারে,
সে নহে কেহ আর, সেই করুণার আধার
আজ মায়ের মত হ'য়ে করি'ছে পালন ॥
প্রেয়সী হইয়ে প্রিয় সম্ভাষিয়ে যে জন থাকে সদা অনুগতা হয়ে
সে নহে অন্য জন, হয় সেই জন
আজ তোমারি কারণ ওরূপ ধারণ ॥
যার কোলে থেকে কর সদা স্ফূর্ত্তি, ও সে পিতা নয় পরম পিতার প্রতিমূর্ত্তি,
এখন ধর ধর যুক্তি—কর তাঁদের ভক্তি
যদি মুক্তি পা'বি জীবন করিয়ে ধারণ ॥
জ্ঞাতি বন্ধু যত দেখিতেছ আর, যেন মন সব তারই অবতার,
তাদের ভাবিলে অপর সেই পরাৎপর
পর হ'য়ে যা'বেন,—হ'বে না মোচন ॥
মঙ্গলময় হরি মঙ্গল কারণ করেছেন কত শত রূপ ধারণ,
যেন কভু কা'রে হেয় জ্ঞান ক'রে
হের হযো না'রে তাঁহারই সদন ॥
শত্রুভাবে যে জন করি আগমন আশে পাশে তব ভ্রমে অনুক্ষণ,
যেন তাঁরে মন নয় সামান্য ধন,
সেও দয়াময় হরি,——
পাতকী জনের পাপের প্রতিফল দিতে দয়াময়ের ওরূপ কেবল,
তার পাশে নত হইলে সতত
রবে নারে তত ভয়েরই কারণ ॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তি ভক্ত্যাঃ পরং পদম্ ॥

——০§❋§০——

কাঙ্গাল গৌর।

ত্যজি গৃহবাস করিল সন্ন্যাস গৌরাঙ্গ গুণের নিধি।
কাঙালের বেশে ভ্রমে দেশে দেশে হরি বলে নিরবধি ॥
নবীন নাগর গৌরাঙ্গ সুন্দর ত্যজিয়া মোহন বেশ।
পরিল কৌপীন ধরিল দণ্ড ফেলিল চাঁচর কেশ॥
স্নেহের জননী নবীনা ঘরণী ভাসাল দুঃখ পাথারে।
"হা নিমাই" ব'লে কাঁদে শচী মাতা প্রিয়ার নয়ন ঝুরে ॥
প্রাণের ভকতে সব তেয়াগিয়া চলিলা প্রাণের গোরা।
শূন্য প্রাণে সবে করে হাহাকার বলে "গোরা গোরা গোরা" ॥
সুখের নদিয়া নদে বিনোদিয়া বিনে দুঃখ পারাবার।
কীর্ত্তনের রঙ্গ নাই প্রেম-তরঙ্গ, সবে করে হাহাকার ॥
সোণার গৌরাঙ্গ যতনে করঙ্গ বাঁধিয়া কটির ডোরে।
দুটি বাহু তুলে হরি হরি বলে ভাসিছে নয়ননীরে ॥
চলিতে চলিতে গোরা আচম্বিতে ভূমিতে পড়িয়া যায়।
কোমল অঙ্গেতে কত ব্যথা পায় ধরিবার কেহ নাই ॥
প্রাণের ভকত যাঁহারে সতত রাখিত কত যতনে।
(সেই) ভকত-জীবন শচী-প্রাণধন দীনহীনবেশে ভ্রমে ॥
যমুনা জাহ্নবী বহে নিরবধি গোরার দুটী নয়নে।
পুলকে পূরিত সরব অঙ্গ, লালা ঝরে শ্রীবদনে ॥

কঙ্কর-কণ্টক— পুরিত ভূমিতে ধায় প্রেমময় গোরা।
কোমল শ্রীপদ হ'ল তাহে ক্ষত, রক্ত বহে শত ধারা॥
দেখিয়ে কাহারে সকরুণ স্বরে বলে দুটি কর যুড়ি।
এসেছি কাঙ্গাল তোদের দুয়ারে, জুড়াও বলিয়ে হরি॥
শচীর দুলাল পথের কাঙ্গাল, দেখিয়া জগত জন।
সকলে কাঁদিল প্রেমেতে ডুবিল চরণে সঁপিল মন॥
বিষয় বাসিত এই পাপ চিত কঠিন পাষাণ-মন।
কভুনা কাঁদিল, গোরা না ভজিল, না লইল হরিনাম॥

জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি?

মানব মাত্রেই সৌন্দর্য্যপ্রয়াসী। মনুষ্য সর্ব্বদা সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব অন্বেষণ করে। যেখানে সৌন্দর্য্য সেখানে মিষ্টতা, সুতরাং মনুষ্য সৌন্দর্য্য দেখিবামাত্র মধুমক্ষিকার ন্যায় তাহার মিষ্টত্ব আস্বাদন করিবার জন্য ধাবিত হয়। সৌন্দর্য্যের আদর সর্ব্বত্র। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, সকলেই সৌন্দর্য্যের পাগল। কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখে, বিশ্বাসী ভক্ত ভগবানের সৌন্দর্য্য দেখে, রাজা রাজ্যের সৌন্দর্য্য দেখে, কৃষক শস্য ক্ষেত্রের সৌন্দর্য্য দেখে, মাতা সন্তানের সৌন্দর্য্য দেখে, প্রেমিক প্রেমিকের সৌন্দর্য্য দেখে, সতী পতির সৌন্দর্য্য দেখে; কিন্তু ঈশ্বর সৌন্দর্য্য দেখেন জীবনের, এবং সুন্দর জীবনই তাঁহার প্রিয়।

জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি? চরিত্রই মনুষ্য জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, প্রকৃত সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইতে প্রায় কাহাকেও সচেষ্ট দেখা যায় না। সুতরাং অপরকে এই সৌন্দর্য্যের অধিকারী করিতেও বড় কেহ যত্ন করেন না। সন্তান সন্ততিগণ বিদ্যাশিক্ষা করুক, এইহেতু পিতা মাতা কত চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাদের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে সেরূপ যত্নশীল হন না, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহা বড়ই কষ্টের বিষয়। কেন ভাই!

বিদ্যা শিক্ষা করা যেরূপ অর্থ সাক্ষেপ, চরিত্র গঠন করাত সেরূপ অর্থসাপেক্ষ নহে। সচ্চরিত্র হইয়া জীবন যাপন কষ্টকর হইলেও বিদ্যা বুদ্ধি ও ধন উপার্জ্জন করিতে হইলে মত দূর ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, চরিত্রবান কি চরিত্রবতী হইতে হইলে তত দূর ক্লেশত স্বীকার করিতে হয় না।

প্রত্যেক নর নারী একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যৌবনের প্রারম্ভে চরিত্র বিনষ্ট হইবার বেশী সম্ভব। মানব-জীবনের যৌবন কালের তুল্য বিষম কাল আর নাই। চরিত্রের সৌন্দর্য্য কাহার জীবনে দেখিতে হইলে যৌবন অবস্থার পুর্ব্ব হইতে যত্নবান হইতে হইবে। পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখা দেখিয়া হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া তাহাতে ঝম্প প্রদান করে, অপরিণামদর্শী যুবা নর নারী পাপের মোহিনী মায়ায় বিমোহিত হইয়া সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া পাপকে আলিঙ্গন করে, অস্থায়ী সুখের মধুর প্রলোভনে পাগল হইয়া বহু যত্নের অমুল্য চরিত্র রক্ষা করিতে পারে না। চরিত্রহীন মানবতুল্য হীন কে? যে ব্যক্তি নিজের চরিত্র রক্ষা করিতে অক্ষম তাহার মহত্ব কোথায়? ফ্রান্সের উজ্জ্বল তারা স্বরূপ সেই মহাপুরুষ, যিনি বীর দর্পে অসম্ভব শব্দকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, "অসম্ভব শব্দ নির্ব্বোধদিগেরই অভি-ধানে থাকে," তাঁহার জীবনের শেষভাগ,এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল কেন ? মহাবীর নেপোলিয়ান সকল বিষয়ে সক্ষম হইয়াও চরিত্র রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, এবং শেষে অনুতপ্ত হইয়া বলিয়া ছিলেন "আমি সকল দেশ জয় করিয়াছি সত্য, কিন্তু সেই সূত্রধর-পুত্র যিশুর যশই চিরস্থায়ী আমার যশ অল্পক্ষণ স্থায়ী"।

চরিত্র-হীন মানব নিজের যেরূপ সর্ব্বনাশ করে অন্যেরও তদ্রূপ সর্ব্বনাশ করে। তাহার বিষাক্ত নিশ্বাসে অন্যের রক্ত শুকাইয়া যায়। সন্তান মুর্খ হইয়া সচ্চরিত্র হয় ইহা বরং ভাল, কিন্তু বিদ্বান অসচ্চরিত্র হওয়া কখনই ভাল নহে। ইহা অভিভাবকদিগের

স্মরণ রাখা উচিত। যে মানব আপন হৃদয়কে জগতের কোন কার্য্যে নিযুক্ত না করে, তাহার মন সর্ব্বদা পাপচিন্তা পূর্ণ। কুসংসর্গ চরিত্র নাশের একটী প্রধান কারণ, সঙ্গদোষে মনুষ্য পশু হয়। যদি কাহারও সচ্চরিত্র হইয়া জীবনাতিপাত করিতে অভিলাষ থাকে, তবে অসজ্জনসহবাস, অসৎ গ্রন্থপাঠ, এবং অসদ্ বিষয়চিন্তা যত্নে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কি নর কি নারী সকলের পক্ষেই "চরিত্র" জীবনের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিকারী। বিশেষতঃ রমণীর পবিত্র চরিত্র কোন প্রকারে দূষিত হইলে তাহা গরল অপেক্ষা ভয়ানক ও নরক অপেক্ষাও ঘৃণিত। একপ বলিতেছি না যে, চরিত্রহীনা রমণী অপেক্ষা চরিত্র হীন পুরুষশ্রেষ্ঠ। এই মাত্র সত্য যে, পবিত্রতা নারী জাতির শিরোভূষণ। পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখা উচিত। অতি সামান্য কারণে স্ত্রীচরিত্র কলঙ্কিত হয়, প্রাণের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয়। স্ত্রী চরিত্রে অল্প দোষ লক্ষিত হইলে, সকলে তাহার পতনের আশা করেন। উদার ও মহৎ চরিত্রবান হইতে প্রত্যেক নর নারীর চেষ্টা করা উচিত। যে মনুষ্যের চরিত্র নির্ম্মল সেই মনুষ্যের হৃদয়কে শ্রীহরি নিজের পবিত্র মন্দির জ্ঞান করেন। শ্রীহরির চরণে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিলে কোন দুষ্প্রবৃত্তি মানুষকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আত্মসংযম আত্ম-চিন্তা চরিত্ররক্ষার শাসনদণ্ড-স্বরূপ। এই বসুধা মানবের পরীক্ষার স্থল। ইহাতে রাশি রাশি প্রলোভন আছে। ইহাদিগকে জয় করিবার জন্য আত্মসংযম, ঈশ্বরের নামজপ ইত্যাদি উপায় অবলম্বনীয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশ্বর জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখেন, সে সৌন্দর্য্য বিশুদ্ধ চরিত্র। সুতরাং ভগবানের প্রেমদৃষ্টি লাভ করিতে হইলে জীবনের সৌন্দর্য্য দিন দিন বৃদ্ধি করা অর্থাৎ চরিত্রবান চরিত্রবতী হইতে চেষ্টা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কিন্তু চির সৌন্দর্য্যের আধার সেই শ্রীহরির সৌন্দর্য্যে পাগল না হইলে প্রাণের

প্রকৃত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে না। সুতরাং চরিত্র সংগঠন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সেই প্রেমময় পুণ্যাধার হরির শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

ভগবৎ-তত্ত্ব।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং" ইত্যাদি ভগবদ্গীতা ইহাতে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ভগবৎ-তত্ত্বের সার প্রকটিত এবং প্রকৃত উপাসনার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। হরিভিন্ন আর নিত্য বন্ধু কিছুই নাই, এইরূপ ক্রমাগত চিন্তা করিতে করিতে যাঁহারা সর্ব্বতো-ভাবে শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁহারা সেই অচ্যুতের সর্ব্বার্থদচরণপ্রসাদাৎ যোগক্ষেম অর্থাৎ তাঁহার সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করেন। ভক্ত অন্নাভাবে কাতর হইলে শ্রীহরি আপন মাথায় করিয়া অন্ন আনিয়া দেন, এইরূপ উদাহরণ যাহা উক্ত শ্লোক ব্যাখ্যাস্থলে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত ভক্তের চক্ষে কিছুই নহে। প্রকৃত ভক্তের পক্ষে উক্ত শ্লোকের মর্ম্মানুসারে ভগবান নিজে মাথায় করিয়া না আনিলেও ভক্ত অন্নাদি যাহা কিছু উপভোগ করেন তাহা সকলই সম্পূর্ণরূপে সেই ভগবানের প্রদত্ত এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া করেন। ভগবান মূর্ত্তিধারণ করিয়া নিজ হস্তে না দিলে যে, আমাদের তাঁহার দেওয়া বোধ হয় না, এইটীও একটী ভগবানের মায়া। যিনি তাঁহার প্রপন্ন শরণাগত, তিনি অনন্য হইয়া ভাবেন যে, যখন ভগবানই আমাদিগকে বলিষ্ঠ করিয়াছেন, তখন আমরা নিজভুজবলে যাহা কিছু আহরণ করি, তাহাও সেই ভগবানের দেওয়া ভিন্ন আমাদের নিজের অর্জ্জিত নহে। কেহ দান করিলেও সেই দাতার সমৃদ্ধির মূল ও সৎপ্রবৃত্তির প্রবর্ত্তক সেই ভগবান ভিন্ন অন্য কেহই নহে, এইরূপ চিন্তা করেন। লোককে সমৃদ্ধিশালী করা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে দয়া দাক্ষিণ্যাদি সৎপ্রবৃত্তি যোজনা করা সেই যোগক্ষেম বাহকেরই কার্য্য। উদার দাতৃপুরুষ ভগবানের প্রদত্ত

দ্রব্যাদি সর্ব্বদেবময় অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে অর্পণ করিয়া তাহা ভগবানকেই অর্পণ করিলেন, এইরূপ চিন্তা করেন, এবং কৃতার্থম্মন্য হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত অনন্য হইয়া সর্ব্বব্যাপী ভগবৎ-সত্তার উপলব্ধি ও তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণই মৃত্যু তাহার করাল ভীষণ মুখ ব্যাদান করিতেছে; কিন্তু যখন অনন্য হইয়া মৃত্যুতেও সেই মঙ্গলময় ভগবদিচ্ছা অবলোকন করিব, তখন মৃত্যুর আর সে করাল ভীষণ মূর্ত্তি থাকিবে না। তখন বোধ হইবে যে, মৃত্যু দেহপিঞ্জরাবদ্ধ জীবের উচ্চতর লোক প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ এবং যমই তাহার দ্বার রক্ষক। শৈশব কালাবধি যে যমের নামে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়, সেই যম তখন জীবের পরম বন্ধু ইন্দ্রিয় সংযমকারী ধর্ম্ম বলিয়া আবির্ভূত হইবেন। শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে, যখন পুণ্যাত্মাগণ প্রাণত্যাগ করেন, তখন যমই চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দর্শন দেন। ইহার তৎপর্য্য এই যে, পুণ্যাত্মা শ্রীহরিকে অহরহঃ সর্ব্বময় চিন্তা করেন, মৃত্যুর পরেও তিনি তদ্ভাবে ভাবিত থাকিয়া সেই শ্রীহরির সৌম্য আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শন করেন। তাঁহার কিছু মাত্র ভয়ের উদ্রেক হয় না। মরিবার পর কি হইবে বলিয়া তাঁহার আর সংশয় থাকে না। যেমন পরম কল্যাণময় পিতা জগতে আনিয়া অশেষ কল্যাণ প্রদানে জীবকে রক্ষা করিতেছেন, সেই রূপ পরেও ক্রোড়ে লইবেন এবং পিতৃস্নেহ বশতঃ যথোপযুক্ত অর্থাদি প্রদানে রক্ষা করিবেন, ভগবদ্ভাবাপন্ন জীবের ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। এই বিশ্বাসে ইহকালেই মৃত্যুর উদ্বেগ দূর হইয়া যাওয়ায় জীব শান্তি উপভোগ করেন, এবং অর্থতঃ ঐ শান্তিই জীবের বৈকুণ্ঠভোগ ও অমৃতত্বলাভ। এইটীই যে প্রকৃত যোগক্ষেম এবং ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের মুখ্য ফল, ইহা যেন আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। এইরূপ অনন্য ভাবে দেখিলে

জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হরি সকল মানব হৃদয়েই অবস্থিত এইভাব আইসে, এবং ইংরাজ গোল্ডস্মিথের চিত্ত প্রসূন কবিতাটী সেই ভাব দাতার ভাব বলিয়া উপলব্ধি হয়।

"Angels around defriending Virtue's friend;

* * * * *

His heaven commences ere the world be past!"

দিব্য পুরুষেরা যত সাধিতে সাধুর হিত
বন্ধুভাবে তার পানে ধায়।
না হইতে জগদস্ত দিব্য সুখ উপনীত,
স্বর্গভোগ মর্ত্ত্য হ'য়ে পায়।

এই অনন্য ভাবে, জগতের সমস্তই মঙ্গলময় ভগবানের কার্য্য অথবা সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছাধীন, এই দুইটীর মধ্যে একতর ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে ধর্ম্মের নামে জগতে যে সমস্ত বিপ্লব ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা আর থাকে না। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টিয়ান, কি মুসলমান সকলেই স্বধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে সামান্য মতান্তর লইয়া ভয়ানক বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত করেন; এমন কি তাহাতে মানব শোণিতে ধরা কলুষিত পর্য্যন্ত হয়। ইহাই কি ধর্ম্ম? তাহা হইলে ধর্ম্মের পবিত্রত্ব পাবনত্ব কোথায়? ধর্ম্মের নামে যদি অধর্ম্মের কার্য্য সাধিত হয়, তবে ধর্ম্মে অধর্ম্মে প্রভেদ কি? আপাততঃ বিরোধী বোধ হইলেও ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধান কিরূপে মিলাইতে হয় তাহা ভগবান গীতাতে অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন। আমরাও যদি সেই পরম গুরুর আদর্শ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম্মের অথবা একই ধর্ম্মের ভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করি এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে আত্ম বিস্মৃত না হই, তাহা হইলেই—

নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ—

এই ভাবের সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পরিব। যাহারা যে

ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহারা তদ্দ্বারা তাহাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হইবে, এই বিশ্বাসেই করিয়া থাকে। কেবল অপর কোনও ধর্ম্মে বিদ্বেষী হইয়া তাহা করে না। তজ্জন্য কিছু না কিছু সত্য ও সৎ যুক্তি সকল ধর্ম্মেই আছে। তাহা না থাকিলে কোন ধর্ম্ম মানব সমাজে আদৃত ও বদ্ধমূল হইতে পারে না। সেই সত্যের অনুসন্ধান করাই আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বাহ্যিক ব্যবহারের বিভিন্নতা দেখিয়া তদনুসন্ধানে নিরস্ত হইয়া বিদ্বেষ করা আমাদিগের উচিত নহে।

যে ইন্দ্রিয়ের সুখ ভোগের জন্য জগৎ সমস্তই ব্যস্ত, সেই ইন্দ্রিয়ের সুখ ভোগ হৃপ্তি ও অসীম নহে। আবশ্যক মত আহার বিহারের অতিরিক্ত হইলেই বিরক্তি আইসে, এবং যে সময় টুকু ঐ সুখ ভোগ হয়, তাহাও অতি অল্প! কিসে তবে স্থায়ি সুখ হইতে পারে, সকল সমাজের পণ্ডিতগণ এই বিষয় লইয়া চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হওয়াই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এইটী ভাল, এইটী মন্দ, ইহাতে সুখ, ইহাতে দুঃখ, ইহা কেবল মনের ভাবনা মাত্র।

এইটী ভাল, এইটী মন্দ, এইরূপ ক্রমশঃ ভাবিতে ভাবিতে অভ্যাসের দ্বারা এমন একটী ধারণা জন্মে যে, আমরা তাহার বিপরীত কার্য্য আর করিতে পারি না। এটী অখাদ্য ইহা ভোজন করিলে ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হয়, শিশুগণ বাল্যকাল হইতে এইরূপ ভাবে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হইলে পর সেই খাদ্যে আর তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। ক্রমশঃ ঐ সংস্কার এত প্রবল হয় যে, নিজে ঐ খাদ্য ভোজন করা দূরে থাকুক, অন্যকে উহা ভোজন করিতে দেখিলেও নক্কার আইসে। নব প্রসূত শিশুর কোন ও বিশেষ সংস্কার থাকে না, অভ্যাস জনিত ক্রমশঃ এইরূপ ভাল মন্দ নানা প্রকার সংস্কার জন্মে। এক্ষণে যদি আমরা বিবেচনা

করিয়া এইরূপ স্থির করি যে, ইন্দ্রিয় সুখ ক্ষণিক এবং তাহার বশবর্ত্তী হওয়াই আমাদিগের সমস্ত কষ্টের কারণ, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় সুখের উপর আমাদিগের বিশেষ অনুরক্তি আর থাকে না। এইরূপ স্থির করিয়াই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা ইন্দ্রিয়সংযমের বিধান করিয়াছেন। এস্থলে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ প্রভৃতি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে মত ভেদ নাই। ভোগাসক্তি ও হিংসাবৃত্তির উত্তেজনাই প্রধান দোষ, জন্তু-হিংসামাত্রই দোষ, কিন্তু জন্তু বিশেষের হিংসাতে ঐ দোষেরই তারতম্য হয়, তাহাতে কোন বিশেষ গুণ নাই। বরাহ মাংস ভক্ষণে দোষ, ছাগ মাংস ভক্ষণে দোষ নাই, অতএব প্রত্যহ একটী ছাগমুণ্ড ভক্ষণ করিব এইরূপ স্থির করিয়া প্রত্যহ ভোগাভিলাষের বশবর্ত্তীহইয়া ছাগ মাংস ভক্ষণেও যে দোষ জন্মে, তাহা বরাহ মাংস ভক্ষণ অপেক্ষা কম নহে।

এক্ষণে ইন্দ্রিয় ভোগ বিষয়ে অনাসক্তি ও বিষয়বাসনা হইতে বিরতি এই দুই সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভিত্তি স্থির হইলে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র মূলে এক স্থির হইল। ভক্ষ্য দ্রব্য ও পরিচ্ছদ কোনও ধর্ম্মের প্রকৃত অঙ্গ নহে। অনাসক্ত হইলে রাজ্যসমৃদ্ধির মধ্যে থাকিয়াও সন্ন্যাসী হইতে পারে, এবং তাহা না হইলে কৌপীনধারী অরণ্যচারীও সন্ন্যাসী নহে। তবে আহার বিহার সম্বন্ধে, যে সকল আহার বিহার ইন্দ্রিয় সংযমের অনুকূল তাহাই করা কর্ত্তব্য। তাহার অন্যথা হইলে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় এবং ধর্ম্মপথ হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করে। জাগতিক সমস্ত নশ্বর বস্তুতে আসক্তি ত্যাগের চেষ্টাই যে মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রধান সাধন তাহা সর্ব্ব ধর্ম্মই একবাক্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপি ত্বক্‌স্পর্শই যে সুখ দুঃখের উপাদান, এবং যে সুখ দুঃখের স্থায়িত্ব ঐ স্পর্শকাল মাত্র, সেই সুখ দুঃখে আমাদিগের

আস্থা না থাকে, তাহাই ভগবান আদেশ করিয়াছেন। আবার খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মশাস্ত্রে রূপান্তরে সেই আদেশ দৃষ্ট হয়,—

"Give up all, And follow me,"

অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী হইয়া আমার অনুসরণ কর। যোগবাশিষ্টে বশিষ্ঠ দেব বলিয়াছেন,—

ন পতত্যবটেজ্ঞস্তু বিষয়াসঙ্গরূপিণি।
কঃ কিল জ্ঞাতশরণিঃ স্বভ্রংশমনুধাবতি॥

প্রযত ব্যক্তি বিষয়াসক্তিরূপ কুপথে কখন পতিত হননা, রাস্তা জানা থাকিলে কে কোথায় গর্ত্তের দিকে ধাবিত হয়? ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বিষয়াসক্তি ধর্ম্ম পথের গর্ত্ত স্বরূপ। গর্ত্তে পতিত হইলে যেমন উত্থানশক্তি থাকেনা, তাহার মধ্যেই পড়িয়া থাকিতে হয়, সেইরূপ যতদিন আমাদের এই আসক্তির লাঘব না হয়, ততদিন আমরা ধর্ম্মের যতই ভাণ করিনা কেন, ধর্ম্মপথে প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতেছিনা বুঝিতে হইবে।

উপাসনা প্রণালীর পার্থক্য লইয়া নানা বিবাদ উপস্থিত হয়। কাহারও মতে সাকার উপাসনা ভাল, এবং কাহারও মতে নিরাকার উপাসনা ভাল। এই বিবাদ নিরর্থক! অধিকারী ভেদে উভয় প্রকার উপাসনারই প্রয়োজন। ইতি পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, স্থূল জড়জগত সূক্ষ্মাকারে লয় করিতে না পারিলে ভগবৎ সত্তার প্রকৃত উপলব্ধি হয় না।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়।
পরং ভাব মজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

নির্ব্বোধেরা আমি অব্যক্ত হইলেও আমাকে ব্যাক্তভাবাপন্ন মনে করে আমার অব্যয় অনুত্তম সর্ব্বকারণ কারণরূপ যে পরাৎপর ভাব তাহা না জানিয়া ঐরূপ ভাবে।

সাকার হইতে ক্রমশঃ নিরাকার উপাসনায় উঠিবার ক্রম

পাশ্চাত্যগণ মধ্যেও দৃষ্ট হয়—

"Rise from natnre to nature's God."

বাহ্যিক ও আভ্যান্তরিক প্রকৃতি কোথা হইতে বা কি জন্য এইরূপ হইয়াছে তাহা ক্রমশ চিন্তা করিতে করিতে সেই প্রকৃতির নিয়ন্তা অচিন্ত্যশক্তি বিভু বিশ্বেশ্বরের দিকে অগ্রসর হও।

আমাদিগের চৈতন্য যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনওবিষয়ের ভাবনায় লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ উহা সেই ভাবনাময় হইয়া থাকে। সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি না রাখিয়া হৃদয়মধ্যে যদি সেই মূর্ত্তি ভাবনা করি, তাহা হইলেও সাকার উপাসনা করা হয়। মানব রূপধারী যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার পরম পিতার নিকটে শেষ বিচারের দিন দণ্ডায়মান, ভাবিতে গেলে, পিতা পুত্র উভয়েই কোন একস্থানে বর্ত্তমান, ইহা ভিন্ন অন্য কোন ভাব উদয় হইতে পারে না। ইহা কি মূর্ত্তিমান দেবের সাকার উপাসনা নহে? হৃদয়ে যদি সাকার দেবমূর্ত্তি থাকে, বাহিরে তাহা চিত্রিত করায় দোষ হইতে পারেনা। যদি এই দুই মূর্ত্তি বাস্তবিক প্রিয় হয়, তাহা হইলে যে বহুক্ষণ ভাবিয়া হৃদয় মধ্যে সেই মূর্ত্তি ধারণা করত তাহা পটে অঙ্কিত করে, তাহার তাহাতে কিকোন সার্থকতা নাই? এবং যে ঐ মনোহর চিত্রপট দেখে, তাহার কি অন্তরে বাহিরে প্রাণের প্রিয় জিনিষ দেখিয়া নেত্র মন হর্ষোৎফুল্ল হয় না? যখন পিতা পুত্র ভেদশূন্য হইয়া এক পরমাত্মায় লয় হইবে তখনই প্রকৃত নিরাকার উপাসনা হয়, এবং তখন সাধকের চৈতন্য বিষয়জ্ঞান শূন্য হয়। উহাকেই শাস্ত্রে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে। যতক্ষণ নির্ব্বিকল্প সমাধি না হয় ততক্ষণ সকল উপাসনাই সাকার।

চিন্তামালা।

(প্রশ্নোত্তর মালা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

উঃ। দেখুন ভগবান বলিতেছেন, সজ্জনানুষ্ঠিত আচার ব্যবহারের অনুকরণ দ্বারা উত্তমা প্রেম ভক্তি লাভ করা যায়। স্বয়ং বেদস্বরূপ, প্রাজ্ঞগণের শীর্ষস্থানীয় ও অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতে সদাচারের অনুকরণ ও অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক। পূর্ব্ব মহাজনগণ যে পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন, তোমরা ও সেই পথে অগ্রসর হও। উচ্ছৃঙ্খল পথে গমন করিলে কখনই শান্তিলাভ করিবার আশা নাই। শ্রীশ্রীভগবানের রূপের ও গুণের ইয়ত্তা নাই। শ্রীগুরু ও সাধু ভগবদ্ভক্তগণকে ভগবানেরই প্রকাশ বিশেষ জ্ঞান করিয়া ভক্তি করা কর্ত্তব্য। তাহাতে দোষ উপস্থিত হয় না, বরং মহৎ শ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে। আচার্য্যরূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শিষ্যানুশিষ্যক্রমে পরমার্থলাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তত্ত্ববেত্তা ভগবৎ রসে রসিক গুরুদেবের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিন্ন পরম জ্ঞান পরম স্ফুর্ত্তি কখনই লাভ করা যাইতে পারে না। গুরুদেব শিষ্যের নিষ্কপটতায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বতেজের সহিত তাঁহাকে ভগবৎ-নাম, মন্ত্র ও ভাবাদি অর্পণ করিয়া থাকেন। আচার্য্যের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণের প্রথা আমাদের দেশে চির প্রচলিত। ইহার মধ্যে যে কি গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত সদাচারী ভক্ত ভিন্ন আর কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। জ্ঞানই বল, আর প্রেমই বল, সেবা ও অনুকরণ ব্যতীত কখনই লাভ করা যায় না। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান বা ভগবৎ-প্রেম গুরুশিষ্যানুবন্ধ। ইহাকে লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরুর নিকট যাইয়া দীক্ষা মন্ত্রাদি গ্রহণ করিতে হয়। আশ্রম ভেদে আচার ব্যবহারের ভেদাভেদ উপদেশ করিয়া গুরুদেব শিষ্যকে সৎসঙ্গ করিয়া ব্রহ্মলাভ করিবার আজ্ঞা দিয়া থাকেন।

এখন শিক্ষার কথা বলি শুনুন। দীক্ষাগুরুর নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া সৎসঙ্গ ও সদাচারের অনুষ্ঠান হইতে শিক্ষা আরম্ভ হয়। অসৎসঙ্গ বর্জ্জন ও সৎসঙ্গই হইল চরম প্রেম ভক্তি লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। যদি কাহারও ভাগ্যে কখনও এই বিশাল সংসারের নিত্যতা ও অনিত্যতার দিকে লক্ষ্য উপস্থিত হইয়া নিত্যাংশে রুচি ও অনিত্যাংশে অরুচি উপস্থিত হয়, তবে তাহার আত্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়া থাকেই। এরূপ আত্ম জিজ্ঞাসুর কথাই এস্থলে আলোচনা করা যাইতেছে। যাহারা কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া কেবল মাত্র সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া জীবনধারণ করিতেছে, "আমি কে, কৃষ্ণ কে, উপাসনা কি," এ সকলের বড় একটা তত্ত্ব রাখিতেছে না, তাহাদের কথা হইতেছে না। যাঁহারা কেবল হস্তের জল শুদ্ধ করিয়া লইবার জন্য কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই মন্ত্রের যাজন করিতে চাহেন তাঁহাদেরই শিক্ষা গুরুর প্রয়োজন। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান আছে, দয়া আছে ও বদ্ধকে মুক্ত কবিবার শক্তি আছে, তিনি শিক্ষা গুরুর যোগ্য। স্বয়ং চৈতন্যহীন হইলে অন্যকে চৈতন্য দেওয়া যায় না। শিক্ষাগুরু ভক্তিযাজনের আদর্শস্বরূপ পাত্র। আদর্শ মনের মত ও ও প্রাণের মত না হইলে তাহাকে কেহ আদর্শ করে না। প্রেম বা ভালবাসার পাত্রকেই উৎকৃষ্ট আদর্শপাত্র বলিতে পারা যায়। যাহাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে না তিনি শিক্ষাগুরু হইবার যোগ্য নহেন। যাঁহার হৃদয় উচ্চ ও মহৎ, যাঁহার রূপ ও তত্ত্বজ্ঞান আছে, যিনি প্রেমবলে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ, যাঁহার আচার ব্যবহার অত্যন্ত মধুর, তিনি শিক্ষাগুরু হইবার উচ্চ আদর্শ পাত্র। এইরূপ পাত্রের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়া ভক্তি যাজন করিলে শীঘ্র প্রেমরূপা ভক্তি দেবীর উদয় হইয়া থাকে। যাঁহাকে ভাল বাসি, তাঁহার সেবা ও অনুকরণ অতি সহজে ও অল্পায়াসে হইয়া থাকে। সেবা ও সদনুকরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ সত্ত্বস্থর স্ফূর্ত্তি হইয়া

পড়ে। প্রেম, পরমার্থ বা পরমা শান্তি মুখের কথায় লাভ করা যায় না। সেবা ও অভ্যাসের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। সেবা ও ভাবাভ্যাসের জন্য বিশেষ রূপে কোন ব্যক্তিকে শিক্ষাগুরুত্বে বরণ করা যাইতে পারে। এইরূপে ভাবাভ্যাস করিবার রীতি আমাদের দেশে পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। শিক্ষাগুরুর অনুকরণে ভক্ত-জীবন গঠন করিতে হয়। শিক্ষাগুরুর হৃদয়স্থ ভগবদ্ভাব ক্রমশঃ শিষ্যের অন্তঃকরণে সংক্রামিত হইয়া থাকে। গুরু ভগবানের ভক্ত হইলেও তাঁহাকে ভগবানেরই প্রকাশবিশেষ জ্ঞান করিয়া ভক্তি করা কর্ত্তব্য। চৈতন্যচরিতামৃতকার পুজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,...

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।"

বস্তুতঃ গুরুদেবকে ভগবানেরই প্রকাশবিশেষ জ্ঞান করিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

সূর্য্য-নারায়ণ।

ক্ষিতি, জল, বহ্নি, বায়ু, শূন্য, শশধর,
জ্যোতির্ম্ময় বিশ্ব-বীজ সূর্য্য-নারায়ণ;
নিরাকার সাকার ঐ অখণ্ড আকার,
বিরাজিত পূর্ণ ব্রহ্ম, জগৎ-কারণ।

প্রকাশিয়া পূর্ণব্রহ্ম রূপে চরাচর,
স্বগুণে আসি অই, কারণ-কারণ;
বাণীর অতীত যাহা, মন-অগোচর,;
স্বরূপবিকাশ হয় সূর্য্য নারায়ণ

নমঃ নমঃ পূর্ণব্রহ্ম, অখণ্ড-আকার,
জ্যোতির্ম্ময় আদিভূত বিশ্বের কারণ;
"সর্ব্বদেব-নমস্কৃত" সরূপ সাকার,
বিশ্বপিতা, জগন্মাতা জীবের জীবন।

তোমার কৃপায় হই, আমরা চেতন
তোমার জ্যোতির গুণে, দেব দিবাকর!
নমঃ নমঃ ব্রহ্ম জ্যোতি বিশ্বের কারণ,
জয় জয় জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানের আকর॥

জ্যোতিবিন্দু মোরা চিৎ-অংশ নারায়ণ,
ক্ষুদ্র দেহ ধারী দেখ আমরা সবাই,
তোমার যোগেতে মোরা সবাই চেতন,
বিয়োগ হইলে তুমি, চৈতন্য হারাই॥

জীবের জীবন তুমি, সকলের প্রাণ,
তোমার উদয়ে মোরা সচেতন হই,
জীবনে জীবন পাই, হে বিশ্ব জীবন,
জীবনবিয়োগে মোরা চৈতন্য হারাই॥

অস্তমিত হলে তুমি, হে বিশ্ব জীবন,
হারাইনু সবে দেব, মোদের চেতনা।
হে জীবনের জীবন, মরিনু তখন
জীবন বিহীন হয়ে যত বিশ্বজন॥

তুমি দেব দয়াময় জীবের জীবন,
জ্যোতিঃ ব্রহ্ম বিশ্ববীজ দেব দিবাকর।
স্বরূপে প্রকাশ বিশ্ব কারণ-কারণ।
বিশ্বগুরু বিশেশ্বর জ্যোতির আকর!

জয় জয় বিশ্বপতি, ব্রহ্ম সনাতন,
তোমার প্রকাশে দেব, জগৎ প্রকাশ;
সৃজন পালন লয় সবার কারণ
নমঃ নমঃ আদি শক্তি স্বরূপ বিকাশ!

ঘুরিতেছে ধরাচক্র তব আকর্ষণে,
গ্রহ তারা আদি যত সকলের রাজা;
পুষ্পাঞ্জলি দেয় সবে তোমার চরণে,
সুরাসুর নর লোকে করে তব পূজা।

সর্ব্বদেবনমস্কৃত দেব দিবাকর!
সকলের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি জ্যোতির্ম্ময়;
ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু ভূতের আকর,
আদি ভূত বিশ্ববীজ জীবের আলয়। (চৈতন্য-নিলয়)

পরম মঙ্গল তুমি শান্তির আলয়,
আসিয়াছে জীব যত তব অঙ্গ হ'তে ;
তোমাতে থাকিলে জীব সদা সুখে রয়,
থাকেনা অভাব কিছু জানে সকলেতে ॥

ছাড়িয়া তোমার পথ, তোমার ভজন
মিশিয়ে ভূতের সনে ভূত পূজা করি ॥
পদে পদে দুঃখ পাই—জনম মরণ,—
সদাই অভাব দুঃখ রোগে শোকে মরি ॥

মহাপাপী হয়ে করি আঁধারেতে বাস,
জ্ঞান হীন মূঢ়মতি পাপেতেই রত ;
বিকারপ্রমোদে মত্ত বিলাসের দাস,
রিপুর অধীন হয়ে থাকিহে সতত।

কর নাশ হেন মতি, কলুষনাশন!
তব পদে আশা যেন হয় হে আমার ;
নমিব তোমার জ্যোতিঃ, জগৎ কারণ!
পূর্ণ কর এই আশা, কৃপার সাগর।

তোমার চরণে যেন সদা রয় আশা,
হৃদি মাঝে চিন্তি তাহা করিয়া যতন ;
নাহি চাই কর্ম্ম ফল ঐশ্বর্য্য বিলাস,
বার বার জন্ম মৃত্যু এই নিবেদন ॥ (সংসারে এমন)

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব।

আজ ৪০০ শতাধিক বৎসর অতীত হইল শচীর দুলাল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বল্লভ, নদীয়ার চাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গদেব অপ্রকট হইয়াছেন, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন্ত শক্তি যে ভক্তগণের হৃদয়ে ক্রীড়া করতঃ যাবতীয় হিন্দু সন্তান মণ্ডলীর অন্তরে ভগবৎ প্রেম উদ্দীপন করিতেছে এবং অনন্ত কাল ধরিয়া তাঁহার যে পবিত্র নাম এই পুণ্য ভূমিতে ঘোষিত হইবে, তাহার সম্বন্ধে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারে যে কোন গুহ্য রহস্যই থাকুক, তিনি যে কলিকলুষিত জীবগণের উদ্ধার হেতু এই সংসারে আবির্ভূত

হইয়াছিলেন, আপাততঃ পক্ষে ইহাই আমার বুঝিবার বিষয় হউক। তিনি যে পাপীদিগের উদ্ধার সাধনার্থ কঠোর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক জীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীনাম বিতরণ করিয়াছিলেন, তিনি যে পতিত জীবগণের দুরাবস্থা অবলোকনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অতি দীন ভাবে ভ্রমণ করতঃ তাহাদিগের মলিনতা দূর করিয়াছিলেন, গৌরভক্তবৃন্দ! ইহাই যেন আমি প্রগাঢ় সবল বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তাহা হইলে আমি পবিত্র এবং নির্ম্মল চিত্ত হইয়া তাহার শান্তিপ্রদ চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব, আমার অন্ধকার হৃদয় প্রদীপ্ত প্রেমালোকে উদ্ভাসিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের আমি বড় প্রিয় হইয়াও আমি তাঁহার প্রিয় হইতে পারিলাম না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়; কেননা এই দয়াল অবতার অবলম্বন করিয়া যদি আমি উদ্ধার না হই, তবে আমার ন্যায় পাপীর কি গতি হইবে? তাই সেই পতিতের নাথ, কাঙ্গালের ঠাকুরের শ্রীচরণে যেন অবিলম্বে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে অভিলাষ জন্মে; নতুবা আর আমার আশ্রয় কোথায়?

জীবের মধ্যে শ্রীনাম প্রচার দ্বারা তিনি শ্রীভগবানকে উপাসনা করিবার এক সরল উপায় আপামর সাধারণের নিকট আবিষ্কার এবং প্রচার করত জগতে কোন অভিনব প্রসিদ্ধি রাখিয়া গিয়াছেন —আজ বঙ্গভূমিতে সংকীর্ত্তনের ধ্বনি, নামোচ্চারণে অপূর্ব্ব প্রেমোদয়, অভিমান শূণ্যতা সেই প্রসিদ্ধির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যে প্রেম বন্যায় এক সময় নদিয়া শান্তিপুর "ডুবু ডুবু" হইয়াছিল,—

"শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।"

এখনও যে তাহার কথঞ্চিৎ উচ্ছাস দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে। বঙ্গভূমির যে স্থানে গমন করুন, সায়ংকালে মৃদঙ্গ করতালধ্বনি আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় উৎফুল্ল করিবে। সুমধুর হরিনাম ধ্বনি, ভক্তের প্রেমোল্লাস, সর্ব্বদা বিজলির ন্যায় সর্ব্বত্র খেলিতেছে; ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপূর্ব্ব মহিমা—সুখসাধ্য শ্রীনাম গ্রহণরূপ

উপাসনা সর্ব্বদা সকল শ্রেণীয় অধিকারী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

আজ নবদ্বীপবাসী নবদ্বীপচাঁদের জন্মোৎসব স্মরণ করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসমান। সেই ভুবন-পবিত্র-কারী নদিয়ার দুলাল নদিয়া আলো করিয়া এই শুভ দিনে ফাল্গুনি পূর্ণিমা তিথিতে হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির ভিতর আবির্ভাব হইয়াছিলেন স্মরণ করিয়া গৌর প্রিয় ভক্তগণ মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন। আজ বহু ভক্ত সমাগমে এক অপূর্ব্ব শোভায় শ্রীনবদ্বীপ ধামের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রিয় ভক্তগণকে অবলোকন করিয়া আনন্দহেতু আজ নবদ্বীপচন্দ্রকেও কত সুন্দর দেখাইতেছে। আর ভক্তগণ, তাহাদের অতি আদরের বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে তৃষিত নয়নে শত শত বার দ[illegible]িয়াও তৃপ্ত হইতেছেন না। কেহ বলিতেছেন, "দেখি দেখি আমার গোরা চাঁদের মুখ খানি"। কাহারও প্রভুর চাঁদ মুখে অর্পিত নয়ন অশ্রু-ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। আজ গৌরপ্রাণ ভক্তগণের বড়ই আনন্দের দিন। ভক্ত ও ভগবান একত্র মিলিত, পরস্পরের ভাবের উচ্ছাস,—আহা! কি মধুর, দোঁহে দোহার পানে চাহিয়া চাহিয়াও তৃপ্ত হইতেছেন না। সেই চাহনি কত মধুর, কত ভাব ব্যঞ্জক, তাহা দ্বারা উভয়ে উভয়ের প্রতি কত কথাই প্রকাশ করিতেছেন। ভক্তগণ শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ভূমিতে "গড়াগড়ি" দিতেছেন আর প্রেমানন্দে ভাসিতেছেন। "জয় নবদ্বীপ চন্দ্রের জয়, জয় নিত্যানন্দ প্রভুর জয়" ইত্যাদি ধ্বনিতে শ্রীমন্দির পরিপূরিত।

মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীধাম নবদ্বীপে সমাগত হইয়াছে। নবদ্বীপ মহাপ্রভুর জন্মস্থান। নবদ্বীপ নটবর শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ভূমি। জাহ্নবী বিধৌত নবদ্বীপ জ্ঞান চর্চ্চানুরাগী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াও আজ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রসাদে ভক্তগণের নয়নে যমুনা প্রবাহিত ব্রজভূমি রূপে প্রকাশিত। ব্রজের সমস্ত লীলা মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নিজগণের সহিত

পুণঃ প্রকটিত করত ভক্তগণের হৃদয়ে ব্রজরস নবভাবে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বাসুঘোষ একটী পদে বর্ণনা করিতেছেন,—

বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধনীরে করিল॥
ফুল বন দেখি বৃন্দাবনের সমান।
সহচরগণ গোপী সম অনুমান॥
খোল করতাল গোরা সুমেল করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাস রস গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশ॥

সেই নিমিত্ত শ্রীনবদ্বীপ ধামের মাহাত্ম্য ভাবুক ভক্তগণই জানেন, এই অধমের পক্ষে তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। নবদ্বীপ পরিভ্রমণ কালে কতক গুলি প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান হয়, সেই সকল এক সময় প্রসিদ্ধ আখড়া ছিল, কিন্তু এক্ষণে নানাবিধ অভাব কতৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারা লুপ্তনাম অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক একটী বট বৃক্ষ অদ্যাপিও বর্ত্তমান।

শ্রীধাম নবদ্বীপে মহা প্রভুর মন্দিরই সর্ব্ব প্রধান। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু প্রিয়া দেবী কতৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কীর্ত্তিত। মহা প্রভুর এরূপ অনুরূপ প্রতিমূর্ত্তি আর দেখা যায় না। কথিত আছে, শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত হইলে পর পতিপ্রাণা শ্রীবিষ্ণু প্রিয়া তাঁহাকে বেশ ভূষা পরিধান করাইয়া স্বামীভ্রমে লজ্জিত হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীমূর্ত্তি ভক্তগণের নিকট প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ প্রকাশিত নহে, তাহা মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ জীবন্ত মূর্ত্তি। ভক্ত ও ভগবান উভয়ে নয়নে নয়ন স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিত, উভয়ে উভয়কে গাঢ় অনুরাগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন। আহা! কি মধুর দৃশ্য! ভক্ত! কৃপা করিয়া আমাকে তোমার দাসানুদাস হইতে যোগ্যতা দাও, তাহা

হইলে আমি তোমাদের এইরূপ মধুর মিলন দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।

শ্রীধামে এতদ্ব্যতীত অনেক আখড়া এবং মন্দিরাদি আছে। কোন স্থানে মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ বিরাজ করিতেছেন, কোন স্থানে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ মূর্ত্তি, কোথায় মহা প্রভুর বিবাহোৎসব, কোথায় বলদেব মূর্ত্তি, শ্রীবাসের মন্দির, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের মন্দির, কোথায় জগাই মাধাই উদ্ধার ইত্যাদি অনেক শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি অবস্থান করিতেছেন। কলিকাতার আখড়ায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব এবং নিত্যানন্দ প্রভু একত্র অবস্থিত। একটী ভাই প্রেমের আধার, আর একটী ভাই সেই আধার হইতে প্রেম গ্রহণ পূর্ব্বক সকলকে তাহা দান করিয়া প্রেম দাতা। একটী ভাই অনুরাগ ভরে থর থর কাঁপিতেছেন, মুখে কথা সরে না, নয়নে সর্ব্বদা অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, আর একটী ভাই আনন্দে জীবগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যেজন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে॥

দুটী ভাই জীব উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ দুটী ভাই করুণার পারাবার, দুটী ভাই কাঙ্গালের ঠাকুর, অনাথ শরণ। হায়! কবে আমার সেই শুভ দিন হইবে যে দিন শ্রীশ্রীগৌর নিতাইয়ের চরণে প্রাণ মন বিকাইতে পারিব। কলিপাবনাবতার, প্রেমভক্তির শিক্ষাগুরু যুগল ভ্রাতার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক আমি বিষয়ান্তরে উপস্থিত হই।

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

উৎসব সময়ে শ্রীনবদ্বীপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আখড়ায় কীর্ত্তন সঙ্গীত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের অনেক বিখ্যাত কীর্ত্তনিয়েরা

আসিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মুখে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা শ্রবণে ভাবুক ভক্তগণ বিমোহিত হন। এই উপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপে বহু ভক্ত সমাগম হেতু সাধুদর্শন এবং তাঁহাদিগের সঙ্গ লাভের প্রকৃষ্ট সময়। তাঁহাদিগের ক্ষণিক সঙ্গলাভ আমার ন্যায় বিষয়াসক্ত চিত্তও মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও পরিবর্ত্তিত হয়। সকলেই বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি, দীনভাবে সকলের চরণে পতিত হইতে ব্যগ্র, সকলের গোরানামে নয়নে অশ্রু প্রবাহিত, আনন সরলতার ছবি। ঔদ্ধত্য প্রকৃতি তাঁহাদিগের সরল এবং বিনয় পূর্ণ ব্যবহার স্তম্ভিত হইবে। বৈষ্ণব! আপনি এ দীনতা কোথায় শিখিলেন, আমার অভিমানপূর্ণ হৃদয় আপনার বিনয়ের ভাব বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আপনি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবক হইয়া সকলের অপেক্ষা দীন হইতে ইচ্ছা করেন আর আমি বিষয়ের দাস হইয়া মস্তক উন্নত ব্যতীত কখনও নিম্ন করি না। আপনাতে আমাতে প্রভেদ কিরূপ—আমি বিষয় রূপ সর্পের তীব্র দংশনে অহরহ জ্বলিতেছি, আর আপনি অনুরাগে কৃষ্ণ সেবা করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপেক্ষা করিতেছেন। বৈষ্ণব। আমি আর এই নরকের কীট কত দিন থাকিব? আপনারা পতিত পাবনের পার্ষদ, আপনারা পতিত দেখিয়া ঘৃণা করেন না, তাই আপনাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে ভরসা করি এই অধমের মোহান্ধকার দূর করিয়া তাহাকে উদ্ধার করুণ, আপনাদিগের কৃপা ব্যতিত আমার আর কিছুমাত্র ভরসা নাই।

শ্রীভগবান নিত্য লীলাময়, তাঁহার লীলা নিত্য, লীলার সহচর তাঁহার ভক্তগণও নিত্য।

গোবিন্দ শরীর নিত্য তাঁহার সেবক সত্য
বৃন্দাবন ভূমি তেজোময়॥ [প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা]

শ্রীধাম নবদ্বীপে এখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলা করিতেছেন,—

এখনও লীলা করে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

তাই ভক্তগণের শ্রীধাম দর্শনে এত অনুরাগ, শ্রীনবদ্বীপ দর্শন মাত্রেই ভক্তের পুলক নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। আজ সংকীর্ত্তনে কত আনন্দ, কত ভাবের উচ্ছ্বাস—কাহার শক্তিতে?—সংকীর্ত্তন মণ্ডলীর মধ্যে কি যেন বিজলী খেলিতেছে! যে স্থানে হরি গুণানুবাদ, হরি সংকীর্ত্তন, সেই স্থানেই মহাপ্রভুর অধিষ্ঠান। প্রভু হরিনাম শুনিতে, হরি নাম শুনাইতে বড় ভাল বাসেন। হরিনাম তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই তিনি বিবশ হইতেন। কবি চণ্ডীদাস একটা পদে গাহিয়াছেন,—

সখি! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিযা মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

প্রভু সম্মুখে যাহাকে দেখিতেছেন, বলিতেছেন, "একবার হরি বলিয়া আমাকে কিনিয়া লও। আজ সেই জীববৎসল, পতিতপাবন, ভক্তপ্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়া হইযা ভক্তগণ কি এক মুহূর্ত্ত প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হন! সেই নিমিত্ত মহাপ্রভু বহির্জগতে সাধারণের নিকট দৃষ্ট না হইলেও ভক্তগণের হৃদযে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন তাই, ভক্তদর্শনে, ভক্ত সঙ্গের অপূর্ব্ব মহিমা, কেননা ভক্ত তাঁহার হৃদয় স্বামী ব্যতিত এক মুহূর্ত্তও থাকেন না। শ্রীভগবান প্রেমডোরে ভক্তের সহিত বাঁধা। এবং ভক্ত ও শ্রীভগবানে নিত্য সম্বন্ধ, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে লীলা নিত্য। এইরূপ মধুর নিত্য লীলাবদ্ধ ভক্ত ও শ্রীভগবান-কে প্রনিপাত পূর্ব্বক আমি পাঠক বর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করি।

নমো গুরুভ্যঃ করুণার্ণবেভ্য শ্চাদ্যৈত শ্রীবাস গদাধরেভ্যঃ।
সভক্ত বৃন্দৈঃ পরিবৃতেভ্য শ্চৈতন্যদেবেভ্য ইহাস্তু মে নমঃ॥

তাপস।

চাহিনা কখন ভবের জীবন,
চাহিনা থাকিতে সংসার পুরে,
জীবন-কুসুম ফুটেছে যেখানে,
সেই খানে শেষে যাউক ঝুরে।

চাহিনা ভবের সুখ, দুঃখ যত,
জীবন যাপিব জগত ভুলে,
ভগবত প্রেম চাহিয়া চাহিয়া,
পড়ি রব এই তটিনী-কূলে।

বিজন বিপিনে রাহ কুটীর বসতি সহি,
শান্তির পসরা শিরে ধরি;
পাসরি সবার মুখ, ভবের অনিত্য সুখ,
সদা দূর কাননে বিচরি।

কুটীর পবণ শালা, এ আমার সৌধমালা,
সাবণ কুমার সহোদর;
রবি তাপে তরুদল, ছায়া দেয় অবিরল,
কৃষ্ণাজিন পালঙ্ক সুন্দর।

রক্ষক মলয় বায়, মোর সনে সদা ধায়,
মৃগমদ চৌদিকে ছড়ায়;
শিখিনী কিঙ্করী মম, কেশরী সোদর মম,
শিলাতল সিংহাসন প্রায়।
চন্দ্রাতপ মনোহর, উপরেতে নীলাম্বর,
মুকুতা-মালিকা তারাচয়;
কোকিল কুজনে রত, সেই বৈতালিক মত,
জাগায় বচনে মধুময়।
কখন বিটপি শিরে, বসি ধরে ধীরে ধীরে,
—ললিত-সরস-মৃদুতান;
কভুবা নীরবে থাকে, লুকায়ে শ্যামল শাখে,
—যেন যোগে সমাহিত প্রাণ

শ্যামবর্ণ শ্যামা দল, বেড়িয়াছে বাসস্থল,
মরি কিবা নয়ন রঞ্জন!
সুমধুর দ্রাক্ষাআশে, মৃগশিশু আশেপাশে,
সেই মোর তনয় রতন।

কভু কলরব করে, বিহগ আমার ঘরে,
ভাবি তারা আত্মীয় স্বজন;
কভু বা উড়িয়া যায়, নীল গগনের গায়,
পাখশাটে বিদারি পবন।

রসালের শাখা ধীরে, কুটীর উপরে ফিরে,
কপোতের নীড়সে আগারে;
ক'পাত, কপোতী তথা, বসি কহে নানা কথা,
বায়ু তাহা শুনায় আমারে।

প্রতানিনী* নির্ঝরিণী, করিয়া ঝর্ঝর ধ্বনি,
এ কুটীর চুমিয়া পলায়;
তীরেতে বেতস রাজী, শৈবাল চিকুরে সাজি,
নাচিতেছে লহরী লীলায়।

মহামহীরুহ শির, ব্যাপিয়াছে উভতীর,
চূড়া তার পরশে গগণ;
গগন বিতান যেন, স্থাপিত পাদপে হেন,
ফণিশিরে বসুধা মতন।

পার্শ্বে এক সরোবর মরি কিবা মনোহর!
তাল-তরু-ছায়া নীল হেলে;
নলিনী পাত্রেতে জল, পড়ি করে টল্ টল্,
উজল মুকুতা সমজ্বলে।

অই সরসীর জলে, মরাল ভাসিয়া চলে,
হরষেতে হ'য়ে নিমগন;
মিহির লহরী-পর, ছড়া'য়ে আপন কর,
করে তারে হেমের মতন।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

১২ ৫৪০ ১৯১১

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তি ভক্ত্যাঃ পরং পদম॥

নদিয়া নাগরীর পদ।

শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়নের তারা।
জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হার॥
সই লো! কহ না গৌর কথা!
গোরার সে নাম অমিয়ার ধাম, পীরিতি মূরতি দাতা॥
গৌর শবদ, গৌর সম্পদ, সদা যার হিয়ায় জাগে।
কহে নরহরি, তাহার চরণে, সতত শরণ মাগে॥
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া বিরলে বসিয়া রব।
মনের সাধেতে সেরূপ চাঁদেরে, নয়নে নয়নে থোব॥
সখিরে কি বলিস বাণী!
গৌরাঙ্গ ছাড়িতে, যখন বলিবি, তখনি মরিব আমি।
গৌরাঙ্গ চাঁদেরে, পীরিতি পাথারে, সাঁতার এড়িয়া দিব।
মোর মনে লয়, মীন হয়ে তায়, সদাই ডুবিয়া রব॥
শীতল পঙ্কজে, ভ্রমর হইয়া সদা মধু পিব তায়।
পিপাসা যাইবে, পরাণ জুড়াবে, দাস লোচন গায়॥

কর্ম্মযোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

(উপাসনা—আত্মচিন্তা ও প্রার্থনা।)

এই সংসারে যাবতীয় পাপকর্ম্মের একমাত্র মূলীভূত কারণ আত্মাভিমান এবং তৎপ্রসূত অনন্ত কামনা কর্তৃক জর্জ্জরীভূত আমাদিগের চিত্তকে ভগবদ্ভাবে অভিষিক্ত করিবার উদ্দেশে কিরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন এই পরিচ্ছদ হইতে তৎসম্বন্ধে আমরা যথা-সাধ্য আলোচনা করিব। অনুষ্ঠানের (*) উদ্দেশ্য কি? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্॥

শ্রীহরির আরাধনা যদি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, অথবা হরি আরাধনা যদি তপস্যার অর্থ না হয়, তবে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ তপস্যার অর্থই হরি আরাধনা। এবং হরি-আরাধনা-পরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহার সৃষ্ট জীবের চিরশত্রু আত্মাভিমান এবং কামনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। অতএব হরি আরাধনা অথবা রিপুদমনার্থ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। অনুষ্ঠান ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না।

"বিনা চোপাসনাং দেবি দদাতি ন ফলং নৃণাম্।"

আমাদিগের এই অনুষ্ঠান ত্রিবিধ উপায়ে নিষ্পন্ন হইতে পারে, যথা, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, উপাসনাকালে মনই আমাদিগের প্রধান অবলম্ব্য, নতুবা অন্য বিষয় ভাবনাক্রান্তচিত্তে মানসিক অনুষ্ঠানের কথা দূরে থাকুক, কায়িক বা বাচনিক কোন উপাসনাই হইতে পারে না। শ্রীভগবান ভাবগ্রাহী এবং অন্তর্যামী—আমাদিগের হৃদ্গতভাব কোন সময়েই তাঁহার অবিদিত নহে। অথচ মানসিক ক্রিয়ার সহিত সম্পূর্ণ

---

* উপাসনান্তর্গত কার্য অর্থে অনুষ্ঠান শব্দ ব্যবহৃত হইল।

বিযুক্ত হইয়া কোন কায়িক বা বাচনিক অনুষ্ঠান অসম্ভব; উপাসনাকালে যখন কোন অনুষ্ঠান প্রকাশ্যরূপে শরীর কিংবা বাক্য অবলম্বনে সম্পাদিত হয় তখন তাহা সেই সেই উপাধি ধারণ করে; এবং ইহাই উপাসনার পৃথক পৃথক নামকরণ হইবার কারণ। এক্ষণে এইস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, শুদ্ধ মানসিক অনুষ্ঠান কিরূপ। কায়িক এবং বাচনিক ব্যাপার ব্যতীত মানসিক অনুষ্ঠান হইতে পারে কি না, এই বিষয় আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে তাহাও সম্ভবপর নহে। তবে যখন উপাসনা কোন বহিরিন্দ্রিয় আশ্রিত না হইয়া সম্পাদিত হয়, তাহাকেই শাস্ত্র মানসিক অনুষ্ঠান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে উপাসনা কালে ত্রিবিধ উপায়ই অবলম্বনীয় হয়। শ্রীবিগ্রহ মুর্ত্তি দর্শনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করাকে কায়িক উপাসনা বলা যায়, কিন্তু ইহার সহিত যে ভক্তের মনোভাবের একতা নাই, অথবা তিনি ভগবচ্চরণে প্রণাম করিতে করিতে বাচনিক উপায়ে তাঁহার কৃপার্থী হইলেন না একথা স্বীকার্য্য নহে। আমরা নিষ্কপট অন্তঃকরণে শ্রীভগবানের উপাসনা করিব, এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া সাধিত হউক না কেন তাহা নিশ্চয়ই অভিলষিত ফলপ্রদ হইবে। মানসিক অনুষ্ঠান যে অতীব শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই; হৃদয়ের সহিত তাঁহার আরাধনা করিলে ভাবময় শ্রীহরির প্রীতি আশু লাভ করা যায়। প্রসঙ্গানুযায়ী কোন ভক্তের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করি। বৃন্দাবনবাসী জনৈক দরিদ্র হরিপরায়ণ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ যমুনায় স্নানান্তে মানসিক উপায়ে তাঁহার হৃদয়াধিপতি শ্রীহরি বৈকুণ্ঠনাথকে নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করতঃ নিভৃত মনোমন্দিরে বসাইয়া ভোজন করাইতেন। একদা সেবাপরায়ণ ব্রাহ্মণ ধ্যানাবস্থায় ঠাকুরের নিমিত্ত পরমান্ন প্রস্তুত করতঃ উপবেশন কালে যেমন পায়সপাত্র ধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিবেন অমনি পরমান্নে অঙ্গুলি সংযোগ বশতঃ উষ্ণতা নিবন্ধন তাহা

দগ্ধ অনুভব করায় পায়স অপবিত্র হইয়া ঠাকুরের অগ্রাহ্য হইল এই মনোবিক্ষেপ বশতঃ ধ্যান ভঙ্গ হইলে, দেখিলেন সত্য সত্যই তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুলিটী দগ্ধ হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইল, বৈকুণ্ঠপতি লক্ষ্মী সহ ভক্ত সন্নিধানে আগমন করত তাঁহাকে দিব্য রথোপরি আরোহণ করাইয়া নিজলোকে লইয়া গেলেন।

তথাপি মানসিক অনুষ্ঠানের উৎকৃষ্টতা উপলক্ষিত হইলেও আমরা কায়িক ও বাচনিক উপায় অবলম্বনে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা করিব ইহা সিদ্ধান্ত করা সম্পূর্ণ ভ্রম। বিশেষতঃ বিষয়াভিমুখী আমাদিগের চিত্ত হরিপদে আকর্ষণার্থ কায়িক ও বাচনিক উপায়ে অনুষ্ঠান অভ্যাস করাই প্রশস্ত; কেননা প্রথম অনুষ্ঠান কালে সম্পূর্ণ মন আমাদিগের অবলম্বন হইতে পারিবে না অতএব যে শরীর এবং বাক্য অবলম্বনে মন সর্ব্বদা বিষয়ভোগে লালায়িত, পূর্ব্বে তাহাদিগকে উপাসনা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে তৎসঙ্গে মনও ক্রমে ক্রমে তাহাতে আকৃষ্ট হইবে, এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু শরীর এবং বাক্যের অধিপতি মন ব্যতীত তাহাদিগকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা অন্যের কেমন করিয়া সাধ্য হইবে? সুতরাং মন ইচ্ছা না করিলে তাহারা অন্য কাহারও অনুমতি ক্রমে উপাসনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইলে আমরা স্ব স্ব চিত্তের অন্তর্গত আর একটী মহতী শক্তির পরিচয় পাই। যে শক্তির প্রভাবে এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শূন্য পথে নির্দ্দিষ্ট রূপে বিচরণ করিতেছে, যে শক্তি যাবতীয় প্রজাপুঞ্জ সৃষ্টি পূর্ব্বক যথা-বিধি পালন করিয়া তাহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে, যে শক্তি জীবগণকে সর্ব্বত্র, সর্ব্বক্ষণ, সকল অবস্থার মধ্য হইতে সেই প্রেমময় শ্রীভগবানের চরণে আকর্ষণ করিতেছে সেই অনন্ত শক্তি বিবেক-রূপে মানবহৃদয়ে বর্ত্তমান। যেমন অসীম তরঙ্গায়িত সমুদ্র বক্ষে

কোন উন্নত স্তম্ভোপরি রক্ষিত একটী উজ্জ্বল কিরণ-বিকিরণ কারী আলোক প্রবল ঝটিকাকর্ত্তৃক অপরিচিত স্থানে নীত অর্ণবপোত-স্থিত পথভ্রান্ত নাবিককে সতর্ক করিয়া সুগম পথে যাইতে ইঙ্গিত করে অথবা দুর্য্যোগ সময়ে গভীর নিশীথে ঘোর অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন বিপদ সঙ্কুল নিবিড় কাননে সহসা অথচ ঘন ঘন আবির্ভূত বিজলি ভয় কাতর পথিককে পথ প্রদর্শন করে, তদ্রূপ এই সংসার সমুদ্র অথবা তমসাবৃত হৃদয় কন্দরে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত আলোক বা চপলার ন্যায় বিবেক মোহাভিভূত জীবগণের নিরন্তর পথ প্রদর্শক স্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে সৎপথে চালনা করিতেছে। চিত্তান্তর্গত যে শক্তি আমাদিগকে উপাসনা কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে সচেষ্ট তাহাই বিবেক নামে অভিহিত হয। বিবেকের আজ্ঞানুক্রমে শরীর এবং বাক্য শ্রীহরির আরাধনায় নিযুক্ত হইলে অবশিষ্ট বহির্মুখাবৃত্তি মন স্বভাবত উপাসনায় অভিভূত হইয়া ক্রমশঃ তাহাতেই আকৃষ্ট হইবে।

এই বিবেক শক্তিই আমাদিগের বিষয়াভিমুখী চিত্তকে পরমার্থ-তত্ত্ব উপদেশ পূর্ব্বক তাহাকে অনিত্য বস্তুর সংযোগ হইতে ছিন্ন করে। এই বিবেক শক্তির প্রভাবে আমাদিগের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যত দিন আমরা মনুষ্য থাকিব তত কাল বিবেক শক্তি আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিবে। চিত্ত যতই কেন বিষয়াসক্ত হউক না, যতই কেন কুকার্য্য করিতে অভ্যস্ত হউক না, মানব হৃদয়ে বিবেকের ক্ষীণালোক সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকে। আলোক নির্ব্বাপিত হইলে মনুষ্য পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিবেক বর্ত্তমান থাকিতে আমরা হতাশ্বাস হইব না। বহু জন্মের পর সাধের মনুষ্য জীবন লাভ করিয়া তাহা অবহেলে হারাইব ?

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ শ্রীমদ্ভাগবৎ॥

বহু জন্মের পর এই সংসারে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। তাহা অনিত্য হইলেও (উপাসনায় ব্যয়িত হইলে) পরমার্থ-প্রদ। সুচতুর ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র প্রকৃত শ্রেয়ঃ লাভ করিতে যত্নবান হইবেন। বিষয়ভোগ সকল জন্মেই হইয়া থাকে, কিন্তু একমাত্র মনুষ্য জীবনেই আমরা পরমার্থ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ইতঃ কোন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি।
দুর্লভং মানুষং জন্ম লব্ধ্বা তত্রাপি পৌরষম্॥

এই সংসারে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা এমন কোন মূর্খ নাই যে পুরুষ কারের সহিত দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে প্রমাদ-যুক্ত হয়। সুতরাং জীবন থাকিতে, হৃদয়ে বিবেক দীপ প্রজ্জ্বলিত থাকিতে আমরা পাপের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইব না। বিবেক সাক্ষাৎ ভগবৎশক্তি(ণ)। যখন পাপ প্রবৃত্তি অতীব প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া আমাদিগের চিত্তকে বশীভূত করিতে প্রয়াস পায় তখন বিবেক নিজশক্তি অনুযায়ী তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পূর্ব্বক ক্ষান্ত থাকে এবং সেই সময় দুষ্ট প্রবৃত্তি তাহার অভিপ্রায় সাধনের সময় বুঝিয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করে। তৎকালে মানব হৃদয়ে বিবেক গুপ্ত অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে বিরাজমান থাকে। পাপকার্য্য সাধিত হইবার পরই পুনরায় সেই ঐশ্বরিক শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এইরূপে চৈতন্যাবস্থায় যখন বিবেকের ক্রিয়া প্রসারিত হয়ত আমাদিগের ঘৃণিত আচরণ স্মরণ করাইয়া মানব জীবনের প্রকৃত শ্রেয়ঃ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দেয় এবং শ্রীভগবানের কৃপায় সেই সদুপদেশে আমাদিগের মতি

ণ ভগবৎশক্তি অনন্ত, কিন্তু মানবহৃদয়ে অনন্ত শক্তিমান বিবেক বিদ্যমান থাকিতে আমরা মোহে জড়ীভূত হই কেন? ইহার উত্তর বিবেকের শক্তিমত্বা আমাদিগের পুরুষকার সাপেক্ষ।

প্রবর্ত্তিত হইলে আমরা ক্রমশঃ অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হই। অথবা বিবেকের আদেশ অবহেলা করিয়া কষ্টে পতিত হইলেই আমরা আত্মচিন্তায় নিয়োজিত হই, আত্মচিন্তায় দীনতা আইসে, দীনতা আসিলে বিবেক পুনরায় হৃদয়ে প্রার্থনার ভাব জাগরিত করে। কোন ধর্ম্মানুরাগী যুবক এক তত্ত্বজ্ঞানী সাধকের চিত্তে প্রার্থনার অবব্যস্থিতা পূর্ব্বাবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সেই মহাপুরুষ যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহার স্থুল মর্ম্ম এস্থলে প্রদান করিলে আমাদিগের উপস্থিত বিষয়ের একটী সুন্দর মীমাংসা হইবে। "জীব ঈশ্বর আজ্ঞা অমান্য করতঃ পাপাচারী হইয়া কষ্টে পতিত হইলেই তাহা দূর করিতে যত্নবান হয়, কেননা আনন্দ তাহার প্রার্থনীয় বিষয়। তখন সে কুকার্যকেই কষ্টের কারণ জানিয়া "হায়! কেন তাহা করিয়াছিলাম" বলিয়া অনুতাপ করে। এবং পুনরায় আনন্দ প্রাপ্তির আশায় জীব আর কখনও অন্যায় কার্য্য করিবেনা বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়। অনুতাপের সহিত আত্মচিন্তা আইসে। এই আত্মচিন্তাই প্রার্থনার অব্যবস্থিতা পূর্ব্বাবস্থা"। এই অবস্থায় আমাদিগের নিজ নিজ পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করি। কিশোরকালের স্ব স্ব পবিত্র অবস্থা স্মরণ করিয়া আমরা অধিকতর অনুতপ্ত হই। যখন সাংসারিক কোন রূপ চিত্র আমাদিগের চিত্তকে অভিভূত করিতে পারিত না। ক্রমে বিষয় সহযোগে এবং সংসারে নানা প্রকার চিত্র দর্শনে চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল, কুটীলতা আসিল, প্রলোভনে মোহিত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হায়! হায়! কেন তখন আমরা সেই সকল প্রলোভনে মজিয়াছিলাম।" "এখন আর সেই বিষয় চিন্তা করিয়া ফল কি?" এই বলিয়া বিবেক আমাদিগকে আশ্বস্ত করে। অনুতাপ ক্রমশই বৃদ্ধি হয়। আমি এক্ষণে অতি অপবিত্র, অধম, বড়ই পাতকী। এই সংসারে আমার ন্যায় অধম, আমার ন্যায় তুচ্ছ বিষয় ভোগ লিপ্সু আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু

আমাকে রক্ষা করিতে কি কেহ নাই, এই বিষম বিপদ হইতে আমার উদ্ধার কর্ত্তা কি কেহ নাই? অনন্য উপায় হইয়া চিত্ত এই সময়ে যেন কাহারও শরণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়। তখন আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নিশ্চয় করি একজন অধমতারণ একজন পতিত পাবন আছেন, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে আমরা এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিব। এবং তদনুসারে আমরা তাঁহাকে কাতর স্বরে ডাকি, কোথায় করুণার সাগর, পতিতপাবন! আমাকে রক্ষা কর, রিপুগণ আমাকে বড়ই তাড়না করিতেছে, আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহারা পলায়, তুমি আসিয়া তাহাদিগকে নিগ্রহ করতঃ আমার অমূল্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিয়া দাও।

শ্রীভগবান জীবের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। কাতরতার সহিত তাঁহাকে ডাকিলে তিনি হৃদয় মন্দিরে উদিত হইয়া আমাদিগকে শান্ত্বনা করেন। শ্রীভগবান করুণার পারাবার, আমরা অলসতা প্রযুক্ত তাঁহাকে আমাদিগের অভাব দুঃখ জানাই না; কেমন করিয়া তিনি সেই সকল নিবারণ করিবেন? তাঁহাকে অনুক্ষণ ডাকিতে হইবে। তিনিই আমাদিগের একমাত্র অভাব-মোচনকর্ত্তা এবং শান্তি প্রদাতা। তাঁহার স্মরণ, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার পূজা আমাদিগের একমাত্র ভাবনার বিষয় হইলে আর আমাদিগের কোন দুঃখ থাকে না। অশ্রু প্রবাহিত নয়নে কাতরভাবে শ্রীভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে হৃদয়ে শান্তি আইসে। কিয়ৎকালের নিমিত্ত সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া আমরা যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে থাকি। কিন্তু এই ভাব ক্ষণস্থায়ী। কিছু সময় পরেই আমাদিগের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করতঃ শান্তিময় শ্রীহরি আমাদিগের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হন।

একবার কোন কারণে মনে আত্মচিন্তার উদ্রেক হইলে আমরা তাহার পোষণে বিশেষ যত্নবান হইব। অনেক সময়ে অভাবনীয়

রূপে আমরা শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র হইয়া তাঁহার ভক্তসঙ্গ লাভ হেতু, অথবা কোন অবস্থায় সহসা নীত হইলে আমাদিগের চিত্তের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, সেই সকল সুযোগ কৃতজ্ঞতা সহকারে স্ব স্ব মঙ্গলের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এক্ষণে আমরা আত্মচিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা করি।

আত্মচিন্তা অর্থে নিজ সম্বন্ধে চিন্তা। আমি কি? মানবদেহ-ধারী হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন সুতরাং যাবতীয় প্রাণি মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটী জীব। অসীম জলধি, অগণন জীব, স্থাবর জঙ্গম বেষ্টিত অনন্ত বিশ্ব সংসার মধ্যে আমিও একটী প্রাণী—তাহাতে সুখ দুঃখ সহন শীল হইয়া বাল্যকালাবধি বিচরণ করিতেছি, কখনও হাসিতেছি, কখনও কাঁদিতেছি! এই আমি কাহাকে ডাকিয়া মনবেদন জ্ঞাপন পূর্ব্বক আপনাকে সুখী মনে করিতেছি, আবার পরক্ষণে কি যেন মোহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভ্রমবশতঃ নিষিদ্ধ কার্য্য করতঃ দুঃখ পাইতেছি। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া এইরূপ নানাপ্রকার অবস্থা মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাবের অধীনে থাকিতে থাকিতে ক্ষণস্থায়ী জীবনের কতক অংশ অতিবাহিত করিলাম; কিন্তু আমি কি, তাহার স্থির হইল না। এদিকে কিন্তু কত সময় পরচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া বৃথা কালক্ষেপণ করিতেছি। আপনাকে জানিতে পারিলাম না, পরকে জানিতে বড়ই সমুৎসুক হই। এই অভ্যাস কবে পরিত্যাগ করিব? দয়াময়! তুমি এই অভাগার একমাত্র সহায়। (প্রার্থনায় আত্মচিন্তা আইসে, আত্মচিন্তায় প্রার্থনা আইসে)।

আমি কি? আমি এই সংসারে থাকিয়া কোন কার্য্য সাধন করিতেছি? অথবা আমার এই সংসারে কর্ত্তব্য কি? আমি কি, কেমন করিয়া বলিব? আমি কি, তাহা আমি কখনও ভাবি নাই। গৃহে থাকি, আহার নিদ্রা করি, বিদ্যালয়ে যাইয়া পাঠ বা কর্ম্মস্থলে কার্য্য করি। আমি যেন কোন যন্ত্রদ্বারা চালিত হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতেছি। ক্ষুধা পাইলে আহার করি, নিদ্রা আসিলে ঘুমাই

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত অধ্যয়ন অথবা পরিবার পোষণার্থ অর্থোপার্জ্জন করি। কিন্তু আমি কি? আমার কি কোন স্বাবলম্বন নাই? যখন যে বৃত্তি উত্তেজিত হয় তখনই তাহার চরিতার্থতায় ব্যস্ত থাকি। অথবা কখনও কখনও অবসর মত ধর্ম্মসভায় যাইয়া হরি সংকীর্ত্তনে যোগ দিই। আবার পরসময়ে কুপ্রবৃত্তির অনুগত হইয়া শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করি। আমি তবে কি, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি যেন সকলের খেলার পুতুল, সকলে আমায় লইয়া খেলার বস্তু করিয়াছে। কিন্তু কষ্ট পাই আমি, যন্ত্রণা ভোগ করি আমি; আর যাহারা আমায় লইয়া খেলা করে তাহারা আমার দুঃখ দেখিয়া হাসিতেছে। (তখন বড়ই কষ্ট হয়, জীব তখন অনুতাপে গলিয়া কাঁদিতে থাকে কেননা জীব অন্তরে বুঝিতে পারে যে তাহাতে চৈতন্যশক্তি, পুরুষকার এবং বিবেক থাকা সত্ত্বেও তাহার মূর্খতা প্রযুক্ত এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। জীব পুনরায় আরও কাতরভাবে প্রার্থনায় নিযুক্ত হয়। "দয়াময়! আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া শ্রীভগবানের চরণে লুটিয়া পড়ে।)

এইরূপ অসংযতভাবে প্রবৃত্তিদাস্য স্বীকার করিয়াও "আমি আমার" ইত্যাকার অভিমান পরিত্যাগ করি না। ইন্দ্রিয়ের পদানত দাস হইয়াও অহংকার করিতে বিরত নহি। মানব জীবনের ইহা অপেক্ষা আর হীনাবস্থা কি? অন্তকরণে সদ্বৃত্তি লুপ্তপ্রায়, বিবেক দীপ নিষ্প্রভ, হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন, পুরুষকার ইন্দ্রিয়াধীনে থাকিয়া ক্ষীণকায়। কিন্তু বহির্জগতের কার্য্য একরূপ চলিতেছে। বাহ্য জগৎ আমার অন্তর্জ্জগতের ব্যাপার কিছুই জানে না। হৃদয় খুলিয়া কাহাকেও কিছু বলিবার নহে, সকলে ঘৃণা উপহাস করিবে। অন্তরের বেদনা কাহাকে জানাইব?—

চিচ্ছক্তি জীবে বর্ত্তমান থাকিতে সে কখনও চিরকাল মোহে অভিভূত থাকিতে পারে না। অতএব চৈতন্য উপহিত জীব কোন

সময়ে না কোন সময়ে সর্ব্বকারণ-কারণ সকলের অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যে মিলিত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে উপযোগী। জীবের স্বরূপ লক্ষণ চিদ্ধর্ম্ম, সুতরাং সুযোগ পাইলেই জীব তাহার চিন্তনে ও অনুশীলনে রত হয়। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিতেছেন,

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ দর্শনে।

শ্রীগুরু চরণাম্বুজ জীবন সম্বল
বন্দি আমি বার বার,
গুরু কৃপা পারাবার
(সদা) পূজি যেন দিয়া পুষ্প ভকতি অমল।
প্রণমিয়া দীন প্রাণে
ভকত বৈষ্ণব গণে
ভাবরে গোবিন্দ লীলা (হ'বে) জীবন সফল॥

(সখি!) পেখনু অপরূপ মিলন।
নবজলধর পাশে যেন বিদ্যুল্লতা হাসে
মরি কিবা সুন্দর শোভন॥
কিবা নয়নে নয়নে দোঁহে দোঁহা পানে
চাহি রহে হসিত বদনে।
কত প্রেমভরে কালা নিরখে কিশোরী বালা
চাতক জলধর যেমনে॥
কেন ত্রিভঙ্গ ঠামেতে বল শ্রীমতী পার্শ্বেতে
দাঁড়াতে ভালবাস নাগর?
রাই অঙ্গ পরশিতে— বাকি নাহিক বুঝিতে—
শ্যাম হে! ছল এ যে তোমার॥

যা, লাগি, বংশীবদন তোমার বংশীবাদন,
সেত দাঁড়ায়ে তোমার বামে।
তবে কেন হে সুন্দর! এখন বংশী না ছাড়,
বিভোর বুঝি হে রাধা নামে॥
হ'য়ো তবে সাবধান, বলি তোমা'হে কিষণ!
বাধা প্রেমে তরঙ্গ আছিল।
না যেযো উজান ব'যে, সখি যতেক কহয়ে
সো প্রেমে তারা সম ডুবিল॥

অপর সখির উক্তি,—

লাজ কি পাইলে শ্যাম! মোদেব কথায়?
দুহুঁ প্রেম প্রস্রবণ মিলন করি চিন্তন,
কত বাধা অতিক্রমি দুহুঁ বেগে ধায়।
কল কল ধ্বনি করি, উছলি প্রেম লহরী,
এক স্রোত বহি যায় কত মহাসুখে।
নীরবে বহেছে আর মিলিবারে সনে তার,
অন্তঃসলিলা হ'যে, পাছে কেহ পেথে॥
মোরা সে নির্ঝর-বাসী স্রোতবেগে তাই আসি
ভাগ্যক্রমে আমাদেরি, সঙ্গমেরি স্থলে।
মলিন অটল কবে, স্নান করি পূত হবে
শ্যাম রাই প্রেম স্রোতে কদম্বেরি তলে॥

তৃতীয় সখীর উক্তি,—

শুনহে শ্যাম! কিশোরীও বিহ্বল প্রেমে।
একা তুমি নহ কালা, মোদেরও নববালা,
তোমার বিরহে রহে মরিয়া মরমে॥
সদাই তোমার ধ্যানে মোহিত তোমার গুণে
বিভোব সে কুলবালা থাকে কালাচাঁদ।
তোমার বংশীর ধ্বনি শুনি হয় পাগলিনী
কি জানি হে? পাতিয়াছ কিবা প্রেমফাঁদ॥
বারি আনিবার ছলে যায় সে যমুনা কূলে
ভেটিবেতোমারে বলে বারেক হে বালা।

ননদিনী বাক্য জ্বালা সহে রাই কুলবালা
তোমা করি ধ্যান, তব নাম জপমালা ॥
কুলবধূ পরনারী তাহারে এমন করি
মজায়োনা শ্যাম! আছে এখন (ও) উপায়।
তোমরা পুরুষ তাই মনে কিছু শঙ্কা নাই
শুন কথা শেষে কিন্তু হবে নিরুপায় ॥

গঙ্গাস্নান-মাহাত্ম্য।

গঙ্গা অতি পবিত্র তীর্থ—ইহা আমাদের দেশে সর্ব্বত্র প্রচার আছে। হিন্দুরা প্রায় সকলেই জানেন যে "সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা," অর্থাৎ গঙ্গাই সর্ব্ব তীর্থের স্বরূপ। হিন্দুদের মুখে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া এই শ্লোকটী সর্ব্বদাই শুনা গিয়া থাকে,

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

গঙ্গায় অবগাহন স্নান করা দূরে থাকুক, কত শত যোজন অন্তরে থাকিয়া যিনি গঙ্গা২ এই নাম উচ্চারণ করেন মাত্র, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস থাকিলে এই দুইটী প্রচলিত ফলশ্রুতিকেই গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য যথেষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। যখন বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হয়, তখন আর সুফলের কোন অভাব নাই। তবে সেই ফলের ক্ষেত্রবিশেষে তারতম্য হইয়া থাকে কি, তাহা সর্ব্বত্রই সমভাবে ফলে ইহা পর্য্যালোচনা করা এই প্রবন্ধটীর উদ্দেশ্য।

গঙ্গাস্নান সকল জাতিতেই করেন। কেহ ভাবেন যে তদ্দারা তাঁহাদের বাহ্যান্তর পবিত্র হইবে এবং ইহপরলোকে সদ্গতি হইবে।

আবার কেহ ভাবেন যে উহা একটী ভ্রমাত্মক সংস্কার মাত্র; স্রোতের জলে স্নান করায় যতটুকু উপকার হয়, তত টুকু উপকার ভিন্ন বেশী উপকারেব কোন সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে ঐ সংস্কারটীব ফলাফল কি তাহাই দেখা যাউক।

পাপ করিলেই তাহার ফল অবশ্য ভুগিতে হইবে; আমরা যত কিছু করি না কেন, একবার পাপ করিলে তাহার আর নিস্তার নাই। যাঁহারা এই বিষয় বাস্তবিক ভাবেন এবং তদনুসারে পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারেন, তাঁহারা অতি পবিত্র ও মহান্। কিন্তু যাহারা অনেক কার্য্য গর্হিত জানিয়াও মোহবশতঃ আবার সেই কার্য্যে লিপ্ত হন, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ বিশ্বাস ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রোধ কবে। পাপ করিয়া ফেলিয়াছি তাহাত অন্যথা করিতে পারিব না, এই হতাশায় পাপানুতপ্ত জীবের হাত পা হারাইয়া যায়, সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মৃতের ন্যায় হয়। সেই স্থলে যদি কেহ সহজ উপায় বলিয়া দিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করেন, তখন সেই জীব আশার সঞ্চারে পুনর্জীবিতের ন্যায় হয় এবং তাহার চেষ্টা আইসে। পাপ করিয়া মুক্তি নাই ইহাও একটী সংস্কার, এবং পাপ করিলে গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয় ইহাও একটী সংস্কার। স্থান বিশেষে দুইটীরই সমান প্রয়োজন। মারি ভয় উপস্থিত, তখন প্রথমতঃ ব্যারামটী না জন্মায় সেইরূপ ঔষধাদির ব্যবস্থা করা উচিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্যারাম জন্মাইলে তাহারও প্রতিবিধান করা আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্র মতে পাপ সকল মানব দেহেতেই আছে। তাহা না থাকিলে দেহধারণ হইত না। পাপ হিন্দুদের পক্ষে একটী মহামারি এবং গঙ্গাস্নান তাহার একমাত্র সর্ব্ব সুলভ মহৌষধ।

কিসে গঙ্গাস্নানে যে পাপ নাশ হয় তাহার অন্য কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাইতে না পারিলেও, অন্ধ বিশ্বাসেও যে অনেক সময় সুচারু ফল ফলে তাহা সকলেই এক বাক্য স্বীকার

করিবেন। এস্থলে যিনি গঙ্গায় স্নান করিয়া তাহাতে প্রবাহিত জলে স্নান করা হইল, এইরূপ ভাবেন, তিনি তাহার ফলে দেহ স্বস্থ হইবে ইহা ভিন্ন অন্য কোন ফল আশা করেন না এবং তাহার মনেও উদয় হয় নাই। কিন্তু যিনি ঐ জল বিষ্ণুপাদ নিঃসৃত বলিয়া শাস্ত্রোক্ত বিশ্বাসে তাহাতে স্নান করেন, তাহার দেহের আরোগ্য শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির সহিত তুল্যই হয়, অধিকন্তু শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তি পাপক্ষয়রূপ একটী পরম আনন্দ উপভোগ করেন যাহা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ভাগ্যে কোন ক্রমে ঘটিতে পারে না। আনন্দ ও মানসিক সুখ যদি পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ সকলেরই প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে যদি ভ্রম বিশ্বাসে ও অধিক সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় তাহাও কদাচ ত্যাগ করা উচিত নহে।

আমরা যে কোন কার্য্য করি তাহা কোন না কোন একটী বিশ্বাস বা ধারণার উপর নির্ভর করিয়া করিয়াথাকি। যাঁহার প্রেত যোনির অস্তিত্বে বিশ্বাস, তিনি অন্ধকারে ভূতের ভয়ে সশঙ্কিত, যাঁহার ঐ অস্তিত্বে অবিশ্বাস, তিনি ভূতের ভয় হইতে মুক্ত। মাংস ভক্ষণ করিলে শরীর সবল হয় আর কিছুতেই সেরূপ হইতে পারে না, আমার এই বিশ্বাস হইলে আমি জীব হিংসা, যে কোন গতিকে হউক, ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিব এবং অকাতরে তাহা ভক্ষণ করিব। কিন্তু যদি আমার বিশ্বাস হয় যে দুগ্ধ মাংস অপেক্ষাও বলকারক এবং মাংস ভক্ষণে যে সকল ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, তাহা দুগ্ধ পানে নাই, তখন সেই বিশ্বাসে আমি মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিব এবং দুগ্ধ পানে রত হইব। এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিশ্বাসই আমাদের সুখ দুঃখের কারণ, এবং বন্ধন মোচন আমাদের যে বিশ্বাসেই হয়, তাহার আর কোন সন্দেহই থাকে না। এই সত্যটী ভগবদ্বাক্যে সমর্থিত হইয়াছে—

"যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"। গীতা—

অর্থাৎ জীবের যেরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস তাহার সত্তাও ঠিক তদনু-

রূপ। গঙ্গাজল পবিত্র মনে কর, তাহার কণামাত্র তৃণাগ্র দ্বারা স্পর্শ করতঃ শৌচ লাভ কবিবে। তাহা না ভাব, গঙ্গা স্রোতে অবগাহন করিয়াও মনের কোন শৌচ আসিবে না। ভগবান যে বলিযাছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজম্যহং।

অর্থাৎ যে যেরূপ ভাবে আমার শরণাগত হয় আমি সেইরূপ ভাবেই তাহাব ভজনা কবি ও কামনা পূর্ণ কবি। এই সত্যটী যে কেবল ভগবান সম্বন্ধে ঘটে তাহা নহে। ইহা নিরপেক্ষ নিত্য সত্য। ইহার প্রয়োগ কার্য্যে সর্ব্বত্র প্রতিনিয়ত করিতেছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহা কখন ভাবি নাই।

গঙ্গাস্নানেব ফলশ্রুতি বিশ্বাসীর পক্ষে যে ফল তাহা বিশ্বাস-মূলক বটে, এবং পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা ঠিক হইলে ধর্ম্ম জগতের ফল বিশ্বাস ছাড়া কোথাও নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মেরও ইহা প্রধান ভিত্তি। মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্টের দেহ ধাবণে ও দেহ ত্যাগে অন্য জীবের মুক্তি কেবল শ্রদ্ধামূলক। তদ্ভিন্ন তাহাতে অন্য যুক্তি খাটে না।

এখন দেখা যাউক গঙ্গাস্নানের যে ফল তন্ত্র মন্ত্রাদিতে নিহিত হইয়াছে তাহা ভ্রমন কি বাস্তবিক যুক্তিসিদ্ধ।

চিন্তামালা।

ভক্ত-সম্মিলন।

ভক্ত-সম্মিলন অনেক ভাগ্যে, অনেক শুভ যোগে ঘটিয়া থাকে। ভাগ্য বলিতেছি এই জন্য যে, ভক্ত সঙ্গে ভবভয়হারী শ্রীহরি প্রগাঢ়ভাবে স্মরণ পথে উদিত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। সে আনন্দের সঙ্গে ক্ষণিক ও তুচ্ছ বিষয়ানন্দের তুলনা হয় না। ভক্ত-সঙ্গে মধুর হরিনাম-চর্চ্চা যাঁহার ভাগ্যে কখন ঘটিয়াছে তিনিই সে আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীশ্রীভগবান শ্রীহরি যিনি সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার হৃদয়ে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়া সৃষ্টিশক্তি অর্পণ করিয়াছিলেন, সকল বেদের সার শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। বাস্তবিক, শ্রীকৃষ্ণই হইয়াছেন জগতের একমাত্র গুরু। জীবকুলকে সংসার হইতে মুক্ত করিবার মহামন্ত্র তিনিই অর্পণ করিয়া থাকেন। তিনি সকলের সঙ্গেই রঙ্গরসশালী; তাঁহার রঙ্গরস, তাঁহার ভক্তের সঙ্গে লুকোচুরি ভাব, ভক্তই কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে সমর্থ। তাঁহার এমনই দয়া যে, যদি সাধনবিহীন ও পুণ্যবিহীন অবস্থাতেও কেহ তাঁহাকে একটি বার মাত্র স্মরণ লইয়া বলে, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে সংসার-সাগর হইতে মুক্ত করিও, আর দুর্দ্দিনে আমাকে দেখা দিও" ভক্ত বৎসল ভগবান তাহাতেই রাজি হইয়া থাকেন। বাস্তবিক, ভক্তের পক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাসীর পক্ষে মুক্তি লাভ করা বিশেষ লোভের সামগ্রী নহে। তাঁহারা জানেন শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই দুর্দ্দিনে উদয় হইরা সুহৃদের কার্য্য করিবেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সুহৃদ্‌জ্ঞানে তাঁহার নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। ভবভয়হারী শ্রীহরি অবশ্যই আমাকে নিস্তার করিবেন, অবশ্য আমার মঙ্গল করিবেন, এই বিশ্বাস করিয়া মঙ্গলামঙ্গলের ভার

তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলে তিনি নিশ্চয়ই সে ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম, যদি কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। শ্রীহরি ভিন্ন একান্ত শ্রেয়ঃ, একান্ত আনন্দ আর কেহ দিতে পারেন না। শ্রীহরির একটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে "হরি, কৃষ্ণ, রাম," প্রভৃতি তাঁহার নাম গুলিও অশেষ পাপ দহনে ও অপূর্ব্ব আনন্দ প্রদানে সমর্থ। "হে হরে, হে দীনবন্ধো! হে শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিলেও হৃদয়ে এক প্রকার শান্তিময়ী আনন্দ শক্তির উদয় হইয়া থাকে। ভক্ত সঙ্গে দয়াল ভগবান শ্রীহরির চর্চ্চা উদয় হয় বলিয়াই ভক্ত সঙ্গ এত মধুর বোধ হয়। শ্রীহরির চর্চ্চা শ্রীহরির সেবা ও পূজা করিয়া যে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহাই ভগবদ্ভক্তি বা ভগবদ্ভাব। ভক্তগণের তাহাতেই রুচি, তাঁহারই সেবা দ্বারা ভক্তগণের জীবন পুষ্ট হয়। বৈষ্ণবমুখে ধামচন্দ্র প্রসঙ্গে শুনিয়াছিলাম "ভক্তগণের আহারই হইয়াছে হরিনাম" ভক্ত সম্মিলনে এ কথার বেশ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভক্ত সঙ্গে ভক্তবৎসল দয়াময়ের নাম গানে যে আনন্দ সুধা উত্থিত হয় তাহাই ভক্তগণের জীবনোপায়, বা সেই ভাবে ভক্ত জীবন গঠিত হয়। ভগবদ্ভাব যে স্থলে বিপুল পরিমাণে উদ্দীপ্ত হইয়া বিষয়ভাব রঞ্জিত কলুষিত চিত্তকেও অন্ততঃ ক্ষণ-কালের জন্যও আনন্দসাগরে নিমগ্ন করে সে স্থলকে শ্রেয়োজনক আনন্দজনক ও মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হয়, আমরা বেশ বলিতে পারি ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দ উপস্থিত হয়। তথায় জাতিগত কিম্বা ব্যক্তিগত কোন ভেদাভেদ থাকে না। এখানে সকলেরই উদ্দেশ্য একই। সকলেই সেই পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইয়া অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও ভক্তির বিশুদ্ধ আনন্দ উপলব্ধি করিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য। সকলে একপ্রাণে মধুর কণ্ঠে তানমান সহযোগে যখন ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য গীত করিয়া থাকেন, তখন বোধ হয় কাহারও প্রতি আর কাহারও দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, সকলেই

একই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ইহসংসারে আসিয়াছেন সকলেই একই পিতা ও মাতার সন্তান। সকলেই একই পথে আসিয়াছি ও একই পথে যাইতে হইবে। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী অবস্থাই আত্মার শেষ নয়। জন্ম ও মৃত্যুর বিধানকর্ত্তা একজন কেহ আছেন। এস সকলে আমরা সেই ভক্তি ও প্রেমানন্দকারী শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার মধুর নাম গানে প্রবৃত্ত হই। অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও বিপরীত ভাবনা ভুলিয়া যাই। হরি রস-মদিরা বিপুল পরিমাণে পান করিয়া অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও বিষয় জ্বালা বিস্মৃত হই। শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই। কীট পতঙ্গাদি হইতে পিতামহ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেরই পিতা ও চেতনদাতা, গুরু ও ভর্ত্তা। ভগবদ্ভাব যাহার হৃদয়ে যে আকারেই থাকুক, হরিনাম করিতে কাহারই মানা নাই। দয়াল শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণের এমনি নামের গুণ, যে তাঁহা সকলকে পবিত্র করিয়া থাকে। জাতিগত কিম্বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মগত কোন ভেদাভেদ শ্রীশ্রীহরি নামের নিকট নাই। গুণের বিচার করা দূরে থাকুক অনিচ্ছাতেও যদি শ্রীভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হয় তথাপি সদ্গতি দিয়া থাকেন। যাঁহার নামের গুণ এত, মহাপাপীকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ, কোন্ মূঢ় তাঁহাকে প্রাণের কিঞ্চিৎ ভালবাসিতে রাজি না হইবে? বিষয়ে মত্ত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া আপনাকে অমর জ্ঞানে যতই নাচিয়া বেড়াও, মরিতে নিশ্চয়ই হইবে। ভাই সকল! বল দেখি আমরা দিনের মধ্যে তাঁহাকে কতবার ডাকিয়া থাকি। আর নাস্তিকভাবে জীবন কাটাইবার প্রয়োজন নাই। জীবন চঞ্চল হইলেও আইস, সৎসঙ্গরূপ নৌকারোহণে হরিপ্রেমের সারি গাহিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের জয় দিয়া মহাপথের পথিক হই। যে পথে জন্ম মৃত্যু নাই, জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, অথচ নিরাপদ ও শান্ত, এস সেই পথে অনন্ত জীবনের গতি ফিরাইয়া দিই। ভক্ত সঙ্গে এই সকল ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া অনন্ত আনন্দ প্রদান করে। কি

জ্ঞানী কি ভক্ত সকলেই সৎসঙ্গের আবশ্যকতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—ভগবদ্ভাব লাভ করিতে হইলে, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিতে হইবে। শাস্ত্র বর্ণিত ভগবদ্ভাব যখন মনুষ্য জীবনে পরিণতি লাভ করে, তখনই তাহার প্রকৃত শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে। পুণ্য সলিলা গঙ্গা যেমন দর্শন ও স্পর্শন মাত্রে পবিত্র করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্ত সেইরূপে পবিত্র করিতে পারেন। শাস্ত্রবর্ণিত ভগবদ্ভক্তি ভগবদ্ভক্তে স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় তেজে সকলকেই পবিত্র করিতে পারেন। ভাই সবা!

'হরিরসমদিরামদাতিমত্তা ভুবি লুঠাম নাম নির্ব্বিসাম'।

বলিয়া শুধু মুখে চীৎকার করিলে হইবে না প্রকৃত সেই অবস্থা আনা চাই। তাই বলিতেছিলাম, এস, আমরা ভক্তগণসহ মিলিত হইয়া হরিনাম-রস পান করি। মনোমালিন্য আপনা হইতে বিদূরিত হইয়া অপার আনন্দ উপস্থিত হই।

বিপদে মধুসূদন

সহৃদয় পাঠকবর্গ! আজ কিছুকালের জন্য আপনাদিগের সময় নষ্ট করিতে বসিয়াছি। আপনাদিগের মত ভক্তগণের নিমিত্ত কিছু সদ্বিষয় লিখি এরকম ক্ষমতা আমার নাই, তবে এই ধৃষ্টতা কেবল মাত্র বন্ধুদিগের অনুরোধে পড়িয়া করিতে বসিয়াছি। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ ভরসা মাত্র; যদি আলোচনা করিতে করিতে সদালোচনা হইয়া পড়ে তাহা কেবল তাঁহারি কৃপায়, তা'না হইলে আমার সাধ্যাতীত।

আজ হইতে ঠিক তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার জীবনের এক রাত্রির ঘটনা আপনাদিগকে বলিব। চাকরি উপলক্ষে তখন আমি

দ্বারবঙ্গ প্রদেশের মনকাটা নামক স্থানে থাকিতাম। নিজে একটী তাঁবুতে থাকিতাম, আর ঘোড়া ও চাকরদিগের নিমিত্ত একটি ছিটে বেড়ার মেটে ঘর করাইয়া লইয়াছিলাম। রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপের জন্য একটী আঁব বাগানে তাঁবু ফেলা হয়, মেটে ঘরটীও তাহার অল্প দূরে আঁব বগানেরই মধ্যে। গ্রাম অল্প দূরে। রাত্রিতে শুইয়া রহিয়াছি। ক্রমশঃ খুব ঝড় উঠিল ও মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এ রকম দুর্যোগে পাকা কোঠা বাড়িতেই দরজা জানালা প্রায় ভাঙ্গিয়া যায়, আমার কাপড়ের ঘর টিকিবে কতক্ষণ? বন্ধনের দড়ি অনেকগুলি ছিঁড়িয়া গেল ও ঝড়ের বিজয় পতাকা স্বরূপ আমার তাঁবুটী তখন উড়িতে লাগিল! অনন্যগতি হইয়া পূর্ব্বোক্ত মেটে ঘরে গিয়া তখন আমি আশ্রয় লইলাম। বলা বাহুল্য আলো সমস্তই নিবিয়া গিয়াছে, আর আমার কাপড় সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছে। অন্ধকারে হাতড়াইয়া চাকরদিগের একখানি কাপড় লইয়া আমি পরিলাম। তাহারাও দুর্যোগে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া সকলে এক সঙ্গে বসিয়া দুর্যোগের বিষয় বলা কওয়া করিতেছিল। আমিও তাহাদের কাপড় খানি পরিয়া সেই খানে বসিলাম।— মানুষের সাড়ে পোনেরো আনা ভাগই অভিমানী, কিন্তু বিপদে পড়িলে আর সে অভিমান থাকে না।—বাজে কথা যাক্। সবে মাত্র কাপড় ছাড়িয়া বসিয়াছি আর মড় মড় করিয়া একটী শব্দ হইল ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও ঘর চাপা পড়িলাম। মাটি থেকে আমাদের আর অল্পমাত্র ব্যবধান ছিল! সকলের অর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম কিন্তু একজনের কোনই সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ভাবিলাম বুঝি তাহার ইহ জগতের খেলা ঐ রূপেই ফুরাইল। পাঠক! একবার সেই সময়কার আমাদের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন দেখি।

"মাতা পিতা রহিল কোথা কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণপ্রিয়া রহিল কোথা, বন্ধু সকলে?"

এই গানটীই তখন মনে হইবে।

ঘোর পাষণ্ড আমি—জগাই মাধাই কোন ছার—ভুলে ও কখন পরমেশ্বরেব নাম করি নাই। কিন্তু বিপদের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যে কাজ আমি কখন করি নাই বাধ্য হইয়া আমি তখন তাহাই করিলাম। নিজের অবস্থা স্মরণ হইল। বিপদ থেকে উদ্ধার হইতে তখন আমার যে কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই তাহা স্পষ্ট বুঝিলাম। বুঝিয়া প্রাণপণে শ্রীহরিকে ডাকিতে লাগিলাম; আমার জীবনে সে বড় সুখের সময়, সে রকম কবে আর কখন আমি ঈশ্বরকে ডাকি নাই। দয়াল তিনি, পতিতপাবন তিনি; তাঁহার ত' আমাব মতন অভিমান নাই। পূর্ব্বে কখন ডাকি নাই বলিয়া যে তিনি চুপ করিয়া থাকিবেন তাহা নহে। যে জন্য আমি ডাকিলাম তাহা সফল হইল। বিদ্যুৎরূপে তিনি আসিয়া আমাদের উদ্ধারেব পথ দেখাইয়া দিলেন। দেখিলাম আমার ঘোড়াটী ঘাড নত করে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার পৃষ্ঠে চাল পড়িয়াছে, তাহার পার্শ্বে যে ফাক টুকু রহিয়াছে তাহার ভিতর দিয়া যাওয়া যায়। মুচড়াইয়া পড়াতে চালের বাতা অল্প পরিমাণে সরিয়া গিয়াছে, এই ফুকরের ভিতর দিয়া কোন মতে কষ্ট স্বষ্টে বাহির হইতে পারা যায়। আর বিলম্ব করিলাম না, 'জয় হরি' বলিয়া সেই পথে বাহিব হইতে উদ্যত হইলাম। বাহির হইবার সময় গাছের ডালে পিট ছড়িয়া গেল, কত স্থানে রক্ত পড়িতে লাগিল; কিন্তু তখন তাহাতে কি আসে যায়। যে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলাম, তাহার নিকট ইহা কিছুই নহে। বৃষ্টি তখন বন্ধ হয় নাই। গ্রামাভিমুখে ছুটি-লাম। অন্ধকারে কত হুঁচট খাইলাম, কিন্তু ক্ষতি কি? ছুট! ছুট! দুই চারি জনের দোর ঠেঙ্গাইতে২ এক জন গ্রামবাসীর বাটীতে উঠিলাম। দয়া করে সে আমাদিগকে দুখান কাপড় পরিতে দিল। দুই এক জনকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদের কি অবস্থা হইল বুঝা গেল না। অল্পক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিতে লোক জন, কুড়ুল ও আলো লইয়া যাওয়া গেল। দেখিলাম একটী প্রকাণ্ড আঁব গাছ প্রায় দুই হাত পরিমাণ তাহার ব্যাস নির্ম্মূল হইয়া ঘরটীর উপ

পড়িয়াছে। ঘরটী তাহাতেই চাপা পড়ে। ডাল ও চাল কাটিয়া ঘোড়াকে বাহির করা হইল। দেখিলাম তাহার বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছে; খুব বেদনা হইয়াছে, কিন্তু কিছু ভাঙ্গিয়া যায় নাই। আর কাহাকেও সে ঘরে পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে সহিস ও আর একটী লোক আসিয়া পহুঁছিল। তাহারা ঘর থেকে বাহির হইয়া অন্য স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। ঘর চাপা পড়িবার সময় যাহার কোন সাড়া শব্দ পাই নাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে ও দেখিতে২ আসিয়া পহুঁছিল। শুনিলাম সে দরজার নিকট থাকাতে ঘর চাপা পড়িবার সময় ভাগ্যক্রমে পলাইয়া যাইতে পারিয়াছিল। পাঠকবর্গ! এখন কি আনন্দের সময় দেখুন দেখি! দয়াময় হরির কতদূর কৃপা বুঝুন দেখি! ঘোর পাষণ্ড আমি হই না কেন, ত্রিজগতে আমার মত পাপী না থাকুক কেন, একবার যদি ডাকার মতন ডাকিতে পারি, তিনি না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না, যে জন্য ডাকিতেছি তিনি অবশ্য তাহা সফল করিবেন।

তাঁহার দয়ার সীমা নাই! আমাদের জীবনের সব ঘটনা যদি এই ভাবে ভেবে দেখা যায়, তা'হলে পদে পদে তিনি যে আমাদের প্রতি কত দয়া প্রকাশ করিতেছেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়! এমন কোন কার্য্যই হইতে পারে না, যাহাতে তাঁহার দয়া প্রকাশ হয় না। যে কোন কার্য্যই করি না কেন, শ্রীহরির শরণ লইয়া করা কর্ত্তব্য। ইহাতে মনে বল পাওয়া যায় ও আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান ঘুচিয়া যায়। এই জন্যই আর্য্য ঋষিরা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন,—

"ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্।
....
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্॥"

সে সব কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছি, এখন "চাপ না পড়িলে 'বাপ' বলিতে" ইচ্ছা হয় না। এখন কেবল মনে আছে "বিপদে মধুসূদন"।

[গান]।

(১)

এই বেলা জাগ জীব, দিন বহে যায় রে।
প্রতি শ্বাসে আয়ু নাশে, দেখিয়ে না দেখ তায় রে॥
যৌবনের মকরন্দ, মত্ত জীব তাহে অন্ধ।
বিচারে না ভাল মন্দ, সদা পিছে ধায় রে॥
(সদা মেতে রয় রে)
জরা তার অনুচর, দৃশ্য অতি ঘৃণাকর।
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, কেহ নাহি চায় রে॥
জরা যৌবনেতে সম হরি ভর্ত্তা প্রিয়তম।
ভজ শ্যাম সনাতন, কভু ছাড়া নয় রে॥
যে পদ পাইয়ে ভোলা ভুলেছে সংসার জ্বালা।
শ্রীহরি আনন্দ মেলা অন্তিম আশ্রয় রে॥
যখন আসিবে কাল পড়ে রবে এ সকল।
তখন হরি কেবল কোলে করে লয় রে॥

(২)

হরিবল হরিবল হরিবল ভাইরে।
কেন মোহে ভুলে আছ কেহ কারো নয় রে॥
সকলই অনিত্য ধন সুত গৃহ পরিজন।
হরি কেবল নিত্যধন সর্ব্ব জীবময় রে॥
হরি ধ্যানে হরি জ্ঞানে হরি মনে হরি প্রাণে।
বল হরি অনুক্ষণে আর গতি নাই রে॥
হরি পিতা হরি পতি হরি বন্ধু হরি গতি।
হরি গুরু হরি মতি হরিই আশ্রয় রে॥
বল সদা হরি হরি কুবাসনা পরিহরি।
শোক তাপ হারী হরির চরণ আশ্রয় রে॥
পতিত পাবন হরি, অগতির গতি হরি।
দীন জন বন্ধু হরি, হরি বল ভাই রে॥
হরি শ্রীরাধাগোবিন্দ ভাব পাইবে আনন্দ।
হরিনামে প্রেমানন্দ হৃদয় বৃন্দাবনরে॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তি ভক্ত্যাঃ পরং পদম্॥

শ্রীগৌরাঙ্গ।

—:০:—

নবদ্বীপে উদয় করিল দ্বিজরাজে।
কলি তিমির ঘোর, গোরাচাঁদের উজোর,
পারিষদ তারাগণ মাঝে॥

কীর্ত্তনে ঢর ঢর, অঙ্গ ধূলি ধূসর,
হানত ভাব তরঙ্গে।
করে করতাল ধরি, বোলত হরি হরি,
ক্ষণে ক্ষণে রহই ত্রিভঙ্গে॥

বামে প্রিয় গদাধর, কান্ধের উপরে তার,
সুবলিত বাহু আজানে।
সোঙরি' বৃন্দাবন আকুল অনুক্ষণ,
ধারা বহে করুণ নয়ানে॥

আঁখি যুগ ঝর ঝর যেন নব জলধর,
দশনে বিজরি জিনি ছটা।
বাসুদেব ঘোষ গীতে কলি জীব উদ্ধারিতে,
বরিখল হরিনাম ঘটা॥

প্রেমস্বরূপ ও প্রেমদাতা।

ঐ যে আজানুলম্বিত বাহু, প্রেমে ঢর ঢর অঙ্গ, মানবমাত্রেরই চিত্তাপহারী, নয়ন রঞ্জন শ্রীমূর্ত্তি খানি নৃত্য করিতেছেন, উনি কে? উঁহার মুখচন্দ্র হইতে হরি নাম সুধা অনবরত ক্ষরিতেছে। উঁহার কমল-নয়নে সুরধনিধারাপ্রায় প্রেমাশ্রুধারা বক্ষ বহিয়া অবিরল ধারে প্রবাহিত হইতেছে। উনি যেন মানব মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন, উনি কে? ইনি প্রেমস্বরূপ। আর উঁহারই দ্বিতীয় মূর্ত্তি স্বরূপ আর একটী শ্রীমুর্ত্তি উঁহারই পাছে পাছে শ্রীহস্ত প্রসারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন, ইনিই বা কে? মনে হইতেছে, যেন প্রথম শ্রীমূর্ত্তির প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দ্বিতীয় শ্রীমূর্ত্তি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই শ্রীহস্ত প্রসারণ করিয়া নাচিতেছেন। ইনিই বা কে? ইনি প্রেমদাতা। ইঁহাদের রাতুল চরণে আমি অনন্ত দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

এই যে প্রথম শ্রীমূর্ত্তি, ইনি সেই শ্রীনন্দনন্দন, যশোদাজীবন গোপিনীমোহন শ্রীরাধারমণ, রাসরসবিহারী মোহনমুরলীধারী শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। জীবের অত্যন্ত মলিন দশা দেখিয়া, পরমাদরে শ্রীরাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া প্রেমস্বরূপ হইয়া, শচীদুলাল গৌর-সুন্দররূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। আর এই যে দ্বিতীয় শ্রীমুর্ত্তি ইনি উঁহারই অগ্রজ, রোহিণী-নন্দন শ্রীবলরাম, ঐ প্রেম স্বরূপের প্রেম জগতকে বিতরণ করিতে, জীবকে উদ্ধার করিতে, প্রেমদাতা নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জীবের দুঃখে কাতর হইয়া দয়ারসাগর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের ভাব গোপন করিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া কলির কলুষ নাশ করিবার জন্য প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গরূপে গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামে পারিষদগণ সহ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"নটবর বেশ কোথায় লুকাল,
গোপিনী মোহন যে রূপরাশি।
কোথা সে বরণ সুচিকণ কাল,
কোথা সে মধুর মধুর হাসি॥
কোথা হে তোমার সেই পীতধড়া,
জলদেতে যেন তড়িৎ রাশি।
কোথাহে তোমার সে বিনোদ চূড়া,
কোথা হে তোমার মোহন বাঁশী॥
কই হে তোমার সেই গুঞ্জমালা,
কই হে তোমার ময়ূর পাখা।
কই হে তোমার কই বামে হেলা,
যাতে শ্রীরাধার নামটী লেখা?
কোথায় তোমার যমুনা পুলিন,
কোথায় বামে রাই কিশোরী।
কার ভাবে এবে পরিয়ে কৌপীন
নদীয়াতে হ'লে দণ্ডধারী॥
কই হে তোমার সেই বৃন্দাবন,
কই হে সে সব ব্রজের বালা।
কার ভাবে ওহে যশোদা-জীবন,
ত্যজিয়াছ এবে কদমতলা॥
সবে মাত্র চিহ্ন আছয়ে নয়নে,
তাই হে তোমারে চিনিতে পারি।
আর ছলনা হে ক'রোনা এ জনে,
তুমি তো ব্রজের বংশীধারী॥
সঙ্গেতে করিয়ে রোহিণী নন্দনে,
আসিয়াছ হরি জীব তরাতে।
ভাসাইছ ধরা মধুর কীর্ত্তনে,
আনিবারে জীবে ভকতি-পথে॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের মত দয়াময়, শরণাগত-রক্ষক, কি আর আছে? আমরা নিতান্ত অধম, অকৃতজ্ঞ, তাই এমন করুণাময়ের করুণা বারিতে ও আমাদের শুষ্ক হৃদয় আর্দ্র হয় না। তাঁহাদের করুণার সীমা নাই। তাহারা কৃপার সমুদ্র।। শ্রীশ্রীভগবান যিনি ত্রিদশের নাথ, যাঁহার কটাক্ষে সৃজন, পালন ও লয় হয়, সেই রাধারমণ জগৎ-জীবন, বৃন্দাবন বিহারী, নটবর বেশধারী মুরলীবাদনকারী শ্রীকৃষ্ণ কেবল অধম জীবগণের জন্য আজ ভক্তরূপে শ্রীমতী শচীমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শচীমাতার মত ভাগ্যবতী কি জগতে আর আছে? সেই জগদীশ্বর, যশোদাজীবন হরি পুত্ররূপে যাঁহার স্তনপান করিয়াছেন। পরে সেই শচীমাতাকে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ও ভক্তবৃন্দকে অকূল শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ডোর কৌপীনি পরিধান পূর্ব্বক দণ্ড করোয়া হাতে লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করত কাঙ্গাল বেশে জীবের দ্বারে২ যাচিয়া হরি নাম বিতরণ করিয়াছেন। অন্যান্য যুগে শ্রীভগবান বীরাবতারে বীরদর্পে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করিয়াছেন। কিন্তু এই কলিকালে জীবকে অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত দেখিয়া দয়ার সাগর শ্রীভগবান করুণরস বিস্তার পূর্ব্বক, প্রেমস্বরূপ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। করুণাময় প্রেমদাতা শ্রীনিত্যানন্দ প্রহার পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও জগাই মাধাইকে হরি নাম লওয়াইয়া উদ্ধার করিয়াছেন।

"নিতাই যারে দেখেন তারে কন দন্তে তৃণ ধরি,
আমার বিনা মূলে কিনে নাও ভাই বল গৌরহরি।"

আহা! এমন দয়াল কি আর আছে? আমরা কি পাষণ্ড! যে এমন পরম কারুণিক প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করি না। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রীমতী শচীমাতার দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া ভক্তগণ সমক্ষে বলিলেন, যে "মা আমাকে যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব, যদি সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ

করিতেও বলেন, তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি ” মাতার আদেশ শিরোধার্য্য। তখন ভক্তগণ শচীমাতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন,—“যে এইবার আমাদের দুঃখ ঘুচিবে, মা নদীয়ার চাঁদকে নদীয়ায় থাকিতে আদেশ করিবেন।” কিন্তু শচী মাতা বলিলেন, যে “ বৎস। আমি তোমাকে ধর্ম্ম নষ্ট করিতে বলিব না। তুমি নীলাচলে যাইয়া বাস কর। ”—আহা! এত গুণ না থাকিলে কি তিনি শ্রীশ্রীভগবানের জননী হইতে পারিয়াছেন? না তাঁহাকে এত গাঢ় স্নেহে আবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন? শ্রীভগবান আর কাহারও নহেন, কেবল ভক্তের অধীন। তিনি প্রেমময়। যিনি তাঁহাকে প্রেমের সহিত ভজনা করেন, তিনি তাঁহারই হন। সেই জন্যই তিনি শ্রীমতী শচীমাতার বাৎসল্য প্রেমে এত আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও তাঁহার পরম ভক্ত। এক দিন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ঐ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকে বলিয়াছিলেন, “হে দেব! তুমি কে? তোমাকে প্রণাম করি। আমার প্রাণপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ কোথায় গেলেন? তাঁহাকে আনিয়া দাও।” এমন পতিপ্রাণা ভক্তিমতী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ও এমন স্নেহময়ী শচীমাতাকে সেই প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ কাঁদাইলেন কেন? এই অধম, অকৃতজ্ঞ, দুর্বৃত্ত, পাষণ্ড জীবগণের জন্য। হায় এমন কৃপাময়ের শ্রীপাদপদ্মে আমরা আশ্রয় লই না! আমাদিগকে ধিক! যাঁহারা প্রেমের বন্যা আনিয়া জগৎ ভাসাইয়াছেন, যাঁহারা আচণ্ডালে যাচিয়া যাচিয়া নাম ও প্রেম দান করিয়া মহাপাপীকেও উদ্ধার করিয়াছেন, সেই প্রেমস্বরূপ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও প্রেমদাতা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অনন্ত প্রণাম করি।

নমো বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় বিশ্ববিঘ্নবিনাশিনে,
সর্ব্বলোক নিবাসায় হরয়ে লোকসাক্ষিণে ॥
আজানুলম্বিতভুজৌ কণকাবদাতৌ।
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ॥
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥

—*—

বৈধব্য জীবন।

—*—

মানব জীবনে নানাপ্রকার অবস্থা আছে। কিন্তু স্ত্রীজাতির বৈধব্য দশা আর্য্যদেশে ভিন্ন অন্যদেশে সচরাচর দেখা যায় না। বিধবা বিবাহ আর্য্যদেশে সভ্য শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত প্রথা নহে। আমাদের বিধবাগণকে বৈধব্য জীবনের ব্রত সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হিন্দুসমাজাধিপতিগণের একটী বিশেষ কর্ত্তব্য। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাবে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের উপর আধুনিক সভ্যগণের বিলক্ষণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। সেই হেতু যে সকল বিপ্লব কর্ত্তৃক হিন্দু সমাজ আক্রান্ত হইয়াছে তৎসংক্রান্ত আলোচনা করা যদিচ দুঃখজনক তথাপিও সেই সকল প্রসঙ্গ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবেচ্য বিষয় হইলে হিন্দুশাস্ত্রান্তর্গত উপদেশ যে হিন্দু সমাজ পরিরক্ষণের ভিত্তি স্বরূপ, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল আর্য্য বংশজাত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা যে সকলই অনার্য্যোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করি না কেন, চিত্তে যদি আর্য্যশাস্ত্রের উপর অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে কোন না কোন সময় আমরা নিশ্চয়ই আমাদিগের লুপ্ত নাম পুনরুদ্ধার করিব। আর হিন্দু সমাজে যতই কেন বিপ্লব উপস্থিত হউক না, হিন্দুবিধবা তাহাতে

চিরকাল পবিত্রতায় সুষমা বিস্তার পূর্ব্বক তাহা উজ্জ্বল করিবে। সেই হেতু হিন্দু সমাজাধিপতিগণের একান্ত কর্ত্তব্য, যাহাতে হিন্দু বিধবাগণ অক্ষুণ্ণ পবিত্রতার জ্বলন্ত মূর্ত্তি স্বরূপ সর্ব্বদা হিন্দু সমাজে অধিষ্ঠান করত অধিকতর উজ্জ্বল কিরণে তাহা আলোকিত করেন।

পাঠকবর্গ! যদি আত্মসুখ ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করেন তাহা হইলে পবিত্র হিন্দু বিধবার নিকটে আসুন, যদি পর সুখের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদের সমাজে বিধবা জীবনের ক্রিয়া কলাপ নিরীক্ষণ করুন, যদি পবিত্র বিশ্বপ্রেমের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে অনাবিল চক্ষে হিন্দু বিধবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন!—আপনার প্রাণ পবিত্র হইবে, আপনি পবিত্রতার ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারিবেন। যে তুচ্ছ কৃত্রিম ক্ষণস্থায়ী সুখের নিমিত্ত সমগ্র সংসারস্থিত লোক লালায়িত, হিন্দুবিধবাগণ, সেই ক্ষণ ভঙ্গুর সুখকে অকাতরে উপেক্ষা করেন, যে সকল অনিত্য বস্তু লইয়া আমরা মগ্ন থাকি এবং যাহাদের নিমিত্ত আমরা করুণাময় পরম পিতা পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হই সেই সকল হিন্দু বিধবাগণ কখন ভ্রমেও প্রার্থনা করেন না। হিন্দু বিধবাগণ হিন্দুসমাজের শিক্ষা গুরু, একথা শুনিয়া পাঠকবর্গ! আপনারা হাসিতে থাকুন, কিন্তু আমি উচ্চকণ্ঠে অকাতরে বলিব হিন্দু বিধবাগণ জগতকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাহাতে অধিষ্ঠান করেন। যদি সংসারে একটী জীবনের অবস্থান করিবার কোনও সার্থকতা থাকে, তবে প্রত্যেক বিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে হিন্দু বিধবাগণ সমাজের শিক্ষাগুরু, হিন্দু বিধবাগণ পবিত্র বিশ্ব প্রেমের এক একটী নির্ম্মল প্রতিমূর্ত্তি, হিন্দু বিধবাগণ স্বার্থ ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদি নির্ম্মল পবিত্র প্রেম শিক্ষা করিতে চাহ তবে পবিত্র হিন্দু বিধবার দৃষ্টান্ত অনুকরণ কর, স্বর্গীয় দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যদি চিত্ত নির্ম্মল করিতে বাসনা থাকে তবে হিন্দু বিধবাকে

ভক্তি নয়নে নিরীক্ষণ কর, যদি নিঃস্বার্থভাবে পরপোকার করিতে ইচ্ছা কর তবে হিন্দু বিধবাগণের নিকট স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিক্ষা কর। সংসারস্থ প্রত্যেক নর! সাবধানে হিন্দু বিধবার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, সে সংসারের কোন সুখ কামনা না করিয়া শ্রীভগবানের শান্তিপ্রদ চরণাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সাবধান! তুমি তাহার অন্তরায় হইও না, বরং যদি সামর্থ্য থাকে তবে দুই এক কথায় তাহাকে উৎসাহ প্রদান কর, আর যদি নির্ম্মল চিত্তে তাহার স্নেহের পাত্র হইতে পার তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে।

আর বিধবা! তুমি ধন্য, কেননা সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তুমি সেই প্রেমময়কে ভজনা করিতেছ। উপদেশ আছে,—

"ভজিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেম অনুরাগে।"
প্রেম করা ভাল বটে ধূর্ত্তসনে নয়।
কৃষ্ণের সহিত "মীরা" করিও প্রণয়॥

তোমার অবস্থা কৃষ্ণ ভজনা করিতে বড়ই অনুকূল। তোমার জীবন সফল। সংসার সুখ অতীব ক্ষণস্থায়ী কিন্তু আমরা তাহাতেই মগ্ন রহিয়াছি। তাই তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমিও শীঘ্র সেই নিত্যধন কৃষ্ণ ভজনা করিবার উপযোগী হইতে পারি, যেন তোমার মত সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আমি কৃষ্ণ পাদপদ্ম আশ্রয় করি। আমি স সার সুখের নিমিত্ত নিত্যধন হারাইতে বসিয়াছি, আর তুমি নিত্যধনের নিমিত্ত সংসার-সুখ হারাইয়াছ তাহাতে দুঃখ করিও না, কেননা তোমার দুঃখাবসান শীঘ্রই হইবে আর তৎ পরিবর্ত্তে তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া হইয়া নির্ম্মল পবিত্র নিত্য আনন্দের অধিকারিণী হইয়া প্রাণনাথের সেবা করিবে। আর আমরা দিনে২ পাপের গভীরতর কূপে ডুবিতেছি, ক্রমে সেই কৃষ্ণধন হইতে দূরে অতিদূরে তাড়িত হইতেছি, তাই বলি আমাদেরই দুঃখ করিবার কথা শোক করিবার কারণ আছে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তোমরা শ্রীভগবানকে ভজনা করিতেছ আর আমরা

বিষয়ের সেবা করিতেছি। বিধবা! তাই তোমাকে বলি, দুঃখ করিও না পরমানন্দে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা কর, তোমার প্রতি তিনি বড় সদয়।

আপনারা আমাদের শিক্ষয়িত্রী এবং মাতৃস্থানীয়া।

মা! যদি পূর্ব্বকৃত স্বীয়পাপ বৈধব্যজীবনের কারণ মনে কর তাহা হইলে জানিও যে, শ্রীভগবান তোমার প্রতি সদয়, কেননা বৈধব্য জীবন পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইলে তুমি যাহাতে সেই অবস্থায় ধর্ম্মোন্নতি লাভ করিতে পার তাহার নিমিত্ত দয়াময় সর্ব্বদা সচেষ্ট নতুবা কঠিনতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে তিনি (তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত) বাধ্য হইবেন, কিন্তু দয়াময়ের এইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে না যে তুমি ক্রমান্বয় শাস্তি ভোগ কর। অতএব দয়াময় তোমার প্রতি অতি কৃপাবান, এইরূপ বুঝিয়া তুমি তাঁহার বাধ্য হইলে তোমার মঙ্গল নিশ্চয়। শ্রীভগবান তোমার নিকট "অসাধ্য সাধন" প্রার্থনা করেন না, তিনি তোমার নিকট কোন কঠিন ক্রিয়ার সাধন ইচ্ছা করেন না। তুমি তাঁহার শরণ গ্রহণ পুবঃসর তাঁহার "রাঙাপায়ে" আপনার সমস্ত উৎসর্গ কর।

"দেহ মন প্রাণ সব কৃষ্ণে সমর্পিবে।
তাহা হইলে নিত্য ধন কৃষ্ণেরে পাইবে॥"

তোমার ব্রত করিতে আর কোন বিঘ্ন থাকিবে না। তুমি তাঁহার হইলে তোমার ব্রত বিঘ্ন রহিত হইয়া উদ্‌যাপিত হইবে। মা! তোমার ব্রত বাহ্য জগতের নিকট অতি কঠিন বলিয়া প্রতীত হইলেও তোমার নিকট কঠিন নহে, কেননা তুমি যে শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপার পাত্র। শ্রীভগবান প্রেমময়, তিনি সকল জীবকে আপনার ক্রোড়ে স্থাপন করিতে উৎসুক। কিন্তু হায়! আমরা তাঁহার অবাধ্য হইয়া বিপথে গমন করি। তাই করুণার আধার শ্রীহরি আমাদিগকে বিপদে পতিত করিয়া তাঁহার শান্তিপ্রদ নাম, তাঁহার স্নিগ্ধ চারু চরণ কমল স্মরণ করাইয়া আমাদিগকে পাপকূপ হইতে উত্তোলন,

করেন। অতএব বিধবার বিধাতার বিরুদ্ধে অনুযোগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার অপ্রতিহত দয়ার বিষয় প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করা উচিত। এবং তাহা হইলে তিনি সেই দয়াময়ের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক বৈধব্য জীবন সফল করিতে পারিবেন।

আর বিধবা যদি পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহা হইলে তাহার কি গতি হইবে? প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড ভোগের অবসান না হইতে হইতেই পুনরায় পাপে ডুবিলে তাহার উপায় কি? এই বিষয় ভাবিলে প্রকৃতই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বৈধব্য জীবন অসহ্য, তাহার উপর আরও কি কঠিন শাস্তির বিধান হইবে কে বলিতে পারে? ইহাও বিধবার চিন্তা করিবার বিষয়। এবং বিধবা চিন্তাশীলা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার একথা মনে উদয় হইবে।

এই সংসারে নানাবিধ মানসিক বৃত্তির ব্যক্তি বিবিধ প্রকার বিষয় লইয়া আনন্দ প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে। কেহ আহারের পারিপাট্যে সুখ ভোগ করে, কাহারও বেশ ভূষার দিকে অধিক লক্ষ্য, কেহ সংসার সুখে মজিয়া আছে;—কিন্তু সকলেই স্থূল বিষয় লইয়া উন্মত্ত। ভাবের রাজ্যের অধিবাসী একবিধ শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদিগের কোন বিলাসিতা দেখিতে পাওয়া যায় না, কোন পার্থিব বস্তুর প্রতি তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট নহে। হিন্দু বিধবা এই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ভাবের রাজ্যে কি আনন্দ, কি শান্তি বিরাজ করে তাহা বহির্মুখাবৃত্তি সংসারাসক্ত ব্যক্তি কখনও বুঝিবে না। হিন্দুবিধবাগণকে দয়াময় এই ভাব-রাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন সুতরাং সেই শান্তি সুখ-পূর্ণ নগরী তাঁহাদের বাসস্থান, কেহ সহজে তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। বিধবার স্মরণ রাখা উচিত, তাঁহাকে যেমন একদিকে সংসার সুখ বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে সেইরূপ অপর দিকে তিনি শান্তির সহিত শ্রীভগবদুপাসনা করিতে প্রকৃত অধিকারিণী হইয়াছেন। অতএব বিধবার ত্যাগের জীবনে কেহ যেন আসক্তি আনয়ন না করেন।

আর বিধবা যেন কখনও না মনে করেন যে তাঁহার সংসারে থাকা ব্যর্থ বা বিড়ম্বনা মাত্র, এইরূপ ভাবনাপূর্ণ চিত্তে শ্রীভগবানে সরল বিশ্বাস এবং প্রেম অটল থাকিতে পারে না।

—০§※§০—

দুঃখিতের বেদনা।

দুশ্চিন্তা! কত দিনে হারাব রে তোরে?
পারি না ভাবিতে দিবসে নিশাথে,
(আর) বাসনা সহিতে, এ তোর তরে॥

যথা তথা যাই, তোরে ছাড়া নই,
এ কিসে বালাই তুই রে আমার।—
সাথে সাথে র'য়ে, সদা বাদি হ'য়ে,
পুড়ায়ে দিস্ এ সুখের আগার!!

কি সুখ রে তোর শোন কথা মোর,
কত ভাল বাস, নিত কাছে আস,
আমি সে তোমার তুমি কি আমার?
কি বলে এ প্রাণ ক'রেছ সার।
ধর্ম্ম কর্ম্ম থু'য়ে, তোরে সদা নিয়ে,
মিছা মরি ব'য়ে শুধুই ভার!!

আর না ভাবিব,—আর না চিন্তিব,
আর না রাখিব তোরে এ প্রাণে!
নয়ন মুদিয়ে, বিবশ হইয়ে;
রহিব একাই আপন মনে!!—

নতুবা তথায় যাইব চলিয়া,
যথা কল্লোলিনী চলেছে মাতিয়া,
তীরেতে বিহঙ্গ করিছে গান!—
আনন্দে বিভোর মিশায়ে তান,
মরাল ছুটেছে প্রাণের খাবে,
কুসুম ফুটিয়া তা দেখে হাসে,—

অথবা যাইব নিকুঞ্জ তলে,
যেখানে মাধবী,—সুকুসুম দলে!
ফুটিয়া রয়েছে আপন ঠাম!
আসে মধুপান মনের উল্লাসে!
করে মধুরঙ্গ কত গান হাসে,
মলয় অনিল সৌরভ ছুটায়॥—
বসিলে তাহার শীতল ছায়ায়,
হৃদয়ের জ্বালা সব ভুলে যায়!
আঁধার অন্তর হয় আলোময়!
পুরিবে মনের সকল কাম!!

নতুবা যাইব, শৃঙ্গধর যথা,
গাইতেছে সুখে, রুচিময় গাথা;
কাদম্বিনী কুল,—ভ্রমিতেছে কুলে!—
যত দুঃখ তাপ, সব যাব ভুলে!—
সারঙ্গের কুল ভ্রমিছে অদূরে;—
নাহি তথা ভয়,—কেবা কারে ডরে?

ঝলিছে চৌদিকে বিজলি রেখা!
মানবের তুল্য নহে সে প্রকৃতি!
কেমন গম্ভীর— প্রেমের আকৃতি—
মানব সদনে না হয় লেখা!

* * *

এ সৌন্দর্য্য দেখে হৃদয় না মেলে,
যাইব যথায় অন্তর সলিলে,
সরযূ গঙ্গা নদ নদী দলে,
চলেছে সকলে সাগরে মিশি!—
এ বাহ্য-জগৎ না দেখিব চেয়ে,
লুকাইব বেগ—নাহি রব স'য়ে,
মন ব্যথা যত ঢালিব তথায়,
আনন্দ সাগর আছে রে যথায়
শিখিব তাদের তটেতে পশি!

* * *

তুইরে দুশ্চিন্তা, করিবি কি মোর?
বারে বারে তোরে মিনতি করি!
এস না এস না, হৃদয়ে পশ না,
ছুঁয়োনা আমায়—পায়েতে ধরি॥

—:০:—

পৌত্তলিকতা বা প্রতিমা পূজা।

বিধর্ম্মিগণ হিন্দুদিগকে "পৌত্তলিক" বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, "আমরা পুতুল পূজা করি—পুতুল আমাদের দেবতা—আমরা মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, শিলা প্রভৃতি জড় পদার্থের উপাসক—আমরা অতীব হেয়, অতীব অজ্ঞানান্ধ; নতুবা শিলাকাষ্ঠাদিকে দেবশক্তিবিশিষ্ট মনে করিব কেন"? এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা আমাদিগের ধর্ম্মের প্রতিও যথেষ্ট দোষারোপ করিয়া থাকেন। যাহাহউক, তাঁহাদের মতে যখন আমরা "পৌত্তলিক" পদ বাচ্য, এক্ষণে দেখা যা'ক ঐ "পৌত্তলিক" শব্দের যৌগিক অর্থ কি।

"পৌত্তলিক" শব্দটী "পুত্তলি" শব্দের উত্তর দেবতার্থে কণপ্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাঁহারা পুত্তলিকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন তাঁহারাই "পৌত্তলিক"। এই "পৌত্তলিক" শব্দটী আধুনিক; প্রাচীন অভিধানাদিতে এ শব্দ পাওয়া যায় না। অমরকোষ, শব্দকল্পদ্রুম, বাচস্পত্যাভিধানাদিতে এই "পৌত্তলিক"

শব্দ ধৃত হয় নাই। অতএব এই সিদ্ধান্ত স্থির যে, এ শব্দটী প্রাচীন নহে, নব্য সাম্প্রদায়িক বিধর্ম্মিগণ ঘৃণাব্যঞ্জক উক্তিতে সর্ব্বত্র আমাদিগকে অতি নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই অপূর্ব্ব শব্দটী সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ পুত্তলি আমাদের দেবতা নহে। আমরা প্রতিমা পূজা করিয়া থাকি, কিন্তু পুতুল পূজা করি না।

এক্ষণে দেখা যা'ক " পুত্তলি " ও প্রতিমা শব্দে পার্থক্য কি "পুত্তলি" শব্দের অর্থ যথেচ্ছানির্ম্মিত মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতি কৃত মূর্ত্তি বিশেষ। আর প্রতিমা শব্দের অর্থ সাদৃশ্য। প্রতিমা বলিলেই বুঝিতে হইবে ইহার অনুকার্য্য একটী প্রকৃত বস্তু আছে। প্রতিমা শব্দের অর্থ প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ একটী মুর্ত্তির সদৃশ আর একটী মূর্ত্তি। সুতরাং প্রতিমা শব্দে সাদৃশ্য বোধ বর্ত্তমান। সাদৃশ্য শব্দের দার্শনিক অর্থ এই,—"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বং সাদৃশ্যম্" অর্থাৎ দুইটী ভিন্ন পদার্থের মধ্যে যদি অনেক গুলি সমান গুণ বর্ত্তমান থাকে, তবে একটী পদার্থকে আর একটীর সদৃশ বলিতে পারা যায়, কিন্তু দুইটী অভিন্ন পদার্থকে সদৃশ বলা যায় না। ঘট ঘটের সদৃশ এরূপ প্রয়োগ অযৌক্তিক। এই জন্য "প্রতিমা" বলিলেই কাহার প্রতিমা এরূপ প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, ইহা অমুক দেবতার প্রতিমা। সাধকগণ সাধনাবলে সগুণব্রহ্মের নানারূপ গুণাবলির যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে আমাদের শাস্ত্রকারগণ প্রতিমা কল্পনা করিয়াছেন। সাধকগণের ধ্যান ধারণার সহায়তা হইবে বলিয়া এবং ভক্তহৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভূত হইবে বলিয়াই অভীষ্টদেবের প্রতিমূর্ত্তি কল্পিত হইয়া থাকে। নতুবা আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ এতদূর অজ্ঞান ছিলেন না যে, তাঁহারা অনন্ত অপ্রমেয় অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ অতি যৎসামান্য একটী আধারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। নিরাকার নির্গুণের সাধারণতঃ উপলব্ধি হইতে পারে

না বলিয়াই সাকার সগুণ কল্পনা হইয়াছে। এই সাকার মূর্ত্তি নির্গুণ নিরাকারের উপলব্ধির সোপান স্বরূপ।

প্রথমতঃ আমরা দেবতার ধ্যান অনুসারে প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। যোগিগণ প্রত্যক্ দৃষ্টিবলে অভীষ্ট দেবতার যেরূপ মূর্ত্তিতে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, ধ্যান সেই মূর্ত্তিরই নির্দ্দেশক। "সাক্ষাৎ সাধনভূত প্রত্যয় বিশেষো ধ্যানম্।" অর্থাৎ যে উপায়ে দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, এরূপ কতগুলি গুণ সমূহের সমষ্টি বিশেষকেই ধ্যান বলে।

"তত্র অদ্বিতীয় বস্তুনি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য
অন্তরিন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবাহো ধ্যানম্।"

অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণ বৃত্তি প্রবাহকেই বেদান্তসারে ধ্যান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমরা কেবল প্রতিমা সৃষ্টি করিয়াই তাহার অর্চ্চনাদি করি না। তাহাতে তত্তৎ দেবতার প্রাণাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকি। কেবল মৃত্তিকাদি জড় পদার্থের পূজা আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ কোথায়ও উপদেশ দেন নাই। প্রতিমাদি আধার মাত্র, ইহাতে চৈতন্যময়ের আবির্ভাব করিয়া থাকি। শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রদ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া চৈতন্য সম্পাদনে আমরা দেবতার পূজা করিয়া থাকি। সাকার সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক উপাসনা ভিন্ন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা অসম্ভব। বেদান্তসারে উপাসনা শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন, "উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়ক মানসব্যাপার রূপাণি শাণ্ডিল্য বিদ্যাদীনি।" অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক চিত্ত বৃত্তির একাগ্রতারূপ শাণ্ডিল্য বিদ্যার নাম উপাসনা। অতএব দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মের গুণ কল্পনা না করিলে তাঁহার উপাসনা করা যাইতে পারে না। যাঁহার কোন গুণ নাই, কোন মূর্ত্তির কল্পনা নাই, তাঁহার উপাসনা কিরূপে করা যাইতে পারে? নিরাকার নির্গুণ বিষয়ে কিরূপ ভাবনা হইবে তাহা বোধ হয় কেহই ভাবিয়া

স্থির করিতে পারেন না। তবে সেই অতীন্দ্রিয় পদার্থের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা চিত্ত প্রসাদ লাভ হইলে তাহা স্বতঃ প্রকাশ হইয়া যায়। কিন্তু সে কার্য্য বহুকালসাধ্য এবং অতীব কঠোর, এই জন্য আমাদের শাস্ত্রকারগণ প্রথমতঃ আমাদিগকে উপাসনাদি কার্য্য দ্বারা চিত্ত-নৈর্ম্মল্য সাধনে উপদেশ দিয়াছেন। চিত্ত নির্ম্মল হইলে তবে আমরা বেদান্তশাস্ত্রে অধিকারী হইব; অধিকারী হইলে ক্রমে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিব। নতুবা প্রথম হইতেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নির্গুণ নিরাকার চিন্তা করা অতি অসম্ভব ও কষ্টজনক। এই জন্যই আর্য্যঋষিগণ সকলের পক্ষে প্রথমতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে কাষ্ঠ প্রস্তরাদিরই পূজা করিতে বলিয়া যান নাই। আমরা যে সাকার উপাসনা করিয়া থাকি, সে সমস্তেরই চরম উদ্দেশ্য ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি। তবে অধিকারী ভেদে আমাদের পূর্ব্ব মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন যাঁহার মনের গতি যেরূপ, তিনি সেইরূপ পথ অবলম্বন করিলেই মোক্ষলাভ করিবেন; স্বভাবিক মনের গতি অন্যদিকে প্রতিবর্ত্তিত করিতে হইলে বিশেষ কষ্ট হয়। কাষ্ঠময়ী প্রতিমূর্ত্তিই যে আমাদিগের চরম সীমা তাহা কেহই বলিবেন না! যে রূপই ভাবি না কেন, আমাদিগের শেষ সীমা সেই পরম পুরুষ।

যোগিনীতন্ত্রে কথিত আছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তে তথা ফল ভাগিনঃ।”

যে ব্যক্তি আমাকে যে রূপে উপাসনা করে সে সেই রূপই ফল প্রাপ্ত হয়।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

যে আমাকে যে রূপে ভাবনা করে, আমি তাহাকে সেই রূপেই

দর্শন দিয়া থাকি। হে পার্থ! সকল মনুষ্যই আমার পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।

নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা আমাদের শাস্ত্রকারগণ বিলক্ষণ জানিতেন, এবং তদনুসারে অনেক উপদেশও দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে যথা। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।

অর্থাৎ সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে হৃদয় গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈ র্নিয়মৈরলম্।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে।।

একবার সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলে বর্ণাশ্রমাদি সংক্রান্ত বিধিনিষেধাদির আর কোনও প্রয়োজন থাকে না, মলয় মারুত লাভ করিলে আর কে তালবৃন্তের আকাঙ্ক্ষা করে?

তাহার পর শাস্ত্রকারগণ অধিকারী ভেদে সগুণ ও নির্গুণ দুই প্রকার ধ্যান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা শিবার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্।

ধ্যানমাত্মেষ্টদেবস্থ বেদনং মনসা মতম্।
তদপি দ্বিবিধং প্রোক্তং সগুণং নির্গুণং ততঃ।।
আত্মনো হৃদয়াম্ভোজে কর্ণিকাকেশরোজ্জ্বলে।
প্রফুল্লসোম সূর্য্যাগ্নিমণ্ডলেন বিরাজিতে।।
স্বেষ্টদেবং ততো ধ্যায়েৎ তত্তদাগমবোধিতম্।
এবং যদ্বেদনং তদ্ধি সগুণং ধ্যানমুচ্যতে।।
যজ্জীবব্রহ্মণোরৈক্যং সোহহমস্মীতি বেদনম্।
তদেব নির্গুণং ধ্যানং ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ।।

মনের দ্বারা স্বীয় ইষ্টদেবের যে অনুভূতি তাহার নাম ধ্যান।

সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ধ্যান দ্বিবিধ। আপনার হৃদয়ের মধ্যে শাস্ত্রাদিবর্ণিত রূপে স্বীয় ইষ্টদেবের যে চিন্তা তাহাকে সগুণ ধ্যান বলে। জীব ও ব্রহ্ম এক—আমিই সেই পরম পুরুষ, ইত্যাকার জ্ঞানকে নির্গুণ ধ্যান বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ সাধারণ ব্যক্তিদিগকে প্রথমতঃ সাকার রূপে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কারণ, প্রথম হইতেই নিরাকার জ্ঞান অতি দুর্ঘট। এই সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ের অনুশীলনাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে পর অনায়াসেই নির্গুণ ব্রহ্ম-জ্ঞান উপস্থিত হইতে পারিবে।

বশীকৃতে মনস্তেষাং সদ্‌গুণব্রহ্মশীলনাৎ।
তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিকল্পনম্॥

সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক অনুশীলনদ্বারা মন বশীকৃত হইলে সমস্ত উপাধি রহিত নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান সাক্ষাৎ উদিত হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে অসমর্থ, তাহারই সগুণ ভাবে আকারাদি কল্পনা করিয়া থাকে। যথা—

নির্ব্বিশেষং পরংব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
———যে মন্দাস্তেহনুকম্পন্তে সবিশেষ নিরূপণৈঃ।

যে সকল তত্ত্বজ্ঞান পরাঙ্মুখ ব্যক্তি নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে অশক্ত, তাহারাই ব্রহ্মের গুণকল্পনা করিয়া মূর্ত্তি প্রভৃতির চিন্তা করিয়া থাকে। এইরূপ করিতে করিতে চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইলে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সাকার উপাসনা নিরাকার পদলাভের পথস্বরূপ। প্রতিমাই আমাদিগের শেষ উদ্দেশ্য নহে। সাকার উপাসনা অপেক্ষাকৃত সুকর বলিয়া আর্য্যঋষিগণ প্রথমতঃ এই পথ অবলম্বন করিতে আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

সেই অব্যক্ত পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিয়া সিদ্ধি লাভ করা বড়ই দুষ্কর, দেহাত্মবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কিছুতেই সে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে পারে না।

অতএব প্রথমতঃ সাকার উপাসনাই কর্ত্তব্য। এই সাকার উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ অভিমানাদি তিরোহিত হইলে নিরাকার জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিমা পূজা আমাদের সেই পর জ্ঞান লাভেরই উপায়। এখানে কুলার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন—

গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাদ্ যথা।
তথা সর্ব্বগতো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে॥

গাভীর সর্ব্ব শরীরেই দুগ্ধ আছে, কিন্তু কেবল স্তনমুখ হইতেই ক্ষরিত হয়, সেইরূপ ভগবান সর্ব্বময় হইলেও আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না—তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি না, যদি প্রতিমাদির উপাসনা না করি। আজ এই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র প্রতিমাদির উপাসনা করিয়া আমরা সেই অসীম অনন্ত অক্ষয় নিরাকার পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিব।

প্রতিমা পূজা প্রতিমার উপাসনা আমাদের কৃতার্থতারই-কারণ, ইহা হইতে কিছু অকৃতার্থ লাভের সম্ভাবনা নাই। দয়াময় অনন্ত ভাবের অনন্ত লোককে অনন্ত পথ দিয়া সেই নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প সত্য প্রেমময় আপনার ভাব বুঝাইবার জন্য অনন্তরূপ ধারণ করিয়াছেন। যে কোনও মূর্ত্তিতে ভগবদ্জ্ঞানে ধ্যান ধারণা উপাসনা করিলেই কৃতার্থ হইব। প্রতিমার কথা কি?—প্রতিমা দর্শনে, প্রতিমার নাম শ্রবণেই ভগবদ্ভাবে হৃদয় উৎফুল্ল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি অন্ধ বিশ্বাসে পুতুল কাষ্ঠ পাথরকেও ভগবদ্জ্ঞানে উপাসনা করি, তাহা হইতেও আমাদের পরম জ্ঞানের উদয় হইবে।

আমাদিগের আর্য্যঋষিগণ বিজ্ঞ বহুদর্শী ছিলেন। তাঁহারা সকলকে একছাঁচে ঢালিতে চেষ্টা না করিয়া, সকলকে একপথে

টামিয়া লইয়া যাইবার হুকুম জারী না করিয়া প্রবৃত্তিভেদে এবং অধিকার ভেদে উপাসনার সাকার নিরাকার তুইটী শাখা এবং অনন্ত প্রশাখা করিয়া গিয়াছেন। আমরা যে শাখা যে প্রশাখা অবলম্বন করি না, শেষে সকলেই সেই—

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখলশ্বত্থং বীজমব্যয়ম্"

সেই পরব্রহ্মগতি লাভ করিব সন্দেহ নাই। যে যাহা বলুক, যে যা করুক, আমাদের ও সঙ্কীর্ণতার ভিতর যাইবার প্রয়োজন নাই, এস আমরা সেই আর্য্যঋষি প্রদর্শিত সরল সুগম সুপরীক্ষিত পথে অগ্রসর হই।

—:০:—

গঙ্গা-মাহাত্ম্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মন্ত্র কাণ্ডে আসিলে গঙ্গার ধ্যানই তাঁহার প্রধান মন্ত্র। ধ্যানের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার পূজা কালেই মন্ত্রের অর্থানুরূপ তাঁহার মনন করিতে হইবে। স্নান কালেও এইরূপ মনন করিয়া স্নান করা কর্ত্তব্য।ভগবতীকে স্নান করান পূজার অঙ্গ, তদ্রূপ আমাদেরও সেই ভগবতী ভাগীরথীতে স্নান করাতেই তাঁহার পূজা ও উপাসনা করা হয় এবং পূজা করিবার অধিকারও জন্মে।

গঙ্গার ধ্যান যথা—

ধ্যেয়া গঙ্গা শ্বেতরূপা ত্রিনেত্রা বরদা শিবা।
অভয়া পদ্মহস্তা চ পীযূষঘটপাণিকা॥
চতুর্ভুজা দিব্যরূপা বসন্তী মকরে শুচৌ।
নানালঙ্কারভূষাঢ্যা স্ফুরৎস্মেরমুখাম্বুজা॥
ভ্রাজমানা দশ-দিশো দীপয়ন্তী মহাপ্রভা।
জ্বলৎ কনক হেমাভা বাসোযুগপিধায়িনী॥
কলিকল্মষসংহন্ত্রী পাতু পর্ব্বতকন্যকা॥

ইহার অর্থ অতি সহজ, কিন্তু পাছে সকল পাঠক পাঠিকার উহা বোধগম্য না হয় তজ্জন্য উহার বঙ্গানুবাদ ও কিঞ্চিৎ ভাবার্থ দেওয়া গেল।

গঙ্গাদেবী শ্বেত বর্ণ ও ত্রিনেত্রা। তিনি শিবা ও মঙ্গলময়ী এবং তাহার স্বভাব ঐরূপ বলিয়া আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা মোহান্ধ হইয়া অন্য নশ্বর ফল কামনা করিলেও তিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মোক্ষফল দিতে চাহেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে ভবভয় সমস্ত দূর হয়। তিনি নারায়ণী শক্তি বলিয়া নারায়ণের পদ্ম তাহার হাতে শোভা করিতেছে। আবার আর এক হস্তে অমৃতপূর্ণ ঘট রহিয়াছে, তিনি সেই শিবতমরস ভক্তের জন্য বহন করিতেছেন। তিনি চতুর্ভুজা; আমাদের চারিটী পরম ভোগ্য বিষয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ঐ চারিটী চারি হস্তে বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার এই যে সকল রূপ কল্পনা করা হইয়াছে তাহা দিব্যরূপ, অর্থাৎ তিনি ইচ্ছাময়ী, নিরাকারা হইলেও ইচ্ছাক্রমে এই প্রকার রূপ ধারণ করেন। শুচি মকর তাহার বাহন। সংসারের স্রোত ও জলের স্রোত উভয়েই নিম্নদিকে টানিয়া লইয়া যায়। মৎস্যের ধর্ম্ম ঐ স্রোতের বিপরীত দিকে অন্য কথায় ওজন বাহিয়া যায়। শুচি শুদ্ধ হইতে হইলেও ঐ মকরের ন্যায় সংসারের স্রোত অতিক্রম করিয়া গঙ্গার প্রভব যে বিষ্ণুর পরম পদ সেই ঊর্দ্ধদিকে যাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। গঙ্গা পূজা করিতে হইলে ভক্তের হৃদয়ই পূজ্যদেবীর বসিবার স্থান, এবং ভক্তের মন শুচি মকর হই-লেই বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী গঙ্গাদেবী তদুপরি আসন পরিগ্রহ করেন, নচেৎ নহে। তাঁহার নানাপ্রকার অলঙ্কার ও গুণাদি ভূষণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। ইহার তাৎপর্য্য, লক্ষ্মীর দৃষ্টি কম হইলেই গৃহস্থের শ্রী অলঙ্কারও গুণ সকলই কম হয়, এবং লক্ষ্মীর দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকলের উন্নতি হয়। গঙ্গা দেবী যখন লক্ষ্মীপতি নারা-য়ণের অঙ্গ দ্রবীভূত হইয়া উদ্ভূতা হইয়াছেন তখন তাঁহাতে অলঙ্কার

ও ভূষণের কোন অভাব থাকিতে পারে না। ভক্ত ঐ ইষ্টদেবীর ভাবে ভাবিত হইলে তাহারও অলঙ্কার ও ভূষণের ইয়ত্তা থাকে না। দেবীর মুখপদ্মে সদা মৃদু মধুর হাস্য খেলা করিতেছে। যেখানেও যে ভাবে লক্ষ্মীপতির সহিত মিলন ঘটে সেই স্থানেই এই মধুর হাসি মুখে সদা বিরাজ করে। দ্রুত কনকের ন্যায় আভা যুক্ত হওয়ায় তাঁহার মহাপ্রভাতে দশ দিক আলো করিয়া তিনি যেন ফাটিয়া পড়িতেছেন। তিনি বিষ্ণু তেজ সম্ভবা, তাঁহার অঙ্গদ্যুতি এইরূপ বর্ণিত হওয়াই উচিত। আমরা যখন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বিশ্ব সংসার দর্শন করি, তখন আমাদের হৃদয়স্থ চিৎশক্তি কি ঐ রূপে দশ দিকে ফাটিয়া পড়িতেছে বোধ হয় না? সেই গঙ্গা পর্ব্বত দুহিতা আমাদিগের কলির পাপ বিধৌত করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ভগীরথকে বশিষ্ঠদেব যখন এই গঙ্গার ধ্যানটী জপ করিতে বলেন তিনি সেই সঙ্গে আরও বলিয়াছেন—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ব্রহ্মাণ্ডোপরি রাজতে।
তস্মিন্ বসতি সা গঙ্গা ত্যক্ত্বা ব্রহ্মকমণ্ডলুম্॥

গঙ্গার ধ্যানে তাহাকে পর্ব্বত কন্যা বলা হইয়াছে। পর্ব্বত কন্যা ও পার্ব্বতী এই দুই শব্দেরই এক অর্থ। হিমাচল হইতে গঙ্গা নিঃসৃত হইয়াছেন বলিয়া তিনি পার্ব্বতী। কিন্তু পাছে লোকে ভাবে তৎপূর্ব্বে তাঁহার অস্তিত্ব ছিল না, সেই জন্য বশিষ্ঠদেব বলিলেন যে হিমাচল গঙ্গার উৎপত্তির স্থান হওয়া দূরে থাকুক, ব্রহ্মার কমণ্ডলুও তাঁহার প্রকৃত উৎপত্তির স্থান নহে। আমাদের চতুর্দ্দিকে অণ্ডাকার যে বিশ্বসংসার দেখিতে পাই তাহার উপরে বিষ্ণুর পরম পদ এবং সেই পরম পদে ব্রহ্মার কমণ্ডলু ত্যাগ করিয়া গঙ্গা দেবী বাস করেন।

যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা করেন, তাঁহাদের

পক্ষে বশিষ্ঠদেবের বাক্যটী আপাততঃ অবৈজ্ঞানিক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সে রূপ বোধ আর থাকে না। বিষ্ণুশক্তি সমস্ত জগৎ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। জগৎ বলিলেই তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ গমনশীল, দুই নিমেষকাল একভাবে স্থায়ী নহে, এইরূপ কোন পরিবর্ত্তনশীল বস্তু বুঝায়। বস্তুর পরিবর্ত্তন কারণ-সাপেক্ষ ইহা বৈজ্ঞানিক যুক্তি। নদ নদী প্রবাহিত হইতেছে; মাধ্যাকর্ষণ তাহার কারণ। জল শুষ্ক হইতেছে; সূর্য্যের উত্তাপ তাহার কারণ। জীবের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে কাল তাহার কারণ। এইরূপে জাগতিক সকল ব্যাপারেরই কারণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু ঐ সকল কারণের কারণত্ব কে রক্ষা করেন বা কিরূপে রক্ষিত হয় জিজ্ঞাসা করিলে আধুনিক বিজ্ঞান তথায় নিরুত্তর। আর্য্য বিজ্ঞান তখন বলেন যে, সর্ব্বকারণের কারণ এক বিষ্ণু, তিনি সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া কারণ গুলি যে সকল নিয়মাবলির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেছে সেই সকল নিয়মের প্রবর্ত্তনা করিতেছেন ও নিয়ন্তৃভাবে তাহা সতত রক্ষা করিতেছেন। বিশ্বসংসারের অনন্ত নিয়মাবলিকে তিনি নিজ নিজ পথে ধরিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম ধর্ম্ম [ধৃ=ধরা মন্]। যিনি এইরূপে সকল গুলিকে ধরিয়া রাখিবেন তিনি যদি নিজে একস্থানে কি এক ভাবে স্থির না থাকেন তাহা হইলে কোনটী ধরিয়া রাখা হইতে পারে না। যে স্থানে বা যে ভাবে তিনি স্থির ও নিশ্চল, সেই তাঁহার পরম পদ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চলৎ স্বভাব ও স্পন্দময়, তজ্জন্য বিষ্ণুর নিশ্চল শান্ত পদ সেই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর থাকিতে পারে না। কাজেই ব্রহ্মাণ্ডের উপরি বিরাজিত। নিয়ন্তা নিজে নিয়মাধীন হইলে নিয়ম চলে না, ইহা রাজনীতির একটী স্থির সিদ্ধান্ত। এই হইতেই "রাজা কখন কোন অপরাধ করিতে পারেন না" এই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে। বিশ্বরাজ্যের অধিপতিও বিশ্বনিয়মের অধীন নহেন—এইটী তাঁহার পরম পদের একটী মর্য্যাদা।

বৈদিক সন্ধ্যাদিতে যে জলের উপাসনা আছে।তাহা তন্ত্রাদিতে ভিন্নাকারে পরিণত হইয়াছে। অল্প জলে রাস্তা পথ পঙ্কিল হইয়া আমাদের শরীর ও বস্ত্রাদি মলিন করে আবার বেশী জলে ঐ বস্ত্রাদি ধৌত করিলে সেই মল দূর হয়। অল্প জল কোন খাতে থাকিলে তাহা শীঘ্রই পচিয়া উঠে, কিন্তু নদী বা সমুদ্রের জল কখন পচে নাই। যে জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় সেই জলে বৃক্ষাদিরূপে পরিণত হইয়া অগ্নি উৎপন্ন করে ও পরে কাষ্ঠাকারে দগ্ধ হইয়া অগ্নিময় হয়। জলের দ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা হইয়াছে এবং তদ্দারা সমস্ত প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও ভোগ শক্তি জন্মিতেছে। অতএব জলেতে সাক্ষাৎ নারায়ণী শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাতে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়। অবস্থা ভেদে তাঁহার পাবনী ও অপাবনী দুই শক্তিই আছে। যখন জল আমাদের জীবনী শক্তির ও সকল ভাবের কারণ, তখন জল সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপে আমাদিগকে পরমভাব শিবতমরস প্রদান করুন, এই বৈদিক প্রার্থনায় জলেতেই বিষ্ণুকে সাক্ষাৎকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা করা সহজ নহে। তজ্জন্য অমুক নদীতে অমুক দেবীর ও অমুক নদে অমুক দেবের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া ভগবান বিষ্ণুর জলাশয়াদিতে আবির্ভাব উপলব্ধি করান তন্ত্রশাস্ত্রকারদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। তীর্থ বলিয়া যে সকল নদ নদী প্রসিদ্ধ, তাহাতে ঐ রূপ ভক্তি হইলে পর "আপঃ নারায়ণঃ স্বয়ং" অর্থাৎ সমস্ত জলই স্বয়ং নারায়ণ এই শিক্ষা হিন্দুদের অভ্যাস করিতে হয়। তখন জলাশয় মাত্রেই পবিত্র। জলাশয়ে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ ও মুখ ধৌত জল পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করা নিষেধ। এই ভাবে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বর্গ লাভ হয়। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে বিশ্বময় আকারে উপলব্ধি করানই তন্ত্রের উদ্দেশ্য এবং তাহাতে যে রূপ কল্পনা হইয়াছে তাহা উপাসকগণের হিতের জন্যই হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট প্রকাশ আছে।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোঃ রূপকল্পনা"

যাঁহারা উপাসক অর্থাৎ ক্রমশঃ ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতে চাহেন তাঁহাদের হিতের জন্য অথবা সহজে বা ক্রমে অগ্রসর হইবার জন্য ঐ সকল রূপ কল্পনা হইয়াছে। ব্রহ্মের অনন্তরূপ; কিন্তু কেহ যদি ভাবেন যে সকল রূপ গুলি একবারে দর্শন করিবেন, তাহা তাঁহার ভ্রম। অনন্ত ব্রহ্মের কথা দূরে থাকুক যদি একটী ভূমির আয়তন স্থির করিতে হয় তাহা আমরা একবারে দেখিয়া

করিতে পারি না। প্রথমতঃ তাহার দৈর্ঘ্যের দিকে লক্ষ করিয়া তাহা মাপিয়া ও পরে তাহার প্রস্থের দিকে লক্ষ করিয়া তাহা স্থির করিয়া ঐ দুইটী গুণ করিয়া তবে তাহার আয়তন স্থির করি। ভূমিটীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কখন স্বতন্ত্র থাকে না। কিন্তু যেমন দৈর্ঘ্য স্থির করিতে গিয়া প্রস্থ আছে কি না কিছু মাত্র ভাবি নাই দৈর্ঘ্যকে যেমন একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য বলিয়া ভাবি, সেইরূপ ব্রহ্মকে জল বলিয়া এক সময় ভাবনা করা তাহার জলময় রূপ কল্পনা করা হইল। এই কল্পনা কাল্পনিক উপন্যাসের কল্পনা নহে।

ইতি পূর্ব্বে গঙ্গার ধ্যানে যে রূপ কল্পনা করা হইয়াছে তাহা বিশুদ্ধ জলের ও তাহা হইতে আমরা যে সমস্ত মঙ্গল প্রাপ্ত হই তাহারই রূপক মাত্র।

ভক্ত পাঠকবৃন্দ। গঙ্গাতে যে এই সকল ভাব আছে; তাহা নিম্নের গীতামাহাত্ম্যে প্রকাশ। কিন্তু আমাদের ইহাও মনে রাখা উচিত যে, কোন দ্রব্যের নিজের কোন ভাব নাই, ভাবুকের কৃপায় ঐ দ্রব্য দৃষ্টে তাহার অভ্যস্ত চিন্তার অনুরূপ ঐ ভাব উদয় হয়।

গীতা মাহাত্ম্য।

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা, সত্যা, পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলি ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী॥
অর্দ্ধমাত্রা, চিতা, নন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থ-জ্ঞান-মঞ্জরী॥

গীতা মাহাত্ম্যে গঙ্গাই মুখবন্ধ। গীতা জ্ঞানগঙ্গা, কেবল জ্ঞানীর স্নান তাহাতে হইতে পারে কিন্তু গঙ্গায় অপামর সকলেই স্নান করিতে পারে। গঙ্গার জল বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে আসিতেছে, বিষ্ণুর অঙ্গ দ্রব হইয়া ঐ জল হইয়াছে এই ভাবে স্নান করিলে শরীর তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধ ও সমস্ত পাপক্ষালণ হইল ভাবিয়া এক পরমানন্দ উপস্থিত হয় এবং বৈকুণ্ঠের চিন্তা আইসে। গীতা পাঠ করিয়া জ্ঞান হয়, যে বিষ্ণুর মূর্ত্তি জ্ঞানেতেই জগৎ রহিয়াছে। এই জগৎ ভ্রম মাত্র। সেই জ্ঞান দিয়া তিনিই অহঙ্কার মমতা ইত্যাদি মল সমস্ত ক্ষালন করেন। তাহাকে অনন্য হইয়া আশ্রয় করিলে আর কোন ভয় নাই দুঃখ নাই শ্রীহরি সুহৃদ পিতা, মাতা এই ভাবিয়া জীব এই মর্ত্তে থাকিয়া বৈকুণ্ঠসুখ উপভোগ করিতে থাকে।

হরে ওঁ।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ।

ভক্তি ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী ।
ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তি ভক্ত্যাঃ পরং পদম্ ॥

—:০:—

শ্রীগৌরাঙ্গ ।

জয় শচীনন্দন, ভকতজন-জীবন,
জয় গৌরাঙ্গ অবতার-সার।
জয় গোরা নাগর নদীয়ার শশধর
জয় গৌর প্রেম-পারাবার ॥
সাধনার সারভূত হরিনাম পরতত্ত্ব
ব্যক্ত করি তারিলে ভুবন ।
ছোট বড় না বাছিলে, যেচে যেচে নাম দিলে
নাম-রসে জুড়া'লে জীবন ॥
অধম পাতকী যত মাতাইলে শত শত,
তরাইলে করম-চণ্ডাল ।
জীবগণে তরাইতে প্রেমভক্তি বুঝাইতে
সব ছাড়ি' সাজিলে কাঙ্গাল ॥
দীনজনে দিয়া কোল বলাইলে "হরি-বোল",
মাতাইলে জগত সংসার ।
ঘুচাইলে মন-আঁধার দিয়ে নাম সারাৎসার,
বুঝাইলে ভজনের সার ॥
জীবে দিতে হরিনাম গৌর মোর গুণধাম !
ধরায় লুটাও হ'য়ে ভোর ।
যত সব নর নারী তব প্রেমে বলে হরি,
তোমার দয়ার নাহি ওর ॥
সবে যদি নাম দিলে হরি-প্রেমে মাতাইলে
ওহে গৌর অধম-তারণ !
দীনজন পানে চাও, দাও হরি-প্রেম দাও,
ওহে গৌরাঙ্গ দীনশরণ !!

ভক্তি-তত্ত্ব।

ভক্ত পাঠকগণ ! এযাবৎ নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় "ভক্তি" পত্রিকার যথার্থ লক্ষ্যের দিকে আমি দৃষ্টি রাখিতে পারি নাই। বিশেষতঃ আমার আশা ছিল, গ্রাহকগণের মধ্য হইতেই ভক্তি-ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ দ্বারা "ভক্তি" দিন দিন বর্দ্ধিত-কলেবরা হইয়া ভক্তির গ্রাহকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন। সেই আশার উপর নির্ভর করিয়াই এযাবৎ শ্রীমদ্ভাগবতের লেখনী হইতে আমি অবসর করিয়া ভক্তির বিষর কিছু লিখিতে বা বিশেষ যত্ন করিতে পারি নাই। অথবা এসকলই ভগবান চক্রপাণির চক্র। আমরা বুঝিনা বলিয়াই আমিত্বের উপর নির্ভর করি, সুতরাং কার্য্যের ফল সুচারু-রূপে লাভ করিতে না পারিলেই হতাশ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই। তিনি কখন কাহার দ্বারা কোন্ কর্ম্ম যে করাইবেন তাহা আমাদিগের বুঝিবার সাধ্য নাই। যে কার্য্য আমরা অভিমান বশতঃ উপেক্ষা করি অতি অল্প সময় পরে হয়ত সেই কার্য্যেতেই আমাদের লিপ্ত থাকিতে হয়, আবার মোহ বশতঃ যে কার্য্য বা যে বস্তু আমরা উপাদেয় ও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছি, হয়ত ক্ষণকাল পরেই তাহা দ্বারা বিষময় ফল প্রাপ্ত হইয়া উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইব। যতদিন অভিমান দূর না হইবে ততদিন আমাদের কিছুতেই মঙ্গল নাই; পরন্তু অভিমান বশত প্র তি কর্ম্মে পদে পদে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও বিফল প্রয়াস হই, অভিমান ভক্তি পথের কণ্টক অভি-মানের লেশমাত্র থাকিলেও হৃদয়ে ভক্তিভাব আসে না, অভিমানই নাস্তিকতা ও ভগবদ্বিমুখতার মূল কারণ।

সে যাহা হউক, সম্প্রতি একমাত্র জীবনের চির-সহায় ত্রিকালদর্শী সর্ব্বসাক্ষী দয়াল শ্রীগুরুদেবের আদেশে এবং কতিপয় শ্রীভগবদ্ভক্ত জনের অতিশয় আগ্রহ ও অনুরোধ রক্ষার জন্য ভগবানের কৃপার

উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরকরিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ এবং ভক্তিভাব লাভ করিবার জন্য অভিলাষী, জীবের ইহা হইতে উপকার হইলে আমি কৃতার্থ হইব এই বাসনায়, ভক্তিতত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেওয়া বা প্রশংসা লাভ করা আমার এই প্রয়াসের লক্ষ্য নয়, কেবল শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শাস্ত্র দৃষ্টিতে যাহা যাহা বুঝিয়াছি এবং পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যবলেই একসময়সাধুগণের মুখে অমৃত সম যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছি, ভক্তির উদ্দীপক বলিয়া সেই সকলই প্রকাশ করিবার আশা করিতেছি। ভক্তগণ আপনারা যথার্থ ভক্তিতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য যাহা করিলে ভক্তি হয়, যাহা ভক্তির অনুকূল এবং যাহা ভক্তির জীবন স্বরূপ, আবার যাহা ভক্তির বিপক্ষ, যাহা ভক্তির অন্তরায়, এবং যাহার অনুষ্ঠানে ভক্তিভাব হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়, সে সকল বিষয় আপনাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া আলোচনার জন্য যদি আমার এই প্রবন্ধাদি হইতে কিছুমাত্র সাহায্য পান তবে আমি কৃতার্থ হইব, এবং তাহাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই প্রবন্ধে ক্রমান্বয়ে ভক্তির সূচনা, নানাবিধ শাস্ত্রীয় ভক্তির লক্ষণ, এবং ভক্তি মার্গের প্রধান প্রধান ভেদ, এবং ভক্তির অনুকূল অঙ্গ সকল নির্দ্দেশ করা যাইবে। যাহার সৌভাগ্যক্রমে ভক্তিভাব হৃদয়ে উদয় হইয়াছে, তিনি যে কিরূপ আনন্দে সর্ব্বদার জন্য মগ্ন থাকেন তাহা বর্ণন করা যায় না। যত দিন পর্য্যন্ত ভগবদ্-ভক্তি লাভ না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত জ্ঞান যোগ তপস্যা সকলই ব্যর্থ, এমন কি যতদিন না অমৃতময় ভক্তিভাব লাভ হইল তত দিন পর্য্যন্ত মানুষ হইয়াও মানুষ নয়, প্রাণ থাকিয়াও মৃত, ইন্দ্রিয়শক্তি সর্ব্বথা পাইয়াও অশক্ত ও অকর্ম্মণ্য, এবং ভক্তিভাব শূন্য মানব, যে বৈষয়িক সুখের কণামাত্র লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও দেশ বিদেশ ভ্রমণ এবং নানাবিধ উপায়েই নিরন্তর চেষ্টা করিতে' থাকে এবং ঐ ক্ষণভঙ্গুর সুখের একটুমাত্র লাভ করিয়াই অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া নিজকে নিজে সফল মনোরথ মনে করে, ভক্তিভাব উদয়

হইলে সে সকল সুখের পূর্ণতৃপ্তি তাহার প্রার্থনীয় হয় না, এমন কি স্বর্গীয়সুখ ও অণিমা লঘিমা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্য এবং মুক্তি পর্য্যন্ত সে প্রার্থনা করে না। ভক্তিভাব লাভে কৃতার্থ মানব মান চাহে না, ধন চাহে না, অপরের নিকট স্তুতি চাহে না, যশঃ প্রার্থনা করে না, জগতের একমাত্র আধিপত্য ও অতুলনীয় ধন সম্পত্তির নিমিত্তও সে ব্যাকুল হয় না।—শাস্ত্র বলিয়াছেন।

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥

বৃত্রাসুর যখন ভগবানের দর্শন পাইল, ভক্তিভাবে যখন তার প্রাণ আপ্লুত হইল যখন সে বুঝিল যে ভগবদ্ভক্তি ভিন্ন অথবা ভক্তিভাবের তুল্য এরূপ আত্মারাম সুখ আর কিছুই নাই, তখন ভগবান প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চাহিলেও এই শ্লোকটী বলিয়াছিল।

"হে ভগবন্! আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব অর্থাৎ স্বর্গ রাজ্যের আধিপত্য চাহিনা, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার আধিপত্য প্রার্থনা করি না, সমস্ত সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্যেও আমার কামনা নাই, পাতাল পুরীর স্বামিত্ব লাভের জন্য আমার বাঞ্ছা হয় না, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি যোগসিদ্ধি লাভের বাসনা করি না, এমনকি আপনার দর্শন জনিত যে সুখ, আপনাকে লাভ করিয়া যে আনন্দ ও প্রীতি তাহা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিও কামনা করি না।" প্রিয়ভক্তগণ! যে ঐ ভাবের ভাবুক হইয়াছে, সে বুঝিতে পারে, ঐবাক্যের সারবত্তা কি; এবং প্রাণখুলে ঐরূপ বলিতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবে শিক্ষা দিতে ভক্তিভাবের পরাকাষ্ঠা দর্শন করাইবার জন্যই যেন নিজে ভক্তিভাবে আপ্লুত হইয়া ধন মান রূপ যৌবন প্রভৃতি হইতেও প্রীতিকর ভগবদ্ভক্তি ভাবের প্রার্থনায় কি বলিয়া ছিলেন দেখুন।

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাৎ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি" ॥

হে জগদীশ! ধন, জন, সুন্দরী কবিত্বশক্তি, ইহার কিছুই প্রার্থনা করিনা, একমাত্র তাহাই প্রার্থনা, যেন জন্মে জন্মে তোমাতেই অহৈতুকী ভক্তি থাকে।"

ভক্তবৃন্দ! যে ধন জন মানের প্রত্যাশায় আমরা সেই আনন্দঘন শান্তিময়কে ভুলিয়া দিবারাত্র কত কি পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিতেছি তাহার সীমানাই সেই ধন জন মান প্রভৃতি কে ভগবদ্ভক্ত ভক্তি লাভে ভাবে কৃতার্থ হইয়া তৃণ অপেক্ষাও লঘু মনে করে। ঐহিক সুখের কথা কি বলিব ভগবদ্ভক্তি এমনই পরমানন্দ-দায়িনী যে ভগবান স্বয়ংও যদি ভক্তের নিকট আসিয়া প্রার্থনীয় সালোক্য সাষ্টি সামীপ্য ও সাযোজ্য প্রভৃতি মুক্তি দানে কৃতসংকল্প হন এবং ভক্তকে বার বার উহা প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন, ভক্তিভাবে ভাবুক তাহাও প্রার্থনা করিতে চান না। ইহা শ্রীভগবান কপিলাবতারে স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥"
সালোক্যসাষ্টিসারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে বলিতেছেন—

"হে মাতঃ! যাঁহাদিগের হৃদয় আমার চরণ সেবা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় বাঞ্ছা করেনা, এবং যাঁহারা আমার (ভগবানের) প্রীতির জন্য সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, ভক্তিভাবে আপ্লুত হৃদয় হইয়া যাঁহারা পরস্পর আমারই গুণানুবাদ কীর্ত্তনে পরমানন্দ লাভ করেন, সেই সকল ভক্তগণ আমার একাত্মতা (আমার সহিত মিলেমিসে যাওয়া)

অভিলাষ করেন না, এমন কি আমি স্বয়ং দিতে চাহিলেও তাঁহারা সালোক্য সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য স্বারূপ্য ও একত্বরূপ অপবর্গ প্রার্থনা করেনা, কেবল জন্মে জন্মে যাহাতে আমার সেবারূপ ভক্তিভাবে থাকিতে পারেন তাহাই প্রার্থনা করেন"। প্রিয়ভক্তগণ! এক্ষণে বুঝুন যে, ভগবদ্ভক্তি লাভের কি পরিণাম, ভগবদ্ভক্তিভাবের কি আনন্দ, ভগবদ্ভক্তিলাভে কি সুখ। ধ্রুব বলিলেন—

"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম
ধ্যানাদ্ভবজ্জন-কথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে ভগবদ্ভক্তধ্রুব ভগবানের সমক্ষে সরল প্রাণে বলিলেন—

"হে নাথ! তোমার পাদপদ্ম ধ্যানে অথবা ভক্তজনের সহিত আলাপ করিয়া ও তাহাদিগের নিকট তোমার কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তের হৃদয়ে যে প্রেমানন্দ উপস্থিত হয়, তাহা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেও পাওয়া যায় না; পরন্তু যাহা ক্ষণভঙ্গুর বিষয় ভোগানন্দ তাহার কথা আর কি বলিব? সে সমস্ত আনন্দই কালে ক্ষয় হয়।"

ভক্তবৃন্দ! ভক্তিভাব লাভ করিয়া ভক্ত এইরূপে আনন্দ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বিষয়ভোগী, ভক্তিরসে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, তাই ভগবানের নিকট কেবল "দেহি দেহি" প্রার্থনা করি, জানিনা যে ভগবৎ সাক্ষাৎকার ও শ্রীভগবানের প্রসন্নতাই সকল সুখের মূলাধার, ভগবানকে প্রসন্ন করিতে পারিলে, আর কোন বিষয়ের অভাব থাকে না। যতক্ষণ তাঁহার প্রীতি প্রসন্নতা জন্মাইয়া ভক্তিভাব-লাভে হৃদয় আনন্দ পরিপূর্ণ না করিতে পারিব, ততক্ষণ হৃদয়ের অভাব, প্রাণের হতাশ, চিত্তের চঞ্চলতা বা বহির্মুখতা বৃত্তি, ও ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা কিছুতেই যাইবার নয়। আমরা মোহান্ধ, তাই বৃথা "আমার আমার" করিয়া সুখের বাসনায় দুঃখ-সাগরে, শান্তির আশায়

অশান্তিময় ব্যাপারে, আনন্দ-কামনায় নিরানন্দ পরিপূর্ণ পরিণতি বিরস বিষয় কামনায়, মগ্ন থাকি; ভক্তির ভাবমাত্র লাভ করিলেও আর ওরূপ অজ্ঞান বা মোহান্ধতা থাকে না। সুতরাং ভক্তি ভাব লাভই যে মনুষ্যের একমাত্র শান্তির আধার, ভক্তিভাবই যে জীবকে দিবানিশি অমৃতপানে পরিতৃপ্ত রাখে, ভক্তিভাবই যে জন্মান্তরের সঞ্চিত রাশি রাশি পুণ্যপুঞ্জের একমাত্র বিকাশ, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। যাহারা শ্রীগুরুর কৃপায় সাধুসঙ্গের বলে প্রাণকে নির্ম্মল করিয়া কথঞ্চিৎ ভগবদ্ভাবে ভাবিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝেন বা বুঝিতে পারিবেন ভক্তি কি ধন। ভক্তগণ আমি ঐ মধুময় ভক্তিভাবের অভাবুক হইলেও গুরুর আদেশানুসারে ক্রমশঃ শাস্ত্রীয় দৃষ্টির দ্বারা চেষ্টা করিব; এই প্রবন্ধেই যাহাতে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের লিখিত ভক্তির প্রকার ও ভক্তির ভেদ এবং ভক্তির অঙ্গ এবং ভক্তের একান্ত অনুষ্ঠেয় কার্য্যাদি যাহাতে প্রকাশ হয়; অপর সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ভক্তগণ ভক্তিলাভের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং যে যে ভাবে থাকিতেন বা লোকের সহিত ব্যবহার করিতেন সে সকল আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব আশা করি।

(ক্রমশঃ)

যমুনা।

প্রস্তাবনা।

জগত পাবনী, শ্যামসোহাগিনী,
নগেন্দ্র নন্দিনি! তুমি স্রোতস্বীনি!
কেমনে বাখানি? কিছু নাহি জানি;
তোমার মহিমা বিদিত কার?

তোমার মহিমা, তোমার গরিমা,
ভবে অনুপমা, নাহি তার সীমা;

ধরিতে চন্দ্রমা খর্ব্বের বাসনা
বিড়ম্বনা মাত্র হয়গো সার।

শুনেছি জননী! ভকত কাহিনী
বলিলে অমনি জুড়ায় পরাণি;
দিবস যামিনী জ্বলিতেছি আমি,
জুড়াব গাহিয়ে মহিমা তোর।

যা' তুমি বলাবে, বলিব সে সবে,—
চিত শুদ্ধ হবে ভেবে তব ভাবে,
ভাবময়-ভাবে পরাণ মাতিবে
দে মা ব'লে যাচি চরণে তোর॥

যতনে গাহিব,— পরাণ জুড়া'ব,
প্রেমেতে গলিব, হাসিব কাঁদিব,—
জগতে শুনাব হরি ভবধব
কি লীলা করিল তটেতে তোর।

গাহিব যমুনে! ব্রজগোপগণে
হরি ল'য়ে সনে তোমার পুলিনে
চরা'ত গোধনে বাঁশরীর তানে,
যত গোপগণে হইত ভোর॥

গাহিব তটিনী ব্রজের গোপিনী
ল'য়ে রাধারাণী ভানুর সঙ্গিনী
শুনে বংশীধ্বনি হ'য়ে পাগলিনী
শ্যাম পাশে ধেয়ে আসিত সব

এ সকল গাব, প্রেমেতে মাতিব,
সদাই ভাবিব ভাবময় ভব,
পরাণ সঁপিব। আপনা হারা'ব,
হরিময় হেরি জগত সব।

আবার যমুনে ধরিয়ে চরণে
কাতর বচনে যাচি ঘনে ঘনে

এ অধম জনে কৃপাদৃষ্টি দানে
কবগো জননি। সফল কাম।

কৃষ্ণ লীলা যত তোমাব বিদিত,
তুমি জান যত কেবা জানে তত ?
এ অধম সুত চরণে প্রণত,
প্রকাশ হৃদয়ে সে লীলা গ্রাম।

———*———

সৌন্দর্য্য ॥

ভাবেব জলধি তলে সৌন্দর্য্য বতন
বিস্তাবি সুষমা বাশি বহিছে মগন,
দুটী নয়ন আমার
খুঁজে হয সদা সাব,
আসে দৃষ্টিপথে বিঘ্ন রাশি কত শত,
যাহাদেব তবে আমি পুডিযাছি সতত ॥

(২)

ভীষণ হিংস্রক, যথা কুম্ভীব মকব,
করিবারে গ্রাস মোবে আসে নিরন্তব,
ঈশ বলে বলীযান,
গাহি বিভু গুণ গান,
তুমি সে বাবিধি তলে হও নিমগন,
ভুলিবে সকল তাপ নিভিবে দহন ॥

(৩)

সৌন্দর্য্যেব হলাহল হায রে কপাল।—
বৃথা কথা কহ যথা " অমৃতে গরল " ॥
হেবিব সৌন্দর্য্য বাশি
সদা আমি প্রেমে ভাসি—
মিথ্যা সত্য হয় বুঝি দুর্ভাগ্যে আমাব,
কি জানি কি হবে হায়! কল্পনা আমার ॥

(৪)

সৌন্দর্য্য মাধুরী পানে চিত্ত সে উধাও।
মধুরে মধুরে বুঝি মিলাইতে চাও ?
মধুর হইয়ে তবে
মধুরে মিলিত হবে,
নতুবা মিলন স্বধু বিষ উদ্গীরণ।
করিয়া দহিবে তব সাধের পরাণ ॥

(৫)

* * * * * *

(৬)

উদ্ভ্রান্ত সৌন্দর্য্য-সেবী হ'ও নারে মন।
জ্বলিয়া পুড়িয়া কেন সপিবে জীবন ?
কিসে তব অধিকার
ভাবি দেখ বার বার,
জানিয়া বুঝিয়া রাখ সে রতন মণি।
সৌন্দর্য্য পশরা হেরি ভুলোনা আপনি ॥

(৭)

সৌন্দর্য্য-আধার সেই বিভু প্রেমময়।
তাঁহার রূপের রাশি হের জগময় ॥
লহ নাম সদা তাঁর,
দিবানিশি তাঁরে স্মর,
সৌন্দর্য্যের প্রাণারাম হৃদয় রতন
হেরিবে হৃদয়ে জ্বলে সে অমূল্য ধন ॥

(৮)

জাগাইয়া দেয় হৃদে সৌন্দর্য্য-আধার।
ভাবিও তাহারে তুমি প্রকৃত সুন্দর ॥
সৌন্দর্য্য-পরশমণি
করে সে পরশে মণি

সে হৃদয় যে হৃদয় সৌন্দর্য্য মন্দির।
ডুবিয়াছে সেই জন প্রেমে সুগভীর॥

(৯)

সুনীল গগনোপরে তারকা বেষ্টিত
চন্দ্রমা হাসিছে কিবা ঢালিয়া অমৃত।
হেরি সে সৌন্দর্য্য শোভা
অপরূপ মনলোভা
সৌন্দর্য্য প্রয়াসী চিত তাহাতে মগন।
আনন্দ লহরী মাঝে করে সন্তরণ॥

(১০)

প্রকৃতি ভাণ্ডারে যত সৌন্দর্য্য বিকাস।
প্রকৃতি সন্তান তাহে করয়ে বিলাস॥
যে যাহারে ভাল বাসে
তাহাতে সৌন্দর্য্য পশে,
সৌন্দর্য্য ব্যতীত কিছু নাহি ধরাতলে।
সৌন্দর্য্য ব্যতীত কভু হৃদয় না গলে॥

(১১)

জ্ঞানীর সুন্দর জ্ঞান কবির প্রকৃতি।
জননী সুন্দর হেরে শিশুর আকৃতি॥
শস্য ক্ষেত্র কৃষকের
মনোরম নয়নের,
নায়ক সৌন্দর্য্য হেরে নায়িকা বদনে।
প্রেমিক সে রত সদা প্রেমের চিন্তনে॥

(১২)

সুন্দরে সুন্দরে কিবা মধুরে মধুর।
সে মিলনে বাহিরায় প্রেমের অঙ্কুর॥
সৌন্দর্য্যের সুধা ধারা
বারি পান মাতোয়ারা
অনন্ত প্রেমের উৎস হৃদে উথলিবে।
প্রেমের আনন্দ নীরে ডুবে সদা রবে॥

(১৩)

হেরিব বাসনা সদা সে মধু মিলন।
গাহিব সে মধু গান আমি অনুক্ষণ॥
মাতাব মিলন গানে,
নাচাব জগত জনে,
পুরাও সে আশা মোর সৌন্দর্য্য-নিলয়।
জ্ঞানময়, কর্ম্মময় হরি প্রেমময়॥

হিসাবের খাতা।

(সাধকের ভাবোচ্ছ্বাস)

শ্রীভগবানের অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ, অনন্ত ভাব, অনন্ত লীলা, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, তাঁহার সমস্তই অনন্ত। মানব-হৃদয় ক্ষুদ্র, দেহ সমীবদ্ধ; সুতরাং শ্রীঅনন্তদেবের ভাব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়, যিনি সেই অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পুরিতে পারিলেন তিনিই ধন্য, তিনিই প্রেমিক, তিনিই মানবরূপী দেবতা, তিনিই অকিঞ্চনের আরাধ্য দেবতা, এবং তাঁহারই জীবন ধন্য। তিনিই ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে সেই অনন্তদেবের ভাবে মিলাইয়া অনন্ত ভাবে পরিপূর্ণ করিতে পারেন। বাস্তবিক অনন্তকে সীমাবদ্ধ করা সহজ কথা নহে, ইহাতে শ্রীভগবানে অচলাভক্তি ও নির্ম্মলপ্রেম এবং ভগবদুপাসনায় অলৌকিক ত্যাগ স্বীকার করা চাই, বিশেষতঃ শাস্ত্রবাক্যে এবং গুরু বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকাই ইঁহার প্রধানতম সহায়। এবড় কঠিন কথা। যখন রূপের মোহ কাটিয়া গুণের মোহ থাকিবে, যখন দুঃখ যাইবে, স্মৃতি থাকিবে, তখন প্রাণের ভিতর ঘোর অন্ধকারেও হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাইবে, চির অন্ধকারে একবার আলো মিলিবে, তখন অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়ে আনিবার অঙ্কুর ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্থান পাইবে।

এত বলিলাম সোজা কথা, পারি কই। কিসে পারি? যখন এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম হয় তখনই সুমতি ও কুমতি দুইটী

সহচরী আসিয়া সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ক্ষেত্রকে বিশাল করত দ্বন্দ্ব আরম্ভ করে, যে মধুর জ্যোৎস্না টুকু দেখা গিয়াছিল কুহকিনী কুমতি তাহাতে স্বপ্নময় আবরণের মত ঘন অন্ধকার মাখাইয়া দিয়া যায়। যাহা অতিকষ্টে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল তাহা অসীম হইয়া পড়ে।

* * * * * *

তখন কুমতির কুহকচক্র যেন সুমতির সুগম পথ বলিয়া বোধ হয়, তখন সুমতিই কুমতি হয়, কুমতি কানের কাছে কুঅভিসন্ধিতে মন বিমুগ্ধকারী ঝিঁঝিট খাম্বাজ প্রভৃতি কত মিস্ট রাগরাগিণী তাল লয় সাজাইয়া ক্ষুদ্র হৃদয়টীকে আযত্ত ও তমোময় করিয়া ফেলে, এই অবস্থাই সাধকের ঘোর বিপদ, পরন্তু তখন যদি শাস্ত্রবাক্য ও শ্রীগুরুর উপদেশ স্মরণ করিয়া ঐসকল ভাবেতেও শ্রীভগবানকেই স্মরণ করিতে পারে তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকে না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়িপশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

"হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি সকল বস্তুতেই আমার সত্তা অবলোকন করে এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই আমার সত্তায় পরিচালিত ও প্রকাশিত, সুতরাং আমাতেই স্থিত মনে করে, "আমি" তাহাকে কখনও বিনাশ করি না অর্থাৎ আমার ভাব ছাড়া করিয়া বিপদাপন্ন করি না এবং সেও আমাকে বিনাশ করে না, অর্থাৎ সর্ব্বগত আমার সত্তার অপলাপ করিয়া নিজে ভ্রমান্ধে পতিত হয় না; যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে বাসনা করে তাহাকে আমি সকল বস্তুতেই দেখা দিয়া থাকি" আহা! কি মধুর কথা, হতাশ প্রাণে কি আশাপ্রদ অমৃতময় বাক্য, দুর্ব্বল হৃদয়ের বলপ্রদ, ও মন-মুগ্ধ-কারী কি অপূর্ব্ব বাণী! যে ব্যক্তি কুমতি পিশাচিনীর কুহক চক্রে না ভুলিয়া শ্রীভগবদ্ভাবেতেই আত্ম সমর্পণ করিতে পারে সুখে দুঃখে, লাভে অলাভে, নিন্দায় স্তুতিতে, শ্রীনারায়ণকেই স্মরণ করিতে পারে, তাহার আর পাপ বা

ভয়ের আশঙ্কা কোথায় ? সে প্রাণ খুলিয়া নিষ্কপট অন্তঃকরণে ইহাই বলিয়া থাকে—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"

"হে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধীশ্বর অন্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণ আমি কিছুই জানি না এবং কিছুই করি না, বা আমার কোনও কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই তুমি অন্তর্য্যামি রূপে আমাকে যখন যাহা করাও যাহা বলাও তাহাই বলি এবং করি"।

(সূচীপত্র।)

(অর্থাৎ আমাদের দেহের ভিতর কি কি জিনিস আছে) মানব দেহের পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ইন্দ্রিয়াধিপতি বলিয়া উভয় ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারায় এবং বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারায় যে সমস্ত কার্য্য সমাধা হয়, মন দুই ইন্দ্রিয় ও দুই ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ বলিয়াই এক মনই ঐ সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে, চক্ষু আদি দ্বারায় দর্শন ঘ্রাণ করিয়া হস্ত পদাদি দ্বারায় স্পর্শন ইত্যাদি কার্য্য করিয়া যে কার্য্য কষ্টে ও বিলম্বে সাধিত হয়, এক মন সে সমস্তই অল্প সময়ের মধ্যেই অনুভব করিয়া লইতে পারে। ঈশ্বর মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়; দর্শন স্পর্শনাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উপাসনার উপকরণ মাত্র। যেমন টাকার হিসাব রাখিতে হইলে, খাতা লিখিতে হয়, মুখে মুখে শুনিয়া না মিলিলে জমা খরচ দেখিয়া বাকী কাটিলেই সব জানিতে পারা যায়, ইহা সেই প্রকার, অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কখন কি করিল না করিল তাহার হিসাব রাখা বড় কঠিন, পরন্তু সকল ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মনের প্রতি দৃষ্টি করিলেই অর্থাৎ মন কতদূর স্থির ও চঞ্চল বা সেই সেই ভাবে ভাবিত, তাহার অনুসন্ধান করিলেই কত শ্রবণ ও কত কি

দর্শন হইল তাহা সহজেই বুঝা যায়; ইত্যাদি ভাবে যাহার জমা খরচ লিখিতে কোন ভুল হয় না, ঠিক নামাইতে ভুল হয় না, যিনি জমা ওয়াশিল করিতে অভ্রান্ত, তিনিই প্রকৃত মুহুরী, এ মানবদেহ রাজ্যেও যাহার মন খাটি তিনিই প্রকৃত মঙ্গলামঙ্গল কর্ম্মের ও ধর্ম্মা-ধর্ম্মের হিসাব রাখিয়া সুখে নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন এই হিসাব রক্ষক মুহুরী অনেক রকম থাকিলেও সাধু, বিরাগী, ও প্রেমিক ভক্ত এই তিন শ্রেণীর লোকই প্রধান; যখন দেহ সুস্থ থাকে সংসারে আবদ্ধ মন, পুত্র কলত্র বেষ্টিত হইয়া অর্থ লিপ্সায় উন্মত্ত থাকে; পরনিন্দা পরকুৎসাই যখন বিনোদের একমাত্র জিনিষ হয়, তখন জ্ঞান-রাজ্যের ও প্রেম রাজ্যের কথা কি মানস-পটে উদিত হইতে পারে? ঐ সময় পারমার্থিক খাতা লিখিবার জন্য একটী মুহুরীর আবশ্যক; তাহা কাহারও মনে হয় না। যিনি তাহা করেন, ও ঐ সময় সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া সদগুরুর উপ দেশ স্মরণ করেন, তাঁহারই কর্ম্মারম্ভ হয় এবং জ্ঞানরাজ্য ও প্রেম রাজ্যের চিন্তা আসে, ঐ চিন্তা আসিলেই জীবের কুতর্ক কুবাসনা মানস-পটে তত পরিমাণ স্থান পায় না, পরন্তু তখন প্রেমময়ের প্রেমের ভাবই তাহার হৃদয়ে উদয় হইতে থাকে, বাস্তবিক এই চঞ্চল প্রাণে যে কোন কারণেই হউক স্থিরতা না আসিলে প্রাণরূপী শ্রীনারায়ণকে লক্ষ্য করা যায় না, যিনি স্থিরতা লাভ করিতে পারেন, তিনিই সেই অনন্ত-শক্তিমান সত্ত্বময় বিরাটপুরুষকে দেখিতে পান। যখন মানব আত্মযোগ দ্বারা অসৎ কার্য্য ভুলিয়া ভক্তি পথের পথিক হইতে পারে, তখন প্রাণের স্থিরতা আসে, এবং তখন শ্রীনারায়ণ যে সমস্ত জীবেই আছেন, তাহা উপলব্ধি করা যায়, তাই সাধকের নবীন হৃদয়ে পুরুষোত্তমের রূপ দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হয় এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি মন কুমতির প্ররোচনায় না ভুলিয়া কেবল সৎকার্য্য সাধন করিতেই যত্নবান হয়। আর জগতে কাহারও প্রতি শত্রুভাব থাকে না, কাহা-কেও ঘৃণা করিতে পারে না; এমন কি পরস্পর ভেদাভেদ ভাব

অন্তর্হিত হয় এবং আলকু প্রাণে শ্রীনারায়ণকে বলে—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥"

"হে ভগবন! তুমি আদিদেব, তুমি পুরাণ পুরুষ! এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুমি একমাত্র আশ্রয় বা আধার, তুমিই সর্ব্বসাক্ষী, সকল বিষয়ই জান এবং জীবের প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয়ও তুমি। হে দেব! তোমার রূপের অন্ত নাই, তুমিই অনন্তরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিস্তার করিতেছ।" এইরূপে প্রত্যেক বস্তুতে ভগবৎ সত্তা উপলব্ধি করত সাধক ভগবদ্ভাবে কার্য্য করিতে থাকেন এবং কার্য্য করিতে করিতে প্রেম ও ভক্তির উদয় হয়।

ভক্তির অধিকার সকলেরই আছে অর্থাৎ ভক্তিভাবে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীনারায়ণকে ডাকিতে বর্ণ ও জাতি ভেদ নাই যে নারায়ণকে একাগ্রচিত্তে প্রাণ খুলিয়া ডাকিবে সেই তাঁহাকে পাইবে, একাগ্র মনে তাঁহাকে যে ডাকে, ভক্তিরসে তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়; তাঁহার প্রসাদে মূর্খ জ্ঞানী হইয়া পড়ে, ঐ ভক্তি উপার্জ্জন করিতেও কালাকাল, জাতি কুল, ধন, মান, কিছুরই আবশ্যক করে না, সকল সময়েই আরাধনার সময় এবং সকল জাতিই তাঁহার নিকট সমান কারণ এ বিশ্বের একমাত্র তিনিই রচয়িতা, তিনিই সর্ব্বত্র আছেন, এবং তাঁহাতেই সকলে আছে, যখন প্রাণের ভিতর দিব্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, তখন অসাধু সাধু হয়; মূর্খ পণ্ডিত হয়। প্রথমতঃ কিসে যে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় তাহা তিনি নিজেও জানিতে পারেন না এটী লীলাময়ের ইচ্ছা বা লীলার কৌশল; পরন্তু সংসর্গই ইহকাল ও পরকালের পথ পরিষ্কার বা কণ্টকিত করিয়া দেয়। সৎসংসর্গে জীবনের গন্তব্যপথ পরিষ্কার হয় আর কুসংসর্গে ঐ পথ কণ্টকপূর্ণ

হয়। ঐ কুসংসর্গ ভক্তি পথের অত্যন্ত বিরোধী। কুসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয় বিবেকবুদ্ধি এবং চিত্ত যাহা যাহা করে, সে সমস্তই আদিপুরুষ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিবে। ভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।"

"হে কৌন্তেয়! যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর এবং যাহা কিছু তপস্যা কর সে সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে।"

সাধন করিতে হইলে প্রাণের একাগ্রতাই মূল মন্ত্র। একাগ্রতা ভুলিয়া গেলে সাধনে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, চিত্ত বিক্ষেপ সাধনের মহান অন্তরায়, সাধনের সমস্ত উপকরণ ঠিক হইয়াছে, পরন্তু চিত্ত বিক্ষেপ আসিয়া মনকে একেবারে পথ ভুলাইয়া গেল, যে টুকু উপকরণ যোগাড় হইয়াছিল ছেলেখেলার ন্যায় তাহা কোথায় পড়িয়া রহিল, মন আর সে সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিতে ব্যগ্র হয় না। ভগবান বলিয়াছেন—

"যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিযম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।"

"হে অর্জ্জুন! অস্থির ও চঞ্চলচিত্ত যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, বিবেক ও একাগ্রতার বলে সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে সংযত করিয়া আপনার বশে রাখিবে।" ইহাই হইল মনের একাগ্রতা স্থাপন করিবার প্রধান উপায়; একগ্রতা মন মধ্যে স্থান পাইলে এক বস্তুতেই মন আকৃষ্ট হইবে; চিত্ত বিক্ষেপ আর হৃদয়ে স্থান পাইবে না; প্রলোভন প্রভৃতি আর তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে কিছুতে সমর্থ হইবেনা, যাহার হৃদয়ে এই অতুলনীয় একাগ্র ভাব আসিয়া দৃঢ়রূপে আসন গ্রহণ করে, তিনি ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া বিভোর হন, কোন বস্তুতেই তাহার লিপ্সা থাকে না,, "হরের্নামৈব কেবলম্"

ইহাই তাহার মূল মন্ত্র হইয়া পড়ে,তখন অন্য বাক্য বলিবার বা অন্য বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখিবার শক্তি থাকে না। শরীর নিশ্চল হইয়া বাহিরের ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিরোধ হইয়া মন এক প্রশান্ত ভাবে মগ্ন থাকে, তখন আর কোন যত্ন চেষ্টার আবশ্যক হয় না। যাঁহার হৃদয়ে একবার শক্তি সঞ্চার হয়, তাহার মনেতে অবিদ্যা-রূপিণী কাল ভুজঙ্গিনী আর বাস করিবার স্থান থাকে না; তখন তন্ময় প্রাণ, তন্ময় জীবন, ও সমস্তই তন্ময় হয়; হৃদয় শ্রীহরির প্রেমে আপ্লুত হয়, ভক্তিভাবের চরম অবস্থাই প্রেম। যখন সমস্তই ভক্তিময় হইয়া পড়ে, তখন প্রেমের উদয় হয়। প্রেমে মন, প্রাণ নির্ম্মল করিয়া দেয়, তাই তখন মনে আপনি আসিয়া উদয় হয়, "হে ভগবন যখন সমস্তই তুমি, তখন তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এই হইল ভগবানকে প্রেমডোরে বাঁধা। যখন ভক্ত প্রেম ডোরে বাঁধিতে পারে, তখন ভগবানের আর ক্ষণকালের জন্যও ভক্তের চক্ষুর অন্তরাল হইবার শক্তি থাকে না, তখন তিনি নিজেই ভক্তের প্রেমে আপ্লুত হন। ভক্ত ভগবান বই আর কাহাকেও জানে না, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যায় না; হৃদয়ক্ষেত্রে সেই নবজলধর শ্যামসুন্দর, আনন্দঘন রূপ সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়া মুদিত নয়নে কেবলই বিশ্বমোহন অপরূপ রূপ দর্শন করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে; আর দয়াময়ও তখন সুন্দর হাসি হাসিয়া ভক্তের কাণের কাছে নিয়ত মধুর বীণা বাজাইতে থাকে। এই প্রকার কত রঙ্গ ও কত খেলা যে ভগবান ভক্তের সঙ্গে করেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

অর্জ্জুন মিশ্র।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

গীতায় শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন যে, "যাহারা অনন্যচেতা হইয়া সতত আমাতে আত্মসমর্পণ করত আমার ভজনা করে, আমি স্বয়ং তাহাদিগের যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি) ও ক্ষেম (প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণ) বহন করিয়া দিয়া থাকি, অর্থাৎ যাহারা একবার শ্রীভগবানের হইয়া তাঁহাতে প্রাণ মন সমর্পণ করত সতত তাঁহার চিন্তা করে, তাঁহার পূজা করে ও তাঁহার প্রীতির জন্য তাঁহার সেবাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তদনুসারে কার্য্য করে, তাহাদের কখন কোন বিষয়ের অভাব হয় না, দুঃখ কষ্ট তাহাদের নিকট স্থান পায় না; তাহাদের শোক তাপাদি দূরে পলায়ন করে; শান্তি সতত তাহাদের সহচরী হইয়া আনন্দ বিধান করে; এবং কোথা হইতে কি ভাবে শ্রীভগবান তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করেন তাহা তিনিই জানেন ও তাঁহার ভক্তেরাই কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়া থাকেন।

পরম ভাগবত শ্রীঅর্জ্জুনমিশ্র মহাশয়ই ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। পাঠকবর্গ! আপনারা বোধহয় সকলেই মিশ্রমহাশয়ের নাম জানেন; তিনি পরম সাধু ছিলেন এবং শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্য ও গৃহস্থাশ্রম পালন করিয়া অবশেষে বানপ্রস্থ অবলম্বন করত স্ত্রীর সহিত পুরুষোত্তমে বাস করেন; তিনি নিষ্ঠাবান্ ও সদাচারী ছিলেন, গীতা এবং ভাগবতাদি আলোচনাই তাঁহার প্রধানকার্য্য ছিল; প্রত্যহ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তিনি ভিক্ষার্থে বাহির হইতেন, ও ভগবানের সেবার উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ পাইলেই ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহার গৃহিণীও দেবী ছিলেন, স্বামীর সেবাই তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল; পতি ভগবদর্চ্চনা করিবেন, তজ্জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেন, এবং যাহাতে তাঁহার প্রীতি হয়, সততই কায়মনোবাক্যে তাহাই করিতেন। উভয়েরই প্রাণ সরলতা ও দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল, এবং তাঁহাদিগকে দেখিলেই বোধ হইত, যেন কোন দেবদেবী জীব কৃতার্থতার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের জাগতিক বিষয়ে

কোনও লোভ বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না; স্বামী যাহা ভিক্ষা করিয়া আনিতেন প্রীত মনে তাহাই শ্রীনারায়ণের সেবারই জন্য প্রস্তুত করিতেন। শ্রীনারায়ণের প্রীতি সাধনই তাঁহাদিগের আনন্দের কারণ ছিল।

মিশ্র মহাশয় ভাগবত ও গীতাদিকে শ্রীনারায়ণের মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিতেন। একদিবস গীতা আলোচনা করিতে করিতে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকটী পাঠ করিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ আসিল যে, শ্রীভগবান মনুষ্য জাতিকে হস্ত পদাদি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কখন তাহাদের জন্য যোগ ক্ষেম 'বহন' করিয়া দেন না, সুতরাং এই শ্লোকের "বহ" এই পাঠ না হইয়া, "দদ" হওয়া উচিত অর্থাৎ তিনি জীবের, যোগক্ষেম বহন না করিয়া, দান করিয়া থাকেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি ব, হ, কাটিয়া দ, দ, করিলেন।

যাহার প্রাণে শ্রীভগবান সম্বন্ধে যতটুকু বিশ্বাস, তিনি তাহার সম্বন্ধে সেই ভাবেই কার্য্য করেন। মিশ্র মহাশয়ের বিশ্বাস যে, গীতার প্রত্যেক অক্ষর তাঁহার এক একটী মূর্ত্তি বিশেষ। এক্ষণে ইহাতে তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে, সুতরাং শ্রীমধুসূদনের তাহা সহ্য হইবে কেন? যিনি একবার দয়াময়কে প্রাণের জিনিস করিতে পারিয়াছেন, তাহাকে পদ্মপলাশ-লোচন হরি অন্ধকারে ফেলিয়া রাখেন না।

এই দিবস প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া মিশ্র মহাশয় ভিক্ষার্থে বাহির হইলেন। তাঁহাকে দেখিলে গৃহস্থ মাত্রেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত, এবং তাঁহাকে ভিক্ষা দিবার জন্য সকলেই আগ্রহ সহকারে দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত; আজ কিন্তু হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সুতরাং কিয়দ্দূর যাইয়া কাহাকেও না দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন, এবং সমস্ত দিন উপবাসে অতিবাহিত করিলেন; মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে কোনও বিশেষ অপরাধ হইয়াছে তাই আজ শ্রীনারায়ণকে উপবাসে

রাখিতে হইল, এইরূপ ভাবিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন। পর দিবস পুনরায় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে ভিক্ষা করিতে চলিলেন, দুই প্রহর অতীত হইল, কোথায় ভিক্ষা মিলিল না; অত্যন্ত মনোকষ্টে ঘুরিতে লাগিলেন।

এদিকে দয়াময় ভগবান ভক্তের প্রাণের বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং নটবর শ্যামবেশে দাদা বলাইকে সঙ্গে করিয়া মিশ্র মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। দুটীবালক অপূর্ব্ব, মনভুলানো কান্তি, একটী শ্যাম ও অপরটী গৌর, প্রখর রৌদ্রতাপে মুখ দুখানি শুকাইয়া গিয়াছে, দেহে ঘর্ম্ম পড়িতেছে, এবং বক্ষঃস্থলে কে যেন আঁচড়াইয়া লইয়াছে বলিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতেছে। দুজনে দুখানি স্বর্ণথালে বহুবিধ দ্রব্যাদি মস্তকে লইয়া মিশ্র মহাশয়ের দ্বারে দণ্ডায়মান। তথা হইতে "মা! মা"! বলিয়া ডাকিতেছেন। কি মধুর স্বর! যেন অমৃত ঢালিয়াদিতেছে। যাঁহার কণামাত্র ভাব পাইলে জীব মধুরতায় জগৎকে ভুলাইতে পারে তিনি স্বয়ং জগৎভুলানো না হইবেন কেন?

মিশ্র মহাশয়ের স্ত্রী উপবাসী, পতির জন্য পথ চাহিয়া ভাবিতেছেন; এমন সময়ে এই মধুর মাতৃ-সম্বোধনে তাঁহার প্রাণকে যেন ব্যাকুল করিল। তিনি দৌড়িয়া দ্বারের দিকে আসিলেন, এবং সেই গৌরও শ্যাম মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইলেন। কিছুক্ষণ মুখে আরবাক্য নিঃসৃত হইল না, কেবল অনিমিষ-নেত্রে দেখিতে লাগিলেন, আর চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল; কিন্তু ভগবানের মায়া, অমনি ভুলাইয়া দিলেন বলিলেন মা! আমাদের বড় কষ্ট হইতেছে, শীঘ্র বাটীর মধ্যে চল; এবং এই গুলি ধর। তখন মিশ্রপত্নী যেন চমক ভাঙ্গিয়া ব্যস্ততার সহিত তাঁহাদিগকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। তাঁহার মনে মনে সন্দেহ হইল, একি! এ সকল দ্রব্য কোথা হইতে আসিল, তখন বালক দুটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা! তোমরা কোথা হইতে এ সকল অমৃতময় দ্রব্য লইয়া আসিলে, আর তোমা-

রাই বা কে ? তোমাদের রূপ দেখে আমার মন প্রাণ যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাবে ভাবিত হইতেছে।”

ভগবন্! তোমার কি লীলা তুমিই জান ; ভক্তকে দেখা দিবার জন্য যুগে যুগে কত রূপেই আসিতেছ, তুমিই সত্যযুগ হইতে কলি-যুগ পর্য্যন্ত অনন্ত রূপ ধারণ করিয়াছ ; সে কেবল ভক্তের মনোরথ সিদ্ধির জন্য ; তুমি এখনও এজগতে নাই তাহা নয়, আমার মত কলিভাবাপন্ন জীবে তোমায় চিনিবে কি রূপে ? তুমিত গুরু রূপে জীবের ঘরে ঘরে বর্ত্তমান, আমরা পাপী বিষয়ের মলিনতায় আমা-দের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, তোমাকে দেখিয়া চিনিব কেমনে ? আমরা বহু কাল তোমায় ছাড়া, বিদেশে আসিয়া এই সংসারের মায়ায় অন্ধ হইয়া রহিয়াছি, তুমি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেও তোমায় চিনিতে পারি না ; তাই দয়াময় ! তোমার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আমাদিগের সেই চক্ষু দাও যাহাতে তোমায় দেখিয়া চিনিতে পারি ; তোমার ভাব বুঝিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি; এবং তোমার প্রীতি সাধন করিয়া আনন্দে জীবন যাপন করিতে পারি।

মায়ের একথা শুনিয়া বালকদ্বয় উত্তর করিলেন, “মা ! আমরা মিশ্রমহাশয়ের জন্য এই দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছি, তাঁহার বড় কষ্ট হইয়াছে দুই দিবস উপবাসী আছেন।” এখন “আমরা আসি” এই কথা বলিবার সময় মিশ্রপত্নীর চক্ষু কানাই বলাইয়ের বক্ষের দিকে পড়াতে তিনি দেখিলেন যে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল দিয়া রক্ত পড়িতেছে, অমনি বলিয়া উঠিলেন, “বাবা ! কে এমন নিষ্ঠুর আছে যে, তোমাদের মারিয়াছে ? তোমাদের বক্ষঃস্থল দিয়া রক্তপড়িতেছে কেন ?” তাঁহারা উত্তর করিলেন, “মিশ্রমহাশয় আমাদিগকে মারিয়া-ছেন”। ইহা শুনিয়া পতিগতপ্রাণা সাধ্বী প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলেন ও বলিলেন কেন বাবা, তোমরা তাঁহার এমন কি দোষ করিয়াছ যে তিনি তোমাদিগকে মারিবেন, তিনি ত কখনও কাহাকেও প্রহার

করেন না। ভগবান কেন এমন মতি দিলেন যে এই প্রাণের প্রাণ কোমল শিশুদ্বয়কে তিনি মারিলেন। এই প্রকার বলিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে বালকদ্বয় চকিতের ন্যায় চলিয়া গেলেন। গৃহিণী বসিয়া বালক দুটির বিষয় ভাবিতেছেন ও অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতেছেন, এমন সময় মিশ্রমহাশয় বাটীতে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং মনে করিলেন, যে এই দুঃসময় পড়িয়াছে বলিয়া স্ত্রীও কি আমার প্রতি বিমুখ হইল ? কারণ মিশ্রমহাশয়ের পত্নী স্বামীর জন্য প্রত্যহই অপেক্ষা করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মানা থাকিতেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে। স্ত্রী আলু লায়িতকেশে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "পত্নি তোমার ক্রন্দনের কারণ কি ? স্ত্রী উত্তর করিলেন ছি" ! তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর ত আর দেখি নাই ! তুমি ওমন সুন্দর বালক দুটিকে মারিয়াছ ? কেন তাহারা তোমার কি করিয়াছিল ?" মিশ্র মহাশয় শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সে কি পত্নি !" তুমি কি বলিতেছ ? বালক দুটী কে ? তুমি কি পাগল হইয়াছ ? পত্নী বলিলেন "কেন, তাহারা তোমার জন্য কত দ্রব্যাদি আনিয়াছে, এই দেখ।" মিশ্রমহাশয় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত।

তখন মিশ্রমহাশয় স্থির হইয়া আসনে উপবেশন করত দেখেন, যথার্থই কানাই বলাই তাঁহার জন্য খাদ্যাদি মস্তকে করিয়া আনিয়াছেন, আর তাঁহাদের বক্ষঃস্থল দিয়া রক্ত পড়িতেছে, তখন তিনি স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে তুমিই ধন্য, তুমি আজ কানাই বলাইকে দেখিয়াছ। কানাই বলাই আমাদের জন্য এই খাদ্যাদি নিজে বহন করিয়া আনিয়াছেন। আমি নিতান্তই পাষণ্ড, তাই তাঁহার বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া দুই দিবস এইরূপ কষ্ট পাইলাম। আমি যথার্থই তাঁহাদিগকে মারিয়াছি ; তুমি এখনই গীতা লইয়া

আইস। অনন্তর তিনি গীতার যে 'বহামি' পাঠ কাটিয়া 'দদামি' করিয়াছিলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিলেন, এবং শ্রীভগবানের বাক্যে অবিশ্বাস করিয়াছেন বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

ভগবন! আমরা সংসারী জীব, সততই তোমায় ভুলিয়া সংসারের ভাবে মত্ত হইয়া নিজেদের কর্ত্তৃত্বের উপর নির্ভর করিতেছি, সুতরাং ক্রমেই তোমা ছাড়া হইয়া দুঃখে পড়িতেছি ও অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছি। কিন্তু প্রভু তুমি বড় দয়াল। হে সর্ব্বজীব জীবন! হে দয়াময়! তোমার দয়া অসীম ও অনন্ত, যখন আমরা মাতৃগর্ব্ভে থাকি, তখন তুমি তথায়ও আমাদিগকে আহার ও বাতাস দিয়া রক্ষা করিয়া থাক, আমরা ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই ভবিষ্যতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া রাখ; তোমারই দয়ায় পিতা মাতার আমাদিগের প্রতি এত মায়া; তাঁহারা আমাদিগকে লালন পালন করিবার জন্য নিজেদের জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন! কিন্তু দয়াল! আমরা এমনি অকৃতজ্ঞ যে তোমার সকল দয়া পাইয়াও তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি, তোমাকে একবারও ভাবিনা, তোমার প্রতি আমাদের প্রেম কই? তুমি প্রাণের জিনিস হইলেও আমরা তোমাকে চিনি কৈ?

দয়াল! আমরা কি পৃথিবীতে মায়ায় মজিয়া তোমাকে ভুলিয়া থাকিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছি? না তোমাকে চিনিয়া তোমাকে ভাল বাসিয়া তোমার সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া তোমাকে দয়াল প্রভু বলিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইব, পার্থিব অভাব মোচন করিব তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া তোমার আনন্দে চিরানন্দ অনুভব করিব, বলিয়া আসিযাছি? তাই, দয়াময়! আমাদের প্রাণে প্রাণে সেই ভাব দাও, যাহাতে অনন্যমনে নিশি দিন তোমার হইয়া থাকিতে পারি। তাহা হইলে আমাদের সকল ভয় ও ভাবনা দূরে যাইবে এবং প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারিব, হরি দয়াময়! হরি দয়াময়! হরি দয়াময়।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ।

ভক্তি ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী ।
ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তি ভক্ত্যাঃ পরং পদম্ ॥

—:o:—

শ্রীগৌরাঙ্গ ।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস ।
পুনঃ গিরিধারণ, পূরব লীলাক্রম,
নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ ॥
শুদ্ধভক্তি-গোবর্দ্ধন, পূজা কর জগজন,
এই বিধি দিলা কলি মাঝে ॥
শ্রবণাদি নব অঙ্গ, কল্পতরুময় অঙ্গ,
পঞ্চরস ফল তাহে সাজে ॥
পুলক অঙ্কুরশোভা, অশ্রুজল মনোলোভা,
মন্দবায়ু বেপথু সুন্দর ॥
নিজেন্দ্রিয় উপচারে, সেব সেই গিরিবরে,
প্রেমমণি পাবে ইষ্টবর ।
দেখিয়া লোকের গতি, কলিযুগ-সুরপতি,
কোপে তনু কম্পিত হইল ।
অধরম-ঐরাবতে, কুমতি-ইন্দ্রাণীসাথে,
সসৈন্যেতে সাজিয়া আইল ।
কাম-মেঘ বরিষণে, ক্রোধ-বজ্র নিক্ষেপণে
লোকের হইল বড় ডর ॥
লোভ-মোহ-শীলাঘাতে, মাৎসর্য্যাদি-খরবাতে,
ধৈর্য্যধর্ম্ম উরে নিরন্তর ॥
জানিয়া জীবের ভয়, শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়,
উপায় চিন্তিল মনে মনে ।

ভক্তভাব সারোদ্ধার, নিজে করি অঙ্গীকার,
ভক্তি গিরি করিলা ধারণে॥
তাহার আশ্রয়ে লোক, পাশরিল দুঃখ শোক,
কলি-ভয় খণ্ডিল সকলে।
তবে কলি-দেবরাজ, পাঞা পরাভব লাজ,
স্তুতি করে চরণ-কমলে।
অপরাধ ক্ষেমাইয়া, কহে কিছু দীন হ'য়া
যত জীব প্রভুর আশ্রয়।
যেবা তব গুণগায়, তাহে মোর নাহি দায়,
এই সত্য করিল নিশ্চয়॥
প্রভু তারে দয়া কৈল, "ধন্য কলি" নাম থুইল,
অদ্যাপিও ঘোষয়ে সংসার।
চৈতন্যদাসেতে বলে, গোবর্দ্ধনলীলাছলে,
যুগে যুগে জীবের উদ্ধার॥

আমি কে?

এই যে সুন্দর মনুষ্য-রূপ ধারণ করিয়া অসীম সংসারে বিচরণ করিতেছি, আমি কে? দিবা নিশি দর্প করিয়া কত লোকের মনে কস্ট দিতেছি, কত লোককে উৎপীড়ন করিতেছি, এবং 'আমি ও আমার' বলিয়া এই যে কত অহঙ্কার করিতেছি, আমি কে? বন্ধুগণ! এক দিবস অহঙ্কার পূর্ব্বক কোন কার্য্যে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিতে যাই এবং সে কার্য্যে বিফলমনোরথ হইয়া নানা প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করি; তাহাতে মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়, এবং অত্যন্ত ধিক্কারও জন্মায়; সেই সময় একটী প্রশ্ন আমার মনে উদয় হইল,——আমি কে?

প্রশ্নটী মনে হইল বটে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ রূপ মীমাংসা করিতে আজও সক্ষম হইলাম না। একবার মনে হইল, যখন মনুষ্য

রূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই মানুষ এবং মনুষ্যেতে যে যে গুণ থাকা সম্ভব, আমাতে তৎসমুদয়ই আছে। কিন্তু বাস্তবিক কি আমি মানুষ? না আমি মানুষ, বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত? মানুষ আকারের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, তাহা হয়ত সমস্তই আমাতে আছে কিন্তু তাহা থাকিলেই যদি মানুষ বলিয়া পরিগণিত হওয়া যাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমিও একজন মানুষ হইতাম, এবং এই স্থানেই আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর হইয়া যাইত, আর আমাকে এত নৈরাশসাগরে নিমগ্ন হইতে হইত না। এক দিবস আমার কোন এক বন্ধু একটী গল্প বলিয়াছিলেন তাহার কতক অংশ এস্থানে বলিতে বাধ্য হইলাম।

এক ধনী ব্রাহ্মণ এক সময়ে অত্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হন, তাঁহার পরিবারবর্গ বহু দিবসাবধি তাঁহাকে পরিচর্য্যা করিয়া অবশেষে সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে, এবং ক্রমাগত অবহেলা-ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। ব্রাহ্মণ যখন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি সকলেরই এক প্রকার গলগ্রহ হইয়াছেন, তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল, এবং মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর তিনি এসংসারে থাকিবেন না ইহাতে প্রাণ যাক্ আর থাক্। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া একদিন রাত্রি কালে যখন সকলেই নিদ্রিত, তিনি একাকী বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। সেই ধনী ব্রাহ্মণ, যিনি কখনও শকট প্রভৃতি না হইলে রাস্তায় বাহির হইতেন না, আজ তিনি ক্রমান্বয় এক বৎসর কাল রোগে ভুগিবার পর সেই রুগ্নাবস্থায় সংসারের একমাত্র ভালবাসার বস্তু স্ত্রী ও পুত্রাদির ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, সেই নিশীথ সময়ে রাস্তায় আসিয়া দণ্ডায়মান। আজ তিনি দারুণ মনঃকষ্টে সাধের সংসার পরিত্যাগ করিতে উদ্যত। যে স্ত্রী পুত্রদিগকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন, যাহাদিগের সুখের নিমিত্ত এক সময়ে কত কষ্ট সহ্য করিয়া অর্থাদি উপার্জ্জন করিয়াছেন, আর যাহা-

দিগকে এ পর্য্যন্ত জগতের সার বস্তু ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, আজ সেই প্রাণের প্রাণ স্ত্রী পুত্রদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইবেন বলিয়া রাস্তায় আসিয়া দণ্ডায়মান।

আহা সংসারচক্র কি বিচিত্র! এই সংসারে আজ যাহাকে আপন বলিয়া প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেছি, কাল সে আর আপন নয়, আজ যে বন্ধুকে না দেখিতে পাইলে, কত কষ্ট অনুভব করিতেছি, কাল সেই বন্ধু হয়ত শত্রুরূপে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এসকল দেখিয়া শুনিয়াও আমরা সেই সংসারমায়াচক্রে নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছি, এবং সেই মায়ায় এমনই মুগ্ধ যে, ক্ষণ কালের নিমিত্তও সেই চক্রপাণির শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার জন্য চেষ্টা করি না। বন্ধুগণ! হই না কেন ঘোর সংসারী, থাকিনা কেন মায়া সাগরে ডুবে, একবার যদি প্রাণ ভরিয়া দয়াময় শ্রীগো- বিন্দকে ডাকিতে পারি, একবার যদি সেই জগদ্বন্ধুব সহিত বন্ধুতা করিতে পারি, এক বার যদি মনে প্রাণে হৃদয় স্বামীর উপর আত্ম সমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে আর কি আমাদের এত দুঃখ ও যন্ত্রণা থাকে? আর কি আমাদিগকে সংসারের তাড়না ভোগ করিতে হয়? না আর আমরা এই রকম করিয়া মায়া চক্রে ঘুরিয়া বেড়াই? যাহা হউক, ব্রাহ্মণের বোধ হয় সেই কথা মনে পড়িল, বোধ হয় হৃদয়স্বামীর দিকে মন টলিল, তাই আজ সমস্ত পরি- ত্যাগ করিয়া, সকল যন্ত্রণাদি ভুলিয়া সেই রাত্রিকালে রাস্তায় আসিয়া দণ্ডায়মান। পাঠকবৃন্দ! একবার ভাবুন দেখি, যে ব্যক্তি ক্রমাগত একবৎসর কাল শয্যাশায়ী, আজ সে কাহার বলে, বাটী হইতে বহির্গত হইল? আজ সে কাহার বলে সকল কষ্ট ভুলিয়া দেশত্যাগী হইতে সাহসী হইল? নিশ্চয় তিনি প্রাণে প্রাণে তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, তাই আজ তিনি সমস্ত কষ্ট ভুলিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

তথায় তাঁহার এক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ তাঁহারই কৃপায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে পর, মহাপুরুষ তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়ায় মহাপুরুষ বলিলেন, যদি তুমি একান্ত গৃহে ফিরিয়া না যাও, তাহা হইলে এক কার্য্য কর। আমি একটী পালক দিতেছি, তাহা লইয়া যাও, এবং কাণে লাগাইয়া যাঁহাকে মনুষ্য দেখিবে, তাঁহারই আশ্রয় লইও, তোমার উপকার হইবে। ব্রাহ্মণ অগত্যা পালকটী লইয়া চলিয়া আসিলেন, এবং উহা কাণে লাগাইয়া অনেক পথ অতিক্রম করিলেন, একটী বাজার ও পার হইলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একটীও মানুষ দেখিতে পাইলেন না। বাজারে কুক্কুর বিড়াল প্রভৃতি পশুরাই ক্রয় বিক্রয়াদি করিতেছে। এইরূপে ব্রাহ্মণ যখন বাজারের প্রান্ত ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন একজন মুচি জুতা সেলাই করিতেছে, এতক্ষণ পরে একজন মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইয়া ব্রাহ্মণ মহাপুরুষের আজ্ঞানুযায়ী সেই মুচিরই আশ্রয় লইলেন।

বন্ধুগণ! মনুষ্য আকার পাইলেই যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করা হইল, তাহা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। ব্রাহ্মণ পালক কাণে লাগাইয়া দেখিয়াছিলেন যে, বাজারে মনুষ্যের চিহ্ন মাত্র নাই সবই পশু। বাস্তবিক তাহা সত্য। আমি মানুষরূপ ধারণ করিয়া এই জগতে যে পশুর ন্যায় বিচরণ করিতেছি, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যত দিন এই মানুষ দেহে, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ বর্ত্তমান থাকিবে, ও যত দিন তাহারা আমার উপর আধিপত্য করিবে, তত দিন কেমন করিয়া বলিব যে আমি মানুষ। কারণ শাস্ত্রকারেরা বলিয়াগিয়াছেন মানুষেতে যখন যে রিপু প্রবল থাকে, তখন সে ঐ রিপুপ্রধান একরূপ পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এখন দেখিতেছি যে, মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, শাস্ত্রকারের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে, রিপু সংযম করা বিশেষ দরকার।

কিন্তু রিপুঞ্জয়ী হওয়া দূরে থাকুক, যখন প্রত্যেক রিপুই অতি তীব্রবেগে আমাকে শাসন করিতেছে, তখন আর আমি মানুষ কই? আর আমার মনুষ্যত্বই বা কোথায়? লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে মানুষ হইয়াছি, লক্ষ যোনির প্রার্থনা শুনিয়া দয়াময় ভগবান দয়া করিয়া মনুষ্য আকারে সাজাইয়াছেন, কিন্তু আমি এমনই অধম, এমনই অকৃতজ্ঞ, যে লক্ষ যোনির প্রার্থনার ধন এই মনুষ্য জন্ম অনায়াসে বৃথা কাজে ব্যয় করিতেছি। মনে করিতেছি, আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতিই বুঝি জীবনের একমাত্র কার্য্য, বিষয়াদি ভোগ করাই বুঝি জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। একবার ভাবিতেছি না যে, এসব ভোগবিলাসাদি ত অপরাপর জন্মে করিয়াছি; একবার ভাবিতেছি না যে, কেবল ভোগবিলাসাদির জন্য মানুষ জীবন নয়; মনুষ্য জীবনে ইহা অপেক্ষা আরও একটী প্রধান কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইতেছে, যে কার্য্যের দ্বারা সমস্ত কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়; বিষয়াদি ভোগের মধ্যে যে কর্ম্মের ভাব অনুভব করিতে পারিলেই এক বিষয়াদি ভোগ হইতেই সেই আসলকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সেই আসল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করা প্রধান আবশ্যক। সমস্ত বস্তুতে দয়াময় শ্রীহরির ভাব উপলব্ধি করিতে না পারিলে আসল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইল না, ও মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইল না। তাই বলি, যখন ক্ষণ কালের নিমিত্ত ভগবান শ্রীহরির ভাব উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, যিনি আদর করিয়া কথা কহিবার শক্তি দিয়াছেন, ক্ষণকালের নিমিত্ত যখন তাঁহাকেই প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিলাম না, মুহূর্ত্তের নিমিত্ত হস্তের দ্বারা, শ্রীগুরুর সেবা করিয়া হস্তের সার্থকতা করিতে পারিলাম না, তখন কিরূপে আমি মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চাই?

(ক্রমশঃ)

ভিক্ষা।

কত জন্ম পরে, মনুপুত্র করে
আনিতে সংসারে মোরে
ক্লেশ নানামত করিলে হে নাথ!
দীন জনে দয়া ক'রে।
তব মায়া বলে, কেমন কৌশলে,
রাখিলে গর্ভের মাঝে।
দশ মাস পরে, আনিলে আমারে
লোকালয়ে কিবা সাজে!
চক্ষু কর্ণ দিয়ে কেমন সাজায়ে
কতই যতন ক'রে,
আহা মরি মরি! কিবা মনোহারী
গঠিলেন নাথ মোরে!
দিয়েছ চরণ করিতে ভ্রমণ,
যথা ইচ্ছা যাইবারে।
হয় কি কথন বাসনা এমন
তীর্থে তীর্থে ভ্রমিবারে?
দুই হাত দিয়ে নানা দ্রব্য নিয়ে
ইচ্ছামত কত খাই।
করিতে পূজন- ও রাঙা চরণ-
কভুত নাহি বাড়াই।
দিয়াছ হে আঁখি তুমি কমল-আঁখি!
করিবারে দরশন।
দেখিয়া দেখিয়া, মোহিত হইয়া,
কত করি নিরীক্ষণ।
পৃথিবীর শোভা হেরি মনোলোভা,
আত্মজ্ঞান হারা-হই॥
করি কি দর্শন সে রূপ মোহন,
আমারে গঠিল যেই?

দিয়াছ হে মন জগত-জীবন !
 তব রূপ ধরিবারে।
অন্তরে অন্তরে, অতি যত্ন ক'রে,
 পলাইতে যেন নারে ॥
বসে যোগ ধ্যানে, পবিত্র আসনে,
 শুদ্ধ শান্ত করি' মন ,
করি' অবহেলা, সংসারের জ্বালা,
 চিন্তা করি' বিসর্জ্জন ,
করি কি কখন ওরূপ ধারণ ?
 করি' মন মগ্ন তায়?
ডাকি কি কাতরে, দিনেকের তরে,
 তোমারে হে কৃপাময় ?
তবু দয়াময় ! সকল সময়
 যোগাই'ছ মোর তরে।
দ্রব্য নানা মত, হৃদয় বাঞ্ছিত,
 দিতেছ হে অকাতরে।
আমি কি অসার ! প্রতি-উপকার,
 অথবা তোমার গুণ ,
করি না কখন , গাইনা কখন;
 মোর কপালে আগুন !
কি করি উপায় ? ওহে দয়াময় !
 নিজ গুণে কর দয়া ;
অধম সন্তানে, শ্রীচরণ দানে,
 দূর কর মোহ মায়া ।
মাগি এই বর, জন্মজন্মান্তর,
 যুক্ত রেখ তব পায় !
সে ঘোর বিপদে, যেন হরিপদে ,
 ঠেলোনাহে রাঙাপায়।

ভক্তিতত্ত্ব।

(লক্ষণঅধ্যায়)।

প্রিয় ভক্তবৃন্দ! পূর্ব্বে ভক্তিতত্ত্বের সূচনায় পরে ভক্তির লক্ষণ বলিবার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলাম, এক্ষণে তাহা কথঞ্চিত প্রকাশ করিতেছি। যখন প্রাচীন মত সকল উল্লেখ করিয়া ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ করিতে হইবে, তখন এই অংশে কিছু সংস্কৃত শ্লোকাদি বেশী উল্লেখ করিতে হইবে; সুতরাং পাঠক বৃন্দের একটু প্রণিধান প্রার্থনা করি। শ্রীনারদ ঋষি যেপ্রকার ভগবদ্ভাবে ভাবিত ছিলেন এবং নিরন্তর হরি গুণ গাথা গান করিয়াই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন, নামে যে কি রস, নামযোগীর যে কি রকম অবস্থা ও আচরণ বা নামযোগী কিরূপ প্রীতিপ্রফুল্ল ভাবে সকলের বিশ্বাসী ও আদরণীয় হইয়া সংসারে ভ্রমণ করেন, তাহার তিনি একমাত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভক্তিভাবে যিনি বিহ্বল, ভক্তিরসে যিনি রসিক, ভক্তিভাব তাঁহারই ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা হয়, এবং তাঁহার কৃত লক্ষণাদি সম্পূর্ণ সত্য ও মধুর বলিয়া গ্রহণ করা যায় ঐঋষিবর নিজকৃত ভক্তিসূত্রে প্রথমতঃ ভক্তির লক্ষণ বলিলেন, যথা—

"সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা"

"পরমেশ্বরে ঐকান্তিক প্রেমের নামই ভক্তি।" এই সূত্রটীর তাৎপর্য্য বা লক্ষ্য, প্রায় যাঁহারা প্রেমময় শ্রীহরিকে প্রাণের প্রাণ, প্রাণবল্লভ বলিয়া মধুরভাবে উপাসনা করেন, তাঁহাদের ভাবে লক্ষিত হয়, আপন পতিতে যেমন প্রীতি বা প্রেম, তদ্রূপ বা ততোধিক ভাবে সেই প্রেমময় শ্রীহরিকে ভালবাসার নামই প্রেমরূপা ভক্তি। ইহার অধিকারী উচ্চ ও বিরল। যাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের একান্ত কৃপা ও শ্রীগুরুর বিশেষ শক্তিসঞ্চার হইয়াছে তাঁহারই ভাগ্যে এভাবের সত্তা উপলব্ধি হয়। পরে বলিলেন।—

"অমৃতরূপাচ"

অর্থাৎ "ঐ পরম প্রেমরূপা ভক্তিই অমৃতময়ী। অথবা শ্রীভগবানে যে অমৃতরূপ ভাব, তাহার নাম ভক্তি" অর্থাৎ শ্রীভগবানে পরম প্রেম হইলে, নিষ্কাম ও নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহাকে ভালবাসিতে বা ভাবনা করিতে পারিলে, উহা অমৃতময় রস আস্বাদন করায়, ঐ অমৃত স্বরূপিণী ভক্তি, মুক্তি অপেক্ষা প্রীতিপ্রদা এবং নিরন্তর পরমানন্দদায়িনী। উহা লাভেই ভক্ত অনন্যকর্ম্মা হইয়া অপর কর্ত্তব্য সকল ভুলিয়া নিরন্তর পরমানন্দে বিহ্বল থাকেন।

ঐ ভক্তি সূত্রের তৃতীয় অনুবাকে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির মত প্রকাশ করিতেছেন যথা—

পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ।

"*পরাশর তনয় শ্রীব্যাসদেব বলিলেন যে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা*-দিতে যে অনুরাগ, তাহার নাম ভক্তি" অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের অর্চ্চনা না করিলে, সময়ে ভগবানের প্রীত্যর্থে যথাযোগ্য উপচার কল্পনা করিতে না পারিলে মনের ক্ষোভ; আবার যথাযোগ্য উপচারাদি দ্বারা যথা সময়ে অর্চ্চনা বন্দনা প্রভৃতি করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ, এইরূপ ভাবের নামই ব্যাসের মতে ভক্তি।

"কথাদিষ্বিতিগার্গঃ"

"গর্গ ঋষি বলিয়াছেন, সর্ব্বদা শ্রীভগবানের কথা অর্থাৎ নাম গুণাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তনেতে যে একান্ত অনুরাগ তাহার নাম ভক্তি"। অর্থাৎ যখন ভগবানের কথা ও তাঁহার নাম বা লীলাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছুতে মনের তত প্রীতি লাভ হইবে না, হরি গুণানুবাদ কীর্ত্তনেই যখন মনে শান্তি বোধ হইবে, সেই ভাবের নামই ভক্তি।

"আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ"

" শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন, সমস্ত বিষয়েই আত্মরতির

অনুকুল যে অনুরাগ, তাহারই নাম ভক্তি ”

অর্থাৎ জগতের সমস্ত কার্য্য, সকল জীব, ও সকল বিষয় এক মাত্র সেই পরাৎপর পরমেশ্বরেরই লীলা বা স্ফূরণ, এই ভাবে যে হৃদয়ে নির্ম্মল আনন্দ লাভ করা, তাহার নাম আত্মরতি। তাহারই অনুকুল বা ঐ ভাবের অবিরোধী রূপে সংসারের যাবতীয় কার্য্যের প্রতি যে ভালবাসা বা আগ্রহ তাহার নাম ভক্তি।

“সাপরানুরক্তিরীশ্বরে ”

শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রে বলিলেন যে, পরমেশ্বরে যে পরা অনুরক্তি [পরমপ্রেম ভাব,] তাহার নাম ভক্তি। জগতের বস্তু সকল যদিও আগ্রহের সহিত একান্ত মনে ভাল বাসি, তবু তাহা নশ্বর বলিয়া অপরানুরক্তি নামে অভিহিত হয়; আর অবিবেকীর বিষয়ের প্রতি যেরূপ অনন্য মন ও অনন্য প্রেম পরমেশ্বরে ঐরূপ হইলে তাহাকে পরানুরক্তি বলে। উহাই শাণ্ডিল্য ঋষির মতে ভক্তি।

এক্ষণে শ্রীনারদ ঋষি নিজের মত প্রকাশ করিতেছেন।

‘নারদস্তু তদার্পিতা খিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা ইতি”

শ্রীনারদ ঋষির মতে “শ্রীভগবানে সমস্ত কর্ম্ম ও সাধন ভজন আচার ব্যবহারাদি সকল অর্পণ করা এবং তাঁহাকে ভুলিলে যে প্রাণের অত্যন্ত ব্যাকুলতা তাহার নাম ভক্তি ”। অর্থাৎ সর্ব্বদা সকল কার্য্যের ফল ও প্রভুত্ব তাহাতেই অর্পণ করা, এবং তিনি যাহা করাইবেন তাহাই করিব, তিনি যখন যে পথে চালাইবেন সেই পথেই চলিব, আমি যাহা করি বা করিব, সে সমস্তই তাঁহার আজ্ঞা বা ইচ্ছা; লীলাময়ের ইচ্ছা ব্যতীত আমার ইচ্ছায় কিছুই হইবার নয়, সুতরাং সকল কার্য্যেরই প্রভু তিনি; আমার কিছুতেই কর্তৃত্ব নাই, সকলই তাঁহার, এই ভাবে পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করার নাম ভক্তি। এবং সঙ্গদোষেই হউক, বা অনন্তকাল-সঞ্চিত অজ্ঞান কল্পিত আমিত্ব সংস্কারের দোষেই হউক, শ্রীভগবানের কর্তৃত্ব ভুলিয়া

নিজের কর্ত্তৃত্ব আসিলে যদি প্রাণের ব্যাকুলতা হয়, অর্থাৎ অশান্তি বোধ হয়, আবার ভগবানের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের জন্য বিশেষ যত্ন করিতে চেষ্টা করা, এবং পূর্ব্বের ব্যতিক্রমের জন্য অনুতাপ করা (হে ভগবন আমি দিবা নিশি যাহা করিব, যাহা বলিব, যাহা যাহা ভাবিব, সে সমস্তই যেন তোমার ভাবে, তোমার অধীনে, তোমার কর্ত্তৃত্বে, বা তোমার ইচ্ছাতেই হইতেছে, আমাকে সর্ব্বদা সেই ভাবে রাখ, বৃথা অভিমানে মত্ত করিয়া আর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করাইওনা) এই ভাবের ব্যাকুলতার নামই নারদ ঋষির মতে ভক্তি। প্রিয় ভক্তবৃন্দ! এই সূত্রটী বড়ই মধুর। এই সূত্রটী বিস্তার করিলে আমাদের কর্ত্তব্য উপাসনাকাণ্ডের সকল কথাই বলিতে হয়, এবং বলিবার ইচ্ছা হয়। আমি ইচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষণের ক্রম ভঙ্গ হইবে বলিয়া ইঙ্গিতমাত্র আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া রাখিলাম। আপনারা এই সূত্রটীর যথার্থ সার চিন্তা করুন, এবং ইহার তাৎপর্য্যার্থ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করুন। শান্তি পাইবেন, ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবেন, আনন্দ সাগরে আপ্লুত হইবেন; হৃদয়ের জ্বালা, প্রাণের অশান্তি, প্রতি কাজে বিক্ষেপ ও চিত্তের চঞ্চলতা একেবারে ঘুচিয়া যাইবে। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে, পরিবর্ত্তন শীল মর্ত্ত্যধামে, এই বিষয়াসক্ত চঞ্চল প্রাণে, স্থায়ী অমৃতময় পরমানন্দ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। (নারদ ভক্তিসূত্র পরে আদ্যন্ত প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। সুতরাং এস্থলে ঐ অমৃতময় গ্রন্থের অন্যান্য লক্ষণ তুলিলাম না ক্ষমা করিবেন)।

অপর গরুড় পুরাণে বলিয়াছেন—

"ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী"॥

"ভজ ধাতুর অর্থ সেবা, সুতরাং ভজ ধাতু হইতে যখন ভক্তি

শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তখন ভক্তি শব্দে ভগবৎসেবা বুঝায়। ঐ সেবা সাধনভূয়সী (বহু বহু সাধনযুক্তা), অথবা নানাবিধ সাধনের দ্বারা ঐ ভগবৎ সেবা বহুবিধ হইয়া থাকে"। বাস্তবিক পূর্ব্বেও কৃষ্ণানুকূলে সেবার কথা বলা হইয়াছে, এখানেও তাহাই বুঝিতে হইবে। যে সেবায় আত্মসুখ বা কোন অভিলাষ সিদ্ধির কামনার লেশমাত্রও থাকিবে, তাহা উত্তমা ভক্তি রূপে অভিহিত হইতে পারে না, কামনাশূন্য হইয়া কেবল ইষ্টদেব-প্রীত্যর্থ যে তাঁহার সেবা (অর্চ্চনাদি) তাহার নাম ভক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিল ও দেবহুতি সংবাদে বলিয়াছেন—

দেবানাং গুণ লিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাং।
সত্ত্ব এবৈক মনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাসু যা কোশং নিগীর্ণমনলোযথা।"

দেবহুতির নিকট উত্তমাভক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া শ্রীকপিলদেব বলিলেন "হে মাতঃ! শুদ্ধসত্ত্ব নির্ব্বিকার-চিত্ত পুরুষের, বিষয় গ্রহণ পটু ইন্দ্রিয়গণ, এবং নিখিল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান বশতঃ শ্রীগোবিন্দে যে নিষ্কামা বৃত্তি, (অর্থাৎ শ্রীভগবানে একান্ত রতি) তাহাকেই ভক্তি বলে। ঐ ভক্তি সকল সিদ্ধি এবং মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠা। হে মাতঃ! সর্ব্বোত্তমা ঐ ভক্তি হইলে, জঠরাগ্নি, ভুক্তঅন্নাদি যেমন অনায়াসে পরিপাক করে, সেইরূপ যত কিছু কর্ম্ম [পাপ ও ভোগসাধক পুণ্য] ও কর্ম্মাশয় থাকে, তৎসমুদয়ই অনায়াসে ক্ষয় করে, অর্থাৎ ঐ সকল কর্ম্ম ও সকল কর্ম্মের ভাব শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত করিয়া দেয়।"

এখানে ভক্তির লক্ষণ নির্ম্মলা মনোবৃত্তি বিশেষ করিলেন, কোন কামনা, কোন বাসনা থাকিবে না, অথচ স্বভাবসিদ্ধ যখন শ্রীভগবানেই মনের গতি হইবে, জলের যেমন নিম্নদিকে বৃত্তি প্রতিরোধ

সত্ত্বেও অন্তরে অন্তরে নিঃসারিত হয়, সেইরূপ অনন্ত অনন্ত প্রতিরোধক থাকিলেও যে অন্তরে অন্তরে শ্রীভগবানে রতি, তাহারই নাম ভক্তি। এই ভক্তি একবার জন্মিলে, আর অন্যথা হয় না, সকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণেরও ভগবানেই রতি জন্মাইয়া দেয়, তখন আর সঞ্চিত পাপাদি কিছুই থাকেনা, সমস্তই ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবানের ভাবে শুদ্ধ হইয়া যায়, এ বড় উত্তম অবস্থা, বিশেষ ভাগ্য না থাকিলে ইহা হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে আহ্বান করিয়া সপ্রেমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস প্রহ্লাদ! এতাবৎ কাল গুরু গৃহে থাকিয়া অনেক বিষয়ই শিখিয়াছ; বল বৎস! সকল অধ্যয়নের সার কি। অধ্যয়নের বলে তোমার কি ভাব হইয়াছে। যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ তাহার মধ্যে কি উত্তম তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। তখন ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ হৃদয়, পরম ভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ প্রফুল্ল বদনে সকল অধ্যয়নের সারভূত যাহা বলিলেন, তাহা প্রথমত ভক্তিরই লক্ষণ—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেধীতমুত্তমম্।"

"হে পিতঃ! শ্রীবিষ্ণুর গুণানুবাদ, শ্রবণ ও কীর্ত্তন, এবং স্মরণ, আর শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবা, এবং অর্চ্চনা, শ্রীভগবানের বন্দনা [নমস্কারাদি,] তাঁহাতে দাস্যভাব, এবং শ্রীভগবানে সখ্যভাব, এবং তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ, এই নববিধা ভক্তির লক্ষণ। এই নবলক্ষণা-ভক্তিই আমি সকল অধ্যয়নের সার বলিয়া মনে করি।"

ভক্তবৃন্দ! ভক্তিযাজক ভক্তগণের এই নবলক্ষণা ভক্তিই উপাস্য, তাহারা ইহার অনুষ্ঠানেই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরিকে

একান্ত বাধ্য করেন। এই নবলক্ষণা ভক্তির প্রশংসা সকল পুরাণে সকল শাস্ত্রেই মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন এবং অদ্যাপিও যে যে স্থানে শুদ্ধ শান্ত ভক্ত আছেন, তাঁহারা এই রূপেই ভগবৎসেবায় পরমানন্দে কালাতিপাত করিতেছেন, এই নব লক্ষণের অনুষ্ঠান পদ্ধতি আপনা-দিগের নিকট "ভক্ত কর্ত্তব্য" অধ্যায়ে প্রকাশ করিব কিরূপে শ্রবণ কিরূপে কীর্ত্তন ও কিরূপে বন্দনাদি করিতে হয় তাহা সেইখানেই ব্যক্ত করিব আশা রহিল।

ভক্ত পাঠক! অন্যত্র শাস্ত্রে লিখিয়াছেন—

" অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ "

" অন্য বিষয়ে অভিলাষ (কামনা) শূন্য হইয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা অনাবৃত ভাবে অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের ফলের প্রতি স্পৃহা রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত যে অনুশীলন (নাম,ও গুণ , শ্রবণ, কীর্ত্তন বা উপাসনা) তাহার নাম ভক্তি। " নারদ পঞ্চরাত্রে এই লক্ষণটীর সম্পূর্ণ অনুকূল ভাবেই ভক্তির লক্ষণ করিলেন যথা—

"সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে "।

"সকল উপাধিরহিত অর্থাৎ সকল রকম কামনাশূন্য হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের তিনিই অধীশ্বর এই ভাবে ইন্দ্রিয়গণের গতি সেই আনন্দময় ভগবানেতেই রাখিয়া, ঐ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ যে শ্রীভগবানের যে সেবা (উপাসনা) তাহার নামভক্তি"।

এই যত ভক্তির লক্ষণ বলা হইল, আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, বাস্তবিক সকল লক্ষণেরই তাৎপর্য্য একমাত্র শ্রীগোবিন্দ কে আপন বলিয়া স্থির করা, বা অর্চ্চনা করা। সুতরাং সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কামভাবে সকল কর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিয়া, তাঁহাকে অন্ত-

র্য্যামী বা শান্ত, দাস্য, সখ্য ও মধুরাদি যে কোন ভাবেতেই হউক না কেন, ভালবাসিতে হইবে; ঐ ভালবাসার নামই ভক্তি"। মানব যখন অবিদ্যার ভাব ভুলিয়া শ্রীগুরুর কৃপায়, সাধুসঙ্গ বলে, নিজের কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানকে একেবারে ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করত একমাত্র বিশ্ববিধাতা সর্ব্বজীবজীবন শ্রীগোবিন্দকেই হৃদয়ের ঈশ্বর বলিয়া, প্রাণের একমাত্র প্রেয়ঃবস্তু ভাবিয়া, জীবনের একমাত্র শান্তিময় বিশ্রাম স্থান মনে করিয়া ভাল বাসিতে পারে, তখনই এই যাবতীয় ভক্তি লক্ষণের ভাব পরিলক্ষিত হয়। ঐ নির্ম্মল ভালবাসা লাভ করা বড় সহজ নয়, উহা লাভের জন্য অনেক প্রার্থনা, অনেক উপাসনা, অনেক চিন্তা করিতে হয়। আবার উহা লাভ করিলেও যে ভক্ত নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকেন, তাহাও নয়, তখনও ভক্তির অনুকূল অনেক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আছে, কিছু কিছু, পরে আপনাদের নিকটই ব্যক্ত করিব।

(ক্রমশঃ)

—:০:—

শ্রীগুহরাজ।

শ্রীভগবানে আত্যন্তিক ভালবাসা অর্থাৎ অহৈতুকী রতির নামই প্রেম। কারণ ভগবান নিত্য বস্তু, ও নিত্য বস্তুতে যে ভালবাসা তাহা নিত্য, এবং প্রেম ও নিত্য, সুতরাং তাঁহাকে ভালবাসার নামই প্রেম। অনিত্য বস্তুতে ভালবাসার নাম প্রেম নয় উহাকে কাম বলে কাম দুঃখ দায়ক অনিত্য ভগবদ্ভক্তির অন্তরায়।

এই প্রেম জাগতিক পদার্থে সম্ভবে না, আমরা স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবাদিকে ভালবাসিয়া থাকি, কিন্তু ইহা যথার্থ প্রেম নয়। কারণ আমরা অনিত্যবস্তুতে মোহের বশে বা স্বার্থপরতার দাস হইয়া ভাল বাসিয়া থাকি কাহারও রূপ দেখিয়া বা কোন দ্রব্য মিষ্ট লাগে বলিয়া তাহাকে ভালবাসি, তাহা হইলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদিতে মোহিত হইয়া ভালবাসি; উহাদের প্রকৃত নিত্য সত্বা বুঝিয়া ভালবাসি না সে জন্য স্বার্থলাভ ছুটিলেই মোহ ভাঙ্গিলেই সেই ভালবাসা পলায়। নিঃস্বার্থ ভালবাসা গোপ গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেইরূপ, ভালবাসার নামই প্রেম। কারণ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বস্তু তাঁহার প্রতি যে অনুরাগ তাহাই প্রেম। এভালবাসা বা অনুরাগে স্বার্থপরতা নাই, ইহার দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। গোপ গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া তাঁহাকে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবে ভাল বাসিত, তাহা তাঁহারাই জানেন। ঐরূপ প্রেম ক্ষুদ্র ও সীমা বদ্ধ নহে। ইহাতে কোনও সঙ্কুচিত ভাব নাই, ইহা জাগতিক বাধা মানে না। পবিত্র প্রেম বা ভালবাসা জাতিবিচারের অপেক্ষা করে না। ধন জনের আশায় বিক্ষিপ্ত হয় না ইহার প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ না করিয়া ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ ও গোয়ালার ঘরে অবস্থান করিয়াছিলেন। কারণ সেখানকার প্রেমের এমনি টান, যে

তিনি কেবল নন্দালয়ে আসিয়াছিলেন তাহা নহে, শ্রীনন্দের বাধা মাথায় করিয়া বহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে শ্রীভগবানে এইরূপ প্রেম অনেক জন্মের প্রার্থনা উপাসনা ও সাধনার ফল। আজ যদি আমার কোন আত্মীয়কে বলা যায় যে আমার এই উপকার করিলে আমি কোন ভয়ানক যন্ত্রনা হইতে উদ্ধার হই; পরন্তু তোমাকে ঐ যন্ত্রনার কিয়দংশ ভোগ করিতে হইবে কিম্বা তোমাকে নরকে যাইতে হইবে, তাহা হইলে তিনি কখনও তাহা করিতে স্বীকৃত হইবেন না। কারণ তাহার ভাল বাসায় স্বার্থমাখা রহিয়াছে। নিঃস্বার্থ ভাবে জীবের প্রতি মহাপুরুষগণও দয়া করিয়া প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়াছেন, বাইবেলে লিখিত আছে— যখন মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্টকে তাঁহার শত্রুরা ক্রুশে বিদ্ধ করিতে যায় তখন তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "হে ভগবন্! ইহারা কি করিতেছে তাহা বুঝিতেছে না। আপনি দয়া করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করুন।" এইরূপ ভালবাসার নামই প্রেম। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ ছোট বড় না বাছিয়া মার খাইয়াও জীবকে চিরদুঃখ চিরঅশান্তি ও চিরহতাশ হইতে উদ্ধার করিবার মানসে কোল দিতেন। ইহারই নাম প্রেম। শ্রীরাম অবতারে গুহক চণ্ডালের যে ভগবানে ভালবাসা, তাহাই প্রেম। আমরা বলিয়া থাকি প্রেমডোরে ভগবানকে বাঁধা যায়, কিন্তু যাথার্থ প্রেম হইলে তবেই তাঁহাকে বাঁধিতে পারা যায়। গুহরাজ যে ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রকে কিরূপে ভালবাসিয়াছিলেন, এবং চণ্ডাল হইলেও তাঁয়ার যে ভগবানে কত প্রেম ছিল শ্রীরামচন্দ্র কিরূপ তাহার প্রেমে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া জগতে নির্ম্মল ভালবাসার উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন তাহাই আমাদের অদ্যকারআলোচ্য বিষয় হউক।

শ্রীগুহরাজ নামক কোনও এক চণ্ডাল ভীল দেশের রাজা ছিলেন, চণ্ডাল হইলেও তাঁহার শ্রীভগবানে অত্যন্ত প্রেম বা ভালবাসা ছিল শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থে পতিপ্রাণা-সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের

সহিত বন গমন কালে গুহরাজের বাটীর নিকট দিয়া গমন করিতে ছিলেন। তিনি তাঁহাদেব রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং আনন্দের সহিত দৌড়িয়া তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে মৈত্র বলিয়া সম্বোধন করত আলিঙ্গন করিলেন, তখন গুহরাজ তাঁহা দিগকে সাদবে আগ্রহের সহিত বটীতে আনিলেন ও তাঁহাদের প্রীতি সাধনের জন্য যত্নবান হইলেন কোথা হইতে কোন দ্রব্য আনিয়া যে তাঁহাদিগকে আহার করাইবেন সে জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু শ্রীরাম চন্দ্র বলিলেন মৈত্র! আমি প্রতিজ্ঞা কবিয়াছি যে চৌদ্দ বৎসর ফল মূলাদি ভিন্ন আর কিছু গ্রহণ করিব না। তখন তিনি নানাবিধ ফলাদি আয়োজন কবত প্রেমের সহিত তাঁহাদিগকে খাওয়াইলেন। পরন্তু শ্রীবামচন্দ্রের মুখে তাঁহাব বন গমনের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করত অত্যন্ত অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বলিলেন মৈত্র! আমি তোমায় বনে যাইতে দিব না, এই রাজ্যাদি সকলই তোমার চরণে অর্পণ করিলাম। তুমি এইখানেই থাকিয়া মা জানকীর সহিত রাজত্ব কর। ইহা দেখিলেই আমি চিবসুখী হইব, কিন্তু যখন দেখিলেন যে কিছুতেই রামচন্দ্র থাকিবেন না তখন একবার ভরতের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে আমি এখনই সসৈন্যে ভরতের রাজ্য লইয়া তোমাকে তথায বসাইব। কিন্তু জানকী-নাথ শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে নানা প্রকাবে বুঝাইলেন যে ইহাতে ভ্রাতা ভরত বা পিতা মাতার কাহারও দোষ নাই, যাহা দৈবের ঘটনা তাহা হইবেই। হে মৈত্র! মনুষ্যের সুখ ও দুঃখ সকলই যখন দৈবের অধীন ইচ্ছা হইলেই জীব আপন সুখভোগ্য ভোগ করিতে পারেনা তখন অনিশ্চিত সুখ-ভোগ বাসনায় ধর্ম্মপথ ও গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কোনও মতেই বিধেয় নয়; মিত্রবর! তুমি দুঃখিত হইও না আমার প্রতি তোমার নির্ম্মল ও অকৃত্রিম ভালবাসা আমি বেশ বুঝিয়াছি আমি তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি জীবনে কখনও তোমার বন্ধুতা ভুলিতে পারিব না। মিত্র! পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ বন গমনে

আমার কোনই কষ্ট হইবে না তুমি স্থির হও নতুবা আমি দুঃখিত হইব। রাম এইরূপে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্তনা করিয়া বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু গুহরাজের প্রেম অসীম, তিনি ভগবানের বিচ্ছেদে অস্থির হইয়া সকল সুখ জলাঞ্জলি দিলেন সেই দিন হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য ফলমূলাহারে, মৃত্তিকাদিতে শয়ন ও অবিরাম অশ্রুবর্ষণ করত কাটাইয়া ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইলেই তিনি তাঁহাকে দর্শন দিবেন, কেবল সেই আশাতেই প্রাণধারণ করিয়া ছিলেন। পাঠকবৃন্দ দেখুন নির্ম্মল ভালবাসার কি অপূর্ব্ব শক্তি। জাতিকূল মানেনা, বিদ্যা বুদ্ধির অপেক্ষা করেনা, রাজা প্রজার পার্থক্য বিচার করিতে দেয় না। নিঃস্বার্থ ভালবাসায় লোক আত্মসুখ ভুলিয়া যায়। * *

যে দিবস চৌদ্দবৎসর পূর্ণ হইবে সেইদিন গুহরাজ আনন্দের সহিত সমস্ত রাজ্য সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু যত বেলা হইতে লাগিল তাঁহারও তত উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। শেষে যখন দেখিলেন যে তখনও শ্রীরামচন্দ্র আসিতেছেন না, তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে আমার এ দেহে আর কাজ কি? ভগবান ছাড়া হইয়া দেহ না থাকাই ভাল সুতরাং ভৃত্যাদিকে চিতা সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন, এইরূপে চিতা প্রবেশ করিবেন এমন সময়ে "জয়রাম জয়রাম" এইরূপ গম্ভীর শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন কোথা হইতে এই শব্দ আসিল ইহা অনুসন্ধানার্থে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না; পুনরায় ঐরূপ "জয়রাম জয়রাম" শব্দ আরও নিকটে উর্দ্ধদিক হইতে আসিতেছে শুনিতে পাইলেন, তখন উর্দ্ধদিকে দেখেন একটী প্রকাণ্ড জীব বিশেষ, মধুর "রাম" নামে দেশ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নামিয়া আসিতেছে। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে এই জীব উপর হইতে নামিয়া যথায় গুহরাজ চিতার

নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ইনি আর কেহই নয়, সেই পরম ভক্ত শ্রীহনুমান ভক্ত মুখে শ্রীরামের নাম মধুময় হইয়া নিঃসৃত হয়, তাহা নিতান্ত পাষণ্ড ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ও ভগবদ্বিরোধীরও প্রাণকে ক্ষণকালের নিমিত্ত টলাইতে পারে, ভক্তের নিকটত অধিকতর মধুময় হইবেই তাই আজ হনুমানের মুখে "রাম" নাম শুনিয়া গুহরাজের প্রাণে পুলক আসিল, এবং নৈরাশ্য কোথায় চলিয়া গেল নেত্রে অশ্রুপাত হইল; দৌড়িয়া হনুমানের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন, হনুমান নানা প্রকারে গুহরাজকে শান্তনা করিলেন এবং আশ্বাস বাক্য দিয়া বলিলেন যে প্রভু রামচন্দ্র, মা জানকী ও কনিষ্ঠ লক্ষ্মণের সহিত শীঘ্রই তাঁহার বাটীতে আসিতেছেন। তখন ভীলরাজ্য পুনরায় নব আনন্দে নাচিয়া উঠিল, সকল বাটীতেই আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল এবং প্রত্যেক দ্বারই মঙ্গলসূচক দ্রব্যে সজ্জিত হইতে লাগিল। রাম প্রেমে বিহ্বল গুহরাজ বড়ই আনন্দিত মুনিহারা ফণির মণি প্রাপ্তির ন্যায় মৃতদেহে পুনঃ প্রাণলাভের ন্যায় দুঃখীর হারাধন প্রাপ্তির ন্যায় চতুর্দ্দশ বৎসরের পর প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রকে পাইবেন বলিয়া জগৎ যেন শান্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন, রাজ্যের সকলেই আজ প্রফুল্ল সজীব নির্জ্জীব সকলেই যেন পরমানন্দে বিহ্বল। রাজবাটী যেন শ্রী রামের আগমন প্রতীক্ষায় হাসিতে লাগিল। এমন সময় কতকগুলি লোক বলিয়া উঠিল ঐ রথের পতাকা দেখা যাইতেছে, সকলেই সেই দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে শ্রীভগবানের রথ ভীলরাজের বাটিতে আসিয়া উপস্থিত, রথের উপর নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরাম, বামে অপূর্ব্ব কান্তি মা জানকী, ও দক্ষিণ পার্শে সুন্দরমূর্ত্তি লক্ষ্মণ কি শোভা ধারণ করিয়াছেন, হনুমান গিয়া পদতলে পড়িলেন। গুহকরাজ দেখিয়া ভাবেবিভোর হইলেন; কিছুক্ষণ কথা কহিবার শক্তি রহিলনা স্থিরনেত্রে চাহিয়ারহিলেন।

মন! তুমিও একবার স্থির হইয়া রথের উপর এই শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া

লও আর তোমার আশাযাওয়া থাকিবে না একবার বদন ভরিয়া "জয়রাম শ্রীরাম" বলিয়া তোমার জীবন সার্থক কর। এই ছবি খানি হৃদয়-পটে আঁকিয়া রেখো আর লুকাইয়া লুকাইয়া মনের সাধে দেখ, তাহা হইলে মায়ামোহ, আর তোমায় সংসার সমুদ্রে ডুবাইতে পারিবে না। রাম নামের গুণে অনায়াসে ভবের কূলে গিয়া উঠিতে পারিবে।

গুহরাজ শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন, দুই নেত্র বহিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল কতকক্ষণ অনিমিষে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলন। তখন তিনি রামচন্দ্রকে নামাইয়া বাটীতে লইয়া গেলেন ও আদরে মনের সাধে নানাবিধ বসন ভূষণে তাঁহাদিগকে সাজা-ইলেন, তদনন্তর বহুদিনের সাধ মিটাইয়া মৈত্রকে বহু দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া খাওয়াইলেন ও আজ সেই চৌদ্দ বৎসর পরে নিজেও প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র কয়েক দিবস তথায় থাকিয়া তৎপরে মিত্র ও অন্যান্য সহচর সঙ্গে করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ধন্য গুহরাজ তুমিই ধন্য তোমার প্রেম অনির্ব্বনীয় তোমার প্রাণের ভিতর ভালবাসা যে কত প্রশস্ত পরিমাণে রহিয়াছে তাহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রচেতা কিরূপে অনুভব করিবে? তুমি চণ্ডাল। কে তোমায় চণ্ডাল বলিয়া নরকের দ্বার পরিষ্কার করিবে? তুমি সাধু হইতেও সাধু! আমি তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি। আমি বড়ই অধম ও নীচ আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার কণামাত্র প্রেম পাইয়াও শ্রীগুরুর চরণে আমার মতি স্থির রাখিতে পারি আমায় আশীর্ব্বাদ কর তুমি যেমন রামচন্দ্রকে ভালবাসিলে আমি যেন সেই ভাবে শ্রীভগবানকে ভালবাসিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। তাহা-হইলে শ্রীগুরুর কৃপা পাইয়া আনন্দে জীবন যাপন করিব।

নক্ষত্র।

কে তোমরা তারাগণ বিরহ অম্বরে,
নিজ নিজ জ্যোতিরাশি সন্ধ্যাকালে পরকাশি,
করিতেছ বিমোহিত মানব সবারে।
করিতেছ প্রকাশ কি পরম পিতারে?

অস্তমিত হ'লে রবি প্রদোষ সময়
দেখিতে দেখিতে কত দীপ্তিমান শত শত
হইলে হে প্রকাশিত দীপমালা প্রায়,
কে তোমরা বল বল নক্ষত্র নিচয়?

কোথা তোমাদের বাস দিনে কোথা র'ও
জানিনা যে কোথা হ'তে দিবা শেষে আচম্বিতে
হাসি হাসি আকাশেতে উদিত যে হও
উষায় তোমরা পুনঃ কোথায় লুকাও?

কেবা দিল তোমাদের এরূপ সুন্দর!
ক্ষণকাল একমনে চাহিলে তোদের পানে,
নানা ভাবে বিলোড়িত হয় যে অন্তর।
হেরিতে বাসনা হয় সেই কারিগর।

এমন সুন্দর রূপ যে গঠিতে পারে,
তাঁর তবে কিবা রূপ মনে হয় রসকূপ,
পার কি নক্ষত্রমালা দেখাতে তাঁহারে?
নয়ন জুড়াই আমি সেইরূপ হেরে।

হেন সুরসিক কোথা দেখেছ কি আর?
মোহিতে মানব-মন করিতে শোভা-বর্দ্ধন,
তোমাদের মাঝে পুনঃ সুধার আধার—
দিয়েছেন রসময় করিয়া বিচার।

তোমরা বলিতে পার ওহে তারাগণ!
করি কোন অভিপ্রায়, সেই হরি লীলাময়,
করেছেন তোমাদিগে সর্ব্বরি ভূষণ?
যাহা হেরি বিমোহিত মানবের মন।

এত কথা শুধাইনু উত্তর না দিলে,
নাহি শুনিলে শ্রবণে সন্দেহ হ'তেছে মনে,
রহিলে মূকের মত কথা না কহিলে
তবে কি হে অচেতন তোমরা সকলে?

বুঝেছি বুঝেছি আমি বুঝেছি অন্তরে,
যিনি অগতির গতি যিনি জগতের পতি
মঙ্গল স্বরূপ যিনি বিশ্বচরাচরে,
তাঁ'রই মহিমা লেখা নক্ষত্র অক্ষরে।

(গান।)

সময় থাকিতে মাগো করি নিবেদন।
অসময়ে দেখো যেন দিও দরশন।
নিকটে আসিলে কাল ঘটিবে কত জঞ্জাল,
কে জানে হইবে কিনা তোমারে স্মরণ।
যদি বা স্মরণ হয় রসনা অবশ রয়,
ডাকিতে নারিব মাগো যদি হয় মন।
জনম অধধি মোরে রাখিয়াছ কোলে ক'রে,
অকৃত সন্তান ব'লে করো না বর্জ্জন।
তোমারই মায়ায় ভুলে বিপথে বেড়াই বুলে,
বিচার সময়ে তাহা করগো স্মরণ।
সুপুত কুপুত হই তোমা ছাড়া কভু নই,
সকলই জান তুমি ভুলোনা তখন॥
নাহি মা সাধন বল নাহিক পুণ্য সম্বল,
ভরসা কেবল মাগো ওরাঙ্গা চরণ।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ।

ভক্তি ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী ।
ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তি ভক্ত্যাঃ পরং পদম্ ॥

বন্দনা ।

অনাদি কারণ বিভু জয় দয়াময় ।
দয়া কর দয়া-কর মঙ্গল-আলয় ॥
তোমার দয়ার বলে বিশ্বজীবগণ ।
বিশ্বনাথ ! যাহা চায় পায় সেই ধন ॥
ছোট বড় পশু পক্ষী আর প্রাণি যত ।
যার যাহা প্রয়োজন দিতেছ শতত ॥
আমরা দুর্ব্বল প্রাণী অধম সন্তান ।
দয়া ক'রে কৃপা দৃষ্টি কর ভগবান ॥
ভজন পূজন নাহি জানি তব স্তুতি ।
প্রার্থনা, তোমাতে যেন থাকে সদা মতি ॥
দাও প্রভু সরলতা ধরম প্রকৃতি ।
মঙ্গল করমে যেন যায় মম মতি ॥
ধর্ম্ম পথে ধর্ম্মময় চালাও আমারে ।
অন্তরে থাকিয়া ধর্ম্ম শিখাও অন্তরে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফল নাথ ! হয় সুখ দুখ ।
দেখিয়াও বুঝিনা তা' এই বড় দুখ ॥
পাপীর পাপের ভোগ দুঃখ দরশনে ।
পাপ কর্ম্মে ঘৃণা যেন হয় প্রতিক্ষণে ॥
সেই আর্য্যকূলে জন্ম করেছি গ্রহণ ।
তপ জপ যোগ যাগ যাঁদের জীবন ॥

যাঁদের ধরম রক্ষা করিবার তরে।
অবতরি, অরূপ ! অনন্ত রূপ ধ'রে॥
পাপীর পাপের ভোগ ধর্ম্মের সুগতি।
বুঝাইলে করি, বেদাগম স্মৃতি শ্রুতি ।
দান ব্রত সত্য শৌচে মন যেন যায়॥
দাও শিক্ষা এই ভিক্ষা মাগি তব পায়।
অনাথ দরিদ্র রোগী দীন হীন জনে।
দয়াময় দয়া যেন করি প্রাণ পণে॥
শ্রবণ করিতে নাথ দিয়েছ শ্রবণ।
কাহারো কুকথা যেন করেনা শ্রবণ॥
চরণ দিয়াছ সদা করিতে চরণ।
দে'খো যেন কুপথে না করি বিচরণ॥
বলিতে শকতি নাথ দিয়াছ আমারে।
দে'খ রুক্ষ কটু যেন না বলি জীবেরে॥
দিয়াছ শকতি আর যত দয়া ক'রে।
পারি যেন সে সব রাখিতে যত্ন ক'রে॥
ভাবিতে দিয়াছ মন ওহে নারায়ণ।
মন যেন ভাবে সদা তোমার চরণ॥
সুখে দুখে দীনবন্ধো ! দেখ দীন জনে।
দীনের সম্বল কিছু নাই তোমা বিনে॥

গুরু ও শিষ্য ।

লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জগতে বিষয়ভেদে নানা প্রকার গুরুর ভেদ হয়। শিল্পের গুরু লব্ধ নৈপুণ্য শিল্পী, বাণিজ্যের গুরু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বণিক, নীতির গুরু নীতিজ্ঞ, বিজ্ঞানের গুরু বিজ্ঞানবিৎ, এবং অধ্যাত্ম বিষয়ের গুরু পরমার্থজ্ঞ পণ্ডিত। যাহার যে বিষয়ে বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইয়া সেই বিষয় অপর সাধারণ অপেক্ষা অধিকতর সাধন-জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনিই সেই বিষয়ের গুরু হইবার উপযোগী অর্থাৎ সেই বিষয়ের অজ্ঞানতা দূর করিবার অভিজ্ঞতা প্রদান করিতে পারেন। এই অজ্ঞানতমঃ নাশ করিয়া অপেক্ষাকৃত

উজ্জ্বলতর জ্ঞান প্রদান করেন বলিয়াই তাঁহার গুরু সংজ্ঞা, এবং যিনি সেই জ্ঞান লিপ্সু হইয়া গুরুর শাসনাধীন হয়েন তিনিই শিষ্য।

আজন্ম একজনই গুরু নহেন, ভূমিষ্ঠ হইবার সময় আমরা প্রায় সকল বিষয়েই অজ্ঞ থাকি; কেবল জীবন রক্ষার জন্য যে কয়েকটী নৈসর্গিক শক্তির আবশ্যক তাহাই তখন পরিস্ফুট হয়; জাগতিক অন্য কোন জ্ঞান থাকে না। সদ্যঃ প্রসূত শিশুকে মাতৃস্তন কিরূপে পান করাইতে হয়, তাহা কাহাকেও শিখাইতে হয় নাই এবং তাহা কাহারও শিখাইবার সাধ্য নাই। মল মূত্রাদি ত্যাগ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সঞ্চালন ইত্যাদি ক্রিয়া সমস্তই ঐরূপ স্বভাবসিদ্ধ। এতদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত অন্যান্য ক্রিয়া শক্তি অনেক পরিমাণে আমাদের নিজ নিজ চেষ্টার সাপেক্ষ। যে সকল শক্তি ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে থাকে, তাহাকে নৈসর্গিক শক্তি কহে। কতকগুলি শক্তি আমাদের চেষ্টাতেই উদ্রিক্ত হয় এবং বিনা চেষ্টায় তাহাদের আদৌ স্ফূর্ত্তি হয় না। এই শক্তিগুলি অনৈসর্গিক বা চেষ্টা লব্ধ এবং তজ্জন্য যে চেষ্টার প্রয়োজন তাহার নাম পুরুষকার। এই পুরুষকার দ্বারা লব্ধ নৈপুন্য হইয়া অবোধ শিশু ক্রমশঃ বৈষয়িক ও পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করে। যখন জ্ঞান লাভ করে, তখন শিষ্য এবং যখন জ্ঞান প্রদান করিবার যোগ্য হয়েন তখন গুরু।

এইরূপে দেখা যাইতেছে সকলেই এক সময় শিষ্য এবং সকলেই এক সময়ে গুরু। জন্মাইবার পরেই জাগতিক যে কোন জ্ঞান আমরা লাভ করি, তাহা পিতামাতার নিকট হইতে করি, সেই পিতা মাতা আমাদের আদিগুরু। আবার পিতা মাতার মধ্যে মাতা সর্ব্বদা লালন পালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন বলিয়া, আমাদের অধিকাংশ সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিতে হয়। এই জন্য আমাদের ভাব প্রকৃতি অনেকটা মাতার ন্যায় হয়, "নরাণাং মাতুল ক্রমঃ" এই প্রচলিত কথাটির ভিত্তি ঐ মাতৃদত্ত জ্ঞান। মাতার স্বভাব তাঁহার মা, ভাই, ও বাপের মত হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই এবং সন্তানের

আচার ব্যবহার মাতার মত হওয়ায়, কাজে কাজেই তাহা মাতুলের মত হয়, স্নেহময়ী মাতার সন্তানের প্রতি যে অসীম স্নেহ তাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে আমাদের পূজ্য, ও ভক্তিভাজন, কিন্তু তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিলেও তিনি আমাদের বাঙনিষ্পত্তি, আচার ব্যবহার প্রভৃতি অধিকাংশ বিষয়ে সর্ব্ব প্রথমে জ্ঞান প্রদান করেন বলিয়া, আদিগুরু এবং পরমগুরু। অধিকাংশ সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির মাতৃশিক্ষা এবং মাতৃভক্তিই যে তাহাদের উন্নতির কারণ, তাহার ইতিহাসে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ভুবন-বিজয়ী সেকন্দর প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

যাহা পূর্ব্বে বলা হইল তাহাতে জ্ঞানই গুরুরসত্বা এবং গুরূপদেশ অন্ধকার গৃহে দীপ স্বরূপ। কি বৈষয়িক জ্ঞান, কি অধ্যাত্মিক জ্ঞান, সকল জ্ঞানই প্রকাশক। জ্ঞানেতেই দ্রব্যাদির গুণ ধর্ম্ম, আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা ও ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। জ্ঞানের প্রকাশক ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়ী এবং গুরুর এই জ্ঞানময় অংশের উপর শিষ্যের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া সকল গুরুর ধ্যানেতে তাঁহার মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়ী, গুরুরধ্যানে তাহার প্রকৃত দেহের উপর অদৌ লক্ষ্য নাই। তাহার দেহ গৌর হউক, শ্যামল হউক, তাঁহার জ্ঞানমূর্ত্তি সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল এবং শিষ্যের ধেয়।

জ্ঞান স্বভাবত স্বচ্ছ ও প্রকাশক হইলেও, ঐ জ্ঞানের, বিষয়যোগে এবং বিষয়ের গুণানুসারে বর্ণভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে। মদ্য আবিষ্কার হইবার পুর্ব্বে কাহারও মদ্যপানে প্রবৃত্তি জন্মাইবার ও অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং আবিষ্কৃত হইবার পরেও তৎপানে প্রবর্ত্তকের সঙ্গ না ঘটিলে, তাহা পানে প্রবৃত্তি হয় নাই। মদ্য আবিষ্কার করা অথবা মদ্যের গুণ বর্ণনা করিয়া তাহা পানে প্রবৃত্তি জন্মান, এই প্রত্যেকটীতে তৎ তৎ বিষয়ে অভিজ্ঞতার আবশ্যক, এবং তাহাও লৌকিক জগতে একপ্রকার জ্ঞানের কার্য্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম জগতে তাহা জ্ঞান নহে, তাহা অজ্ঞানপদবাচ্য। বিষয়ের অপবিত্রতা ও মালিন্যপ্রযুক্ত উহা আলোক হইলেও

কৃষ্ণবর্ণ আলোক ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না, মহাকবি মিলটন নরকে যে প্রজ্জলিত অন্ধকারে অগ্নি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে, বর্ণনা করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে ঐ আলোকের প্রকাশিকা শক্তি অত্যল্পমাত্র। কিন্তু উহার দাহিকাশক্তি ভয়ানক ! ঐ আলো কে কেবল অন্ধকারের দ্রব্য দৃষ্টিপথে আইসে মাত্র——

কিন্তু নারকীর প্রাণ উহার দহনে ভীষণ কষ্ট সহ্য করিতে থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে, যিনি এইরূপ অহিতকর বিষয় কি তাহাতে প্রবৃত্তি উদ্ভাবন করেন তিনি কৃষ্ণবর্ণ পাপ পুরুষ। অন্য শাস্ত্রমতে উহার নাম "শয়তান"। চৈতন্য শক্তির দ্বারায় উদ্ভাবিত হয় বলিয়া তিনি পুরুষ বটে কিন্তু তৎকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত বিষয়টী মানুষের যে নিত্য সুখ সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় তাহার বিরধী ও তমগুণ প্রধান এবং তৎ প্রবর্ত্তক পাপ পুরুষমাত্র।

এই বিশ্বসংসার মন্থন করিলে অজ্ঞানময় বিষ ও জ্ঞানময় অমৃত উভয়ই উদ্ভূত হয়, অজ্ঞানময় বিষয়———বিষ-ভোগেচ্ছায় ক্রমশঃ যন্ত্রনা বাড়িতে থাকে এবং অচৈতন্য করিয়া ফেলে, কিন্তু মঙ্গলময় নিত্যসুখ দায়ক জ্ঞানামৃত পান করিলে শান্তি ও আত্ম-প্রসাদ আইসে বিষয়বিষ দৈত্যেরা পান করেন এবং জ্ঞানামৃত দেবতাগণের পেয়। ধর্ম্মজগতের গুরু সংসার সাগর মন্থন করিয়া বিষয় বিষে বিরতি এবং জ্ঞানামৃত পানে রতি জন্মান। তাই তিনি শুভ্রবর্ণ তাঁহার শ্বেতবস্ত্র পরিধান এবং শ্বেতমাল্য চন্দন তাঁহার ভূষণ। বিশুদ্ধ চৈতন্যময় গুরুর পক্ষে বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাঁহার রূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাঁহার আচরণ এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাঁহার ভোগ্যবস্তু।

আমি কে ?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সংসার, স্ত্রী পুত্রাদি পরিবেষ্টিত; এই আদরের সংসারের দিকে যখন অবলোকন করি, মনে হয় বুঝি ইহার তুল্য স্থান আর নাই মনে হয় বুঝি আমাসম সংসারীও আব নাই। আমিই যথার্থ সংসারী মনে অহংকার রাখিবার আর স্থান খুঁজিয়া পাইনা, এই অহংকারই আমাদিগের কাল স্বরূপ, তত্ত্ব বিচারের সমস্ত ক্ষমতা অপহরণ করিতেছে, একবারও ভাবিতেছি না যদি যথার্থ সংসারীই হই, তবে সংসারের এত দুঃখ যন্ত্রনা পাই কেন? তবে একদিনের জন্যও মনে শান্তি অনুভব করিতে পারিনা কেন? এবং কেনই বা সংসারের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া "সংসারে সুখনাই" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি। আমার সংসার এবং আমিই সংসারী বলিয়া ত দিবানিশি বক্ষঃ স্ফীত করিয়া বেড়াইতেছি? কিন্তু একদিনের জন্য কি যাঁহাদেব কৃপায় সংসার অবলোকন করিলাম সেই পূজ্যপাদ পিতা স্নেহময়ী মাতাকে সুখী করিতে পারিয়াছি, একদিনের জন্য কি তাঁহাদের চরণ সেবা করিয়া পুত্রের যাহা কর্ত্তব্যকর্ম্ম তাহা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি? সংসারে থাকিয়া ত ভ্রাতা ভগিনীদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারিলাম না, স্ত্রী পুত্রাদিগকে ত সৎপথে অগ্রসর করিয়া সুখী করিতে পারিলাম না। আজ সামান্য অর্থের লোভে পড়িয়া প্রাণের ভ্রাতা দিগের সহিত কলহ করিয়া ভ্রাতৃস্নেহের উচ্চতা দেখাইতেছি, কাল বন্ধু বান্ধবের সহিত বিবাদ করিয়া বন্ধুতার উচ্চ পরিচয় দিতেছি, এইরূপ প্রত্যহই এক একটী অদ্ভূৎ কার্য্য করিয়া সংসারী বলিয়া সর্ব্বদা গর্ব্বিত হইয়া বেড়াইতেছি।

হায় হায়! এই কি যথার্থ সংসারীর লক্ষণ, না ইহারই নাম আদরের সংসার। শাস্ত্রকারগণ যে সংসারকে ধর্ম্মের সোপান বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আজ সেই সংসারে থাকিয়া আমি সর্ব্বদা

অধর্ম্মের ডালি বহন করিতেছি, আর্য্যগণ যে সংসারে থাকিয়া সর্ব্বদা আনন্দে কাটাইয়া গিয়াছেন, আজ আমি সেই সংসারকে অতিতীব্র বিষময় বোধ করিতেছি। সংসারে ত সেই সবই আছে, তবে কেন এত দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করি, তবে কেন সেই সংসার আনন্দপূর্ণ অতি পবিত্র স্থান না হইয়া নিরানন্দময় অতি অপবিত্র স্থান বলিয়া বোধ হয়। নিশ্চয় কিছু অসামঞ্জস্য আছে, তাঁহাদের প্রাণে ভাব আমার প্রাণে সবই অভাব, তাহাদের হৃদয় ভাবময়ের ভাবে পরিপূর্ণ ছিল, আমার হৃদয় অহঙ্কারে পরিপূর্ণ, তাঁহারা সংসারের প্রত্যেক বস্তুতে দয়াময় শ্রীহরির ভাব অবলোকন করিতেন, আমি তাহার পরিবর্ত্তে নিজের ভাব অবলোকন করিয়া থাকি। অতএব যখন দেখিতেছি একমাত্র যে ভাবের জন্য এত বিভিন্নতা সেই ভাবেরই যখন অভাব, তখন কেমন করিয়া আনন্দ পাইব, কেমন করিয়া সংসারকে অমৃতপূর্ণ বোধ করিব তখন কেমন করিয়া বলিব যে আমি একজন প্রকৃত সংসারী।

আবার আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বন্ধু, ইহা সর্ব্বদাই বলিতেছি, কিন্তু আমারই যদি স্ত্রী হয় তবে যথার্থ পতির কার্য্য কই করিতেছি। পতিই ত সতী স্ত্রীর পরম গুরু, পতিই ত স্ত্রীকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে। কিন্তু পত্নীর পতি হইয়া পত্নীকে যদি ধর্ম্মশিক্ষা দিতে না পারিলাম, পত্নীকে যদি ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিতে না পারিলাম, তবে আমার স্বামীত্ব কোথায়? স্ত্রীকে সর্ব্বদা কুভাবে সাজাইয়া রাখা; কেবল পাশবর্বৃত্তি চরিতার্থ করা ত আর স্বামীর কর্ত্তব্য নয়। শাস্ত্রে বলে স্ত্রী সহধর্ম্মিণী কিন্তু আমার সম্বন্ধে দেখিতেছি তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। স্ত্রীকে কু অভ্যাসে অভ্যস্ত করিতে পারিলে স্ত্রীকে বিলাসিতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ করিতে পারিলেই নিজকে চরিতার্থ মনেকরি; মুখে বলি আমার স্ত্রী আমি স্ত্রীকে অত্যন্ত ভাল বাসি কিন্তু এই কি তাহার দৃষ্টান্ত না এই ভালবাসার পরিচয়? মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবতা দিগকে সাক্ষী করিয়া স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী

স্বরূপ গ্রহণ করিলাম কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে স্ত্রীকে কুশিক্ষা দিয়া, কুভাবে মজাইয়া একটী সরলা অবলা বালিকার ইহকাল ও পরকাল দুই কালেরই মাথা খাইতে বসিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে এবং ইহা অপেক্ষা আর অধর্ম্ম কি হইতে পারে ?

বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া তো কেবল পরনিন্দা, পরচর্চ্চারই আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু কৈ একদিনের জন্যও কি বলিয়া থাকি ভাই সকল! জীবনের অনেক সময় তো কুবিষয়ের আলোচনাতেই কাটাইলাম, এস আর কেন ? এবার হইতে জগদ্বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করি যাহাতে আর কখনও আমাদিগের বিচ্ছেদ ঘটিবে না, এবং প্রাণময়ের সহিত মিলিয়া তাঁহাকে লইয়া সকলে একত্রে আনন্দে অবস্থান করিব। কৈ একথা তো মুখ দিয়া একদিনের নিমিত্তও বাহির হয় না ? তত্রাচ প্রাণের বন্ধু প্রাণের বন্ধু করিয়া বন্ধুতা করিতে যাইতেছি। ধিক আমার জীবনে, ধিক আমার বন্ধুতায়; ধিক আমার ভালবাসায়।

এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই———আমি মানুষ হইয়াও মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারি না—দেখিতে পাই আমি ধার্ম্মিক নই সংসারীও নই। আমি পিতামাতার পুত্র নই পুত্র কন্যার পিতাও নই। আমি ভ্রাতা ভগিনীর ভ্রাতা নই, বন্ধুবান্ধবের বন্ধু নই, এবং স্ত্রীরও স্বামী হইবার যোগ্যপাত্র নই। ইহ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা যাহা বলিয়া অহংকার করিয়া থাকি যদি তাহার একটীও হইবার উপযুক্ত না হই; তবে আমি কে ? শ্রীভগবান যখন চিন্ময়রূপে সর্ব্বজীবে অবস্থান করিতেছেন তখন আমাতেও যে নিশ্চয় আছেন তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আমার সে বিশ্বাসও নাই, তাহাহইলে দেখিতেছি যখন ভগবানেতেও অবিশ্বাস তখন কেমন করিয়া বুঝিব আমি কে।

তাই বলি মন! যতই চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইবে ততই হতাশরূপ তরঙ্গ আসিয়া কোথায় লইয়া যাইবে কিছুই স্থির করিতে পারিবে না, ক্রমাগত হাবুডুবু খাইতে হইবে। অতএব অহংকার পরিত্যাগ কর আত্মশ্লাঘা, আত্মগরিমা, একেবারে বিসর্জ্জন দাও, শ্রীভগবানে বিশ্বাস করিয়া তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় লও, কিনারা পাইবে, আনন্দ হইবে "আমিকে" বুঝিতে পারিবে! বিষম তুফানে পতিত হইয়াছ হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিবার চেষ্টা করিও না, নিশ্চয় ডুবিয়া মরিবে, যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, যদি তরঙ্গের হাত এড়াইয়া কিনারা পাইতে চাও, স্রোতে গা ভাসান দিয়া ভগবানেতেই আত্মসমর্পণ কর, নিজ অস্তিত্ব লোপ করিয়া প্রাণে প্রাণে ভগবানের সত্বা উপলব্ধি কর, বিপদকালে একবার কোথায় মধুসূদন বলিয়া ডাক, তোমার কার্য্য তিনি করিবেন কোন ভাবনা থাকিবেনা হতাশ দূরে যাইবে, একবার মনে প্রাণে বল দয়াময়! যদি এত কৃপা করিয়া মনুষ্য আকারে সাজাইয়াছ যেন পশুবৃত্ত অবলম্বন করাইও না। তোমা বিনা আর গতি নাই, তুমি কৃপা কটাক্ষ না করিলে এমন কোনও ক্ষমতা নাই যে চেষ্টা করিয়াও তোমার খেলা বুঝিতে পারি। দয়াময় জানিতে চাহিনা; কি নিমিত্ত এস সাবে প্রেরিত হইয়াছি, কিন্তু কৃপা করিয়া এই হতভাগ্যের দ্বারায় তোমার কার্য্য তুমি নিজে সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইয়া লও এবং প্রাণে প্রাণে তোমার সত্বা বুঝাইয়া দাও তোমার শ্রীচরণে এই একমাত্র প্রার্থনা — আমি তোমার দাসানুদাস —

শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার

তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

পাঠকবর্গ! আমরা "ভক্তির" সপ্তম সংখ্যার ক্রোড়পত্রে শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশনের দিন নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম বিশেষ কার্য্য বিবরণ পরে প্রকাশ করিব [illegible] লের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রকাশ কি

পাঠকবর্গ ! আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এবারে উৎসবের সময় আমরা নূতন নূতন অনেক লোকের সহানুভূতি পাইয়াছিলাম এবং উৎসবের কয়েকদিন তাহাদিগকে সরল প্রাণে ও আনন্দের সহিত যোগদান করিতে দেখিয়ছিলাম। আমাদের চার দিন মাত্র সভা করিবার নিয়ম ; কিন্তু সকলেরই ইচ্ছা হইল বারদিন উৎসব করিরেন এবং তদনুসারে উদ্যোগ হইতে লাগিল। সকলে এক মনে, এক প্রাণে সেই বারদিন ক্রমাগত যে কি এক অপূর্ব্ব উৎসাহে অপার আনন্দে ও মাতোয়ারা ভাবে কাটাইয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। যাঁহারা এই উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন তাঁহারাই উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। সেই বারদিন সভা কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হইয়াছিল বলিবার পূর্ব্বে, পাঠকবৃন্দের নিকট সভাপতি মহাশয়ের কিছু পরিচয় দেওয়া যাউক। আমাদিগের সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি সুশিক্ষিত ও সদাশিব লোক—ইহাঁকে মাটির মানুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইনি আমাদিগকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন এবং আমাদিগের মঙ্গলার্থে বিশেষ চেষ্টা করেন। ইহাঁর সহানুভূতি না পাইলে আমরা কখনই এত উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে পারিতাম না। যাহাতে আমাদিগের স্বভাব নির্ম্মল থাকে, চরিত্র সৎপথে গঠিত হয়, যাহাতে আমরা ধর্ম্মপথে থাকিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করি যাহাতে আমরা কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়া কি জাগতিক কি পারমার্থিক সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি, এবং যাহাতে আমাদের শ্রীভগবানে ভক্তি হয়, সেজন্য আমাদিগকে নানাবিধ উপদেশ দানে ইনি সভাপতির কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, এবং দিন দিন সভার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আমাদিগের মঙ্গলবিধান করিতেছেন, ইহাঁর জীবনের কার্য্য হইতেও আমরা অনেক সারগর্ভ উপদেশ শিক্ষা পাইতেছি। শ্রীভগবানের কৃপায় আমরা উপযুক্ত পাইয়া পাঠকবৃন্দের নিকট আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

এক্ষণে অধিবেশন কালীন কার্য্য বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা .রতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম দিন ২৪শে চৈত্র শুক্রবার অধিবেশন ·স্ত হইল এই দিবস রাত্রে সকলে একত্র সমবেত হইয়া শ্রীহরি কীর্ত্তনে অধিবাস কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলেন। দ্বিতীয় ।দন শনিবার সমস্বরে গৌর—গুণ গান করত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আহ্বান করিয়া "জয় জয় রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন রাম নারায়ণ হরে" এই নামে অষ্ট প্রহর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ঐ নাম কীর্ত্তনকারীদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই যুবক এবং বলিতে কি একজন মাত্রও ব্যবসাদার ইহার অন্তর্গত ছিল না সকলেই প্রাণের উচ্ছ্বাসে, সরল প্রাণে নিষ্কাম হৃদয়ে ঐ নামগাথা গান করিয়া এক অপূর্ব্ব মাতোয়ারা ভাবে মত্ত হইয়া ছিলেন, যদিও বিশেষ কোন কার্য্য বশতঃ কেহ একটু অন্তরালে যাইতেন কিন্তু তত্রাপি ঐনাম ধ্বনি যেন হৃদয়ের স্তরে স্তরে ধ্বনিত হইত। ক্রমাগত যিনি আসেন তিনিই করতালি দিয়া পূর্ব্বোক্ত গান করিতে ২ মগ্ন হন। এক একবার এক এক জনের ভিতর মত্ততা আসে, আর তিনি উর্দ্ধবাহু হইয়া ঐনাম গান করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন, এবং অপর সকলে তাঁহারই ভাবে কখন নৃত্য করত গান, কখন বা বসিয়া সমস্বরে নাম গান করেন। এইরূপে সমস্ত দিনরাত কাটিয়া গেল কাহারও ক্লান্তি নাই, কাহারও মুখে বিষণ্ণতা বা পরিশ্রমের চিহ্নমাত্র নাই। এদিকে দিনের বেলায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীনারায়ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি দেবতার অর্চ্চনা হইল, অর্চ্চনান্তে সন্ধ্যাকালে আরত্রিকের সময় ঐনাম কীর্ত্তনের তালে ২ মহা উৎসাহের সহিত মহাসমারোহে আরত্রিকের কার্য্য সম্পন্ন হইল। পরদিন রবিবার প্রাতেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সভামণ্ডপেই থাকিয়া কীর্ত্তন হইল, পরে ঐনাম গান করিতে করিতে পল্লী প্রদক্ষি করিয়া সভাস্থলে প্রত্যাগমন করত যথাবিধি অষ্ট প্রহর নাম ৼ করা হইল এবং দিবাভাগে পূজা অর্চ্চনাদি হই·

আরত্রিকের পর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শান্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় অপরাপর কয়েকটী সাধকের সঙ্গীতে অনেক রাত্র পর্য্যন্ত সভামণ্ড বহুলোকে পরিপূর্ণ ছিল। পূর্ব্বোক্ত সাধকের ভাবোচ্ছ্বাস সুললিত মধুময় সঙ্গীত ঐ সভামণ্ডলীস্থ প্রত্যেক লোকের কর্ণকুহ প্রবেশ করত মধুময় বলিয়া বোধ হইতেছিল; কি হরিনামানুরাগী কি নামবিদ্বেষী, কি ভক্ত, কি অভক্ত, কি প্রেমিক, কি অপ্রেমিক সকলেই সেই সময়ের জন্য এক প্রাণে, কি এক ভাবে, মাতোয়ারা হইয়া স্তম্ভিত! কি এক শক্তি প্রত্যেক সভ্যের হৃদয়াভ্যন্তরে সঞ্চারিত হইয়া ধমনীতে ধমনীতে তড়িত বেগে ছুটিতে লাগিল! কি এক আনন্দ উৎস তরঙ্গমালা সমগ্র শ্রোতৃবর্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল! মায়া মোহে মুগ্ধ, রোগ শোকে জীর্ণশীর্ণ, পাপে তাপে মলিন, বিষয় বিষে জর্জ্জরিত, আমরা সকলেই, সেই দিন সেই সময়ের জন্য এক স্বর্গীয় ভাবে আত্মহারা হইয়া যে বিমল আনন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করা সাধ্যাতীত।

এক্ষণে চতুর্থ দিবস কিরূপে কাটিল আলোচনা করা যাউক কিন্তু প্রথম কিছু বলিবার আছে—পরম ভাগবত বহুশাস্ত্র বিশারদ ও বেদবেদান্তজ্ঞ ধর্ম্ম প্রচারক, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন মহাশয় আমাদিগের মঙ্গলার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে এই শ্রীভাগবত ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা স্থাপন করেন, এবং কৃপা করিয়া সভাচার্য্যের আসন গ্রহণ করত এই কয়েক বৎসর সনাতন ধর্ম্ম-বীজ সভ্যগণের হৃদয় ক্ষেত্রে বপন করিতেছেন। তিনিই আজ আমাদের সম্মুখে এই সভামণ্ডপে উপস্থিত থাকিয়া পতিতপাবন-রূপে আমাদিগের ন্যায় পতিতদিগকে ত্রিতাপ জ্বালাশূন্য আনন্দ ধামের পথ দেখাইতেছেন আর নিজ সঞ্চিত প্রেমভক্তি রসের ভাণ্ডার ভক্তগণের নিকট উন্মুক্ত করে রাখিয়াছেন। মধুকরগণ যেমন, যেখানে মধু, স্বভাবতঃ সেই খানেই আসিয়া জুটে, ভক্তগণও আজ সেইরূপ এই সভা-মণ্ডপে ভক্তি দেখিয়া, স্বভাবতঃ আসিয়া নিশ্চয় আসন গ্রহণ

ছেন। আজ স্বয়ং সভাচার্য্য মহাশয় এবং বহু সাধু ও বহু আমাদের সম্মুখে সভামণ্ডপের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। দেখিয়া ারা ধন্য হইলাম, আমাদের জন্ম সার্থক হইল।

র্থ দিবস ২৭শে চৈত্র সোমবার প্রাতে নামসংকীর্ত্তন এবং অর্চ্চনাদি আরম্ভ হইল। সভাস্থল সেই সময় যেন আনন্দসাগর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল আর ঐ সাগরে একটী তরঙ্গ লয় হইতে না হইতেই আর একটী তরঙ্গ উঠিল। এইরূপে সভামণ্ডপে তরঙ্গের পর তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। বাদ্যযন্ত্রের সহিত হরিনাম সংকীর্ত্তন এবং অর্চ্চনা আরম্ভ হইল ও সেই সঙ্গে ভক্তহৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। আমাদের সংসারে আশক্ত অস্থির চিত্ত পূর্ব্ব ২ দিনের ন্যায় সংযত ও স্থির হইল এবং অশান্তি পূর্ণ দগ্ধ হৃদয় সেই সময় শান্তিময় বলিয়া বোধ হইল। তখন প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিলাম পূজা অর্চ্চনাদির কি সাত্ত্বিক ভাবোদ্দীপকতা, ভক্ত সমাগমের কি অপার মহিমা, হরিনাম মহামন্ত্রের কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! সাধুগণের জ্বলন্ত মূর্ত্তির কি চিত্তাকর্ষণী ক্ষমতা! পূজা অর্চ্চনাদি এবং নাম সঙ্কীর্ত্তনান্তে প্রায় সকলেই গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নে সভার কার্য্য কিছু না হইলেও পূর্ব্ব স্রোত হৃদয়ে তখন অনুভব করিয়া অনেকেই আনন্দে মগ্ন ছিল। সন্ধ্যা সমাগমে আবার বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল এবং পূর্ব্ব দিনের ন্যায় সন্ধ্যাপূজা আরম্ভ হইল। এখানে আমার প্রাণের কথা কিছু বলিবার ইচ্ছা হইতেছে।

শৈশবাবস্থায় সকলেরই চিত্ত স্বভাবত নির্ম্মল ও সরল দেখিতে পাওয়া যায়। বয়োবার্দ্ধক্যের সহিত মনে প্রায় অটল বিশ্বাস স্থান পায় না। এবং নানা প্রকার জটিল তর্ক আসিয়া আশ্রয় লয়। কিন্তু শৈশবাবস্থায় যাহা শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা প্রায় বিনা তর্কের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমারও সেই প্রকার হইয়াছিল

... শৈশবাবস্থায় খ্রীষ্টিয়ান স্কুলে ভর্ত্তি হ

এবং খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষকের সহবাসে ও শিক্ষাতে তাহাদিগের আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। বিগ্রহ স্থাপনের কি আ শ্রীভবানকে ফল ফুল দ্বারা পূজার্চ্চনাদির কি প্রয়োজন ? এবং ত মূর্খতা এই প্রকার কয়েকটী ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। যা হউক ভগবানের কৃপায়, ভক্ত সহবাসে এবং পূর্ব্বজন্ম সুকৃতির ফলে অনেক দিন হইল সে সকল ধারণা অন্তর্হিত হইয়াছে। উক্ত দিবস সন্ধ্যা পূজার সময় পূর্ব্বের কথা স্মৃতি পথে উদয় হইয়া ভয়ের সঞ্চার হইল এবং ভাবিলাম পূর্ব্ব ধারণা সকল যদি না যাইত, যদি পূজা অর্চ্চনাদি দেখিতে ইচ্ছা না জন্মিত, তাহা হইলে কি আজ এ আনন্দ পাইতাম। পাঠকবর্গ! ভাবিয়া দেখুন পূজা অর্চ্চনাদির কি সাত্বিকভাব, এই আমাদের মন বিষয়ের কত কি ভাবিতে ছিল, এই আমাদের মন সংসারের কি প্রকার জ্বালা যন্ত্রনায় অশান্তিপূর্ণ ও অস্থির হইয়া রহিয়া ছিল ; কিন্তু একি হইল ? আজ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে কর-যোড়ে দাঁড়াইয়া আরত্রিক দেখিতে দেখিতে এ কেমন হইল ? বলিতে পার পাঠকবর্গ! আজ আনন্দে হৃদয় কেন নাচিয়া উঠিল ? বলিতে পার পাঠকবর্গ! আজ মনে কেন একি এক নব স্বর্গীয় ভাবের উচ্ছ্বাস ছুটিল ? বলিতে পার পাঠকবর্গ আজ সমস্ত বিক্ষেপ সকল অশান্তি, ও সকল প্রকার অস্থিরতা কোথায় বিলীন হইল ? বলিতে পার পাঠকবর্গ! এখন কেন ভগবদ্ভাবে প্রাণ টলিল ? এক্ষণে সভার কার্য্য বিবরণ লিখিতে অগ্রসর হইলাম। সন্ধ্যার সময় আরত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ আরম্ভ হইল। যিনি ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ছিলেন তাঁহার পরিচয় পাঠকবর্গের নিকট পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এই সভার আচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়। ইনি যখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে ছিলেন তখন শ্রোতৃবর্গের নিকট অমৃত বলিয়া বোধ হইতেছিল। চৈতন্যচরিত সাগরে অমৃত আছে বটে, কিন্তু সকলেই কি সেই ত মন্থন করিতে সক্ষম ? ইনি আজ শ্রীচৈ—

অমৃত মন্থন করিয়া সভ্যগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন
উপর সুধাবর্ষণ হইতে লাগিল। এবং সকলেই পূর্ণানন্দে
রহিলেন সভামণ্ডপ তখন স্বর্গতুল্য বোধ হইতে লা
প্রকারে কয়েক দিবস সমস্ত দিবা ও ন্যূনাধিক অর্দ্ধরাত্র
ভগবৎ আলোচনায় মহানন্দে কাটিতে লাগিল; অল্পক্ষণ
করিতে অবসর হইত; ২৮ শে মঙ্গলবারও সোমবারের ন্যায় সম
সভার সকল কার্য্য সমাপন হইল। এক্ষণে বুধবার সভারকার্য্য
প্রকারে সম্পন্ন হইল বর্ণনা করিতেছি। উক্ত দিবস প্রাতে পরমার
আচার্য্য মহাশয় মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। আচা
মহাশয়ের ব্যাখ্যা এত সরল এবং সুন্দর হইতে লাগিল যে উহ
সকলেরই এমন কি স্ত্রীলোকদিগেরও সম্পূর্ণ বোধগম্য হইয়াছিল।
সন্ধ্যার সময় মান্যবর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক
"আমরা ও আমাদের" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার কথা ছিল
বক্তা মহাশয় বসুমতী নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের সম্পাদক এবং
পরম ভক্ত। তাঁহার বক্তৃতা অনেকেই শুনিয়াছেন সুতরাং তিনি
প্রায় সকলেরই নিকট পরিচিত। উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় সভাস্থল
শত শত লোকে পরিপূর্ণ এবং এমন কি স্থানাভাবে অনেক লোকে
দাঁড়াইযাও থাকিতে হইয়াছিল, এবং প্রত্যেকেই পূর্ব্বোক্ত বক্তা
মহাশয়ের জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা শুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা
করিতে ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার আসিবার বিলম্ব
হওয়াতে সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন পরম দয়ালু
আচার্য্য মহাশয় কি আর কৃপণতা করিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহার
অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য রত্ন সভাস্থলে ছড়াইয়া দিতে আরম্ভ
করিলেন। "তিনি হরিনাম মাহাত্ম্য" সম্বন্ধে ভক্তিরসপূর্ণ বক্তৃতা
দানে সভামণ্ডপের প্রত্যেক লোককে বিমোহিত করিতে লাগিলেন।
সকল লোক স্তম্ভিত, নিস্পন্দ এবং আশাতীত য

স্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তখন পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত
গাস্বামী মহাশয় সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন আচার্য্য
হা সমাদরের সহিত তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া,
ম মাহাত্ম্য ” সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করাতে
মধুর স্বরে সুললিত ভাষায় উক্ত বিষয় বক্তৃতা দানে
কের হৃদয়ে আনন্দবিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষার
ত্যক অক্ষর ও তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যেক কথা শক্তি পরিপূর্ণ,
ার উপদেশ সকল সারগর্ভ, তাঁহার কল্পনা ও চিন্তাশক্তি গভীর
বং তাঁহার যুক্তি ও মীমাংসা শাস্ত্রীয়, সুতরাং অভ্রান্ত। অতএব
এদিবসও যে সকলেব মহানন্দ হইয়াছিল তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

৩০শে চৈত্র বৃহস্পতিবার প্রাতেঃ পূজ্যপাদ আচার্য্য মহাশয় বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ কবিয়া সকলেব নিকট পরম বৈষ্ণব চরিত্রের জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া ছিলেন। পরম ভাগবত প্রহ্লাদ সর্ব্বজীবে, সর্ব্ব স্থানে সকল বস্তুর মধ্য দিয়া ভগবৎ সত্ত্বা যেরূপ প্রাণে প্রাণে অনুভূতি কঁবিয়াছিলেন আচার্য্য মহাশয় তাহা যথাসধ্য বুঝাইতে ত্রুটি করেন নাই। বিষ্ণুপুবাণ পাঠ সমাপ্তে আচার্য্য মহাশয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ও অভেদমূর্ত্তি শ্রীগৌবাঙ্গদেবের পূজা অর্চ্চনাদি করত সকলের প্রাণে আর এক নব ভাবের উদ্দীপনা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় পরম ভক্ত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় “ প্রেমভক্তি ” সম্বন্ধে সুমধুব বক্তৃতা দানে শ্রোতৃ বর্গের কর্ণকুহরে মধুবর্ষণ করিতে লাগিলেন. এবং প্রেম, ভাব, মহাভাব, ইত্যাদি প্রেমের গভীরতর গভীবতম অবস্থা সকল সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করণানন্তর ইহা জগতের সার বস্তু প্রমাণ করিয়াছিলেন, এবং পরে “প্রেমভক্তি ” সম্বন্ধে উত্তেজনা পূর্ণ সুদীপ্ত বক্তৃতা দানে সেই সময়ে সেই অবস্থায় প্রত্যেক হৃদয়ে প্রেমভক্তি রস-তরঙ্গিণী প্রবাহিত

চটা সংসারের আবর্জ্জনা হইতে সরিয়া গিয়া ভগবৎরসে মজিল। ।যদি না হইবে তবে ভগবৎ আলোচনার গুণ কি? শাস্ত্রপাঠ ণের শক্তি কি? সাধুসঙ্গের মহিমা কি?

১লা বৈশাখ শুক্রবার প্রাতে আচার্য্য মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ঠ করিয়াছিলেন, এবং পরে সংকীর্ত্তনান্তে পূজা অর্চ্চনাদির দ্বারা নন্দস্রোত প্রবাহিত রাখিয়াছিলেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় নীয় ৺ জ্ঞানানন্দ স্বামী মহাশয় "বিশ্বাসে মুক্তি" সম্বন্ধে সুমধুর বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার আদ্যন্ত জ্ঞান এবং যৌগিক দৃষ্টান্ত ও ভাব পরিপূর্ণ, সুতরাং সকলের বোধগম্য নহে। বোধ হয় অনেকেই বক্তৃতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার বক্তৃতা শুনিলে তাঁহার জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বক্তৃতা শেষ হইলে তিনি সকলের সহিত সমভাবে আলাপ এবং আনন্দ করিয়াছিলেন। কখন কাহাকে কোলে লইতেছেন, কখন কাহাকে চুম্বন করিতেছেন, কখন বা কাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, আবার কখন বা সংকীর্ত্তনের মাঝে গিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন। এক্ষণে জ্ঞানানন্দ যেন প্রেমানন্দ হইয়া গিয়াছেন। আজ কি জানি কাহার প্রেমে বিভোর হইয়া মাতোয়ারা ভাবে বেড়াইতেছেন আজ বিশ্ব-জগতের প্রত্যেক প্রাণীতে ইষ্টদেবের সত্তা অনুভব করিয়া সকলকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতেছেন। জ্ঞানানন্দের এত প্রেম আসিল কোথা হইতে? অনেকেই বলিয়া থাকেন "জ্ঞান" সর্ব্বনাশের মূল, প্রেমই জগতের সার বস্তু। কিন্তু জ্ঞানানন্দের জ্ঞান ও প্রেমে কোন প্রভেদ দেখিলাম না। যিনি জ্ঞান এবং প্রেমকে এক করিয়া লইয়াছেন তিনিই মহাত্মা। যে শু জ্ঞানে প্রেমের চিহ্নমাত্র নাই সেই জ্ঞানই সর্ব্বনাশের মূল; নতু -নন্দের জ্ঞান প্রেম মাত্র।

--- বিষয়! বড়ই অমৃত-ের বি

পাইব না, আর সেরূপ আহ্লাদের সহিত তাঁহার সনে নৃত্য ক পাইব না, এই অধমদিগের মধ্যে আগমন করিয়া আর তিনি এ প্রেমভাবে নৃত্য করিবেন না! তিনি আমাদিগকে শোকে সন্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, অসংখ্য শিষ্য দিগকে শোক সাগরে নি করিয়া জ্ঞানানন্দ রোগ শোক মৃত্যু ভয় শূন্য আনন্দধামে গমন করি ছেন তাঁহার নিমিত্ত সকলেই কাতর, বিশেষতঃ আমাদিগের আচা মহাশয়ের সহিত জ্ঞানানন্দের প্রগাঢ় প্রণয় ছিল বলিয়া, তাঁহ অভাবে তিনি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছেন।

২রা বৈশাখ শনিবার প্রাতে পূর্ব্ব দিনের ন্যায় সভাকার্য্য সম্পন্ন হইল। সন্ধ্যার সময় গৌরগত-প্রাণ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় "সাধুসঙ্গ" সম্বন্ধে বক্তৃতা কালে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে প্রচার করিয়া এবং সাধুদিগের কি সংক্রামক শক্তি ও কত মহাপাপী অধম চণ্ডাল যে সাধুসহবাসে কৃতার্থ হইয়াছে তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদিগের সকলকেই বিমোহিত করিয়া ছিলেন।

পরদিন রবিবার প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ ও অর্চ্চনাদি দ্বারা সভাকার্য্য সম্পন্ন হইল। অপরাহ্নে শ্রীভাগবত-ধর্ম্মপ্রচারিণী সভার স্থাপন কর্ত্তা এবং উক্ত সভার পূজ্যপাদ আচার্য্য মহাশয় "ভাগবত-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে মধুর কণ্ঠে, সুললিত ও মধুর ভাষায় প্রেমভক্তি রসপূর্ণ বক্তৃতাদানে সভামণ্ডপের প্রত্যেক লোককে যেরূপ উত্তেজিত করিয়াছেন ও যে অতুল বিমল আনন্দ বিধান করিয়াছেন তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতেই সভাস্থলে ঙ্গ করতালের ধ্বনি আসিল; আমরা বুঝিলাম দলে দলে নগর কীর্ত্তন আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে অভ্যর্থ- র্থ আমরা বাহির হইলাম; এবং দেখিলাম সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ! যাহ সেখানে হরিনাম সংকীর্ত্ত

সম্প্রদায়ই এই সভামণ্ডপে পদধূলি দিয়া আমাদিগকে পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ঐ দিবস এই পল্লীর আবাল বৃদ্ধ সকলেই হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ ভোগ করত এই সভাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন

৪ঠা বৈশাখ সোমবার প্রাতে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মা পূজ্য শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় প্রেমদাতা নিত্যানন্দ বংশীয় গৌর প্রাণ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় "হরি সাধন' সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য সরল ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা দানে সকলের প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় আমরা তাঁহার মধুময় বক্তৃতা অধিকক্ষণ শুনিতে পাই নাই।

এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট আর একটী বিষয় নিবেদন করি— প্রত্যেক দিন রাত্রে বক্তৃতা অন্তে নাম সংকীর্ত্তন হইত। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! শত শত লোক দণ্ডায়মান, ও সকলেই সংকীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইয়া সভামণ্ডপের চারিদিকে বেষ্টিত। আচার্য্য মহাশয়ের প্রেম ভাবপূর্ণ সঙ্গীত, মাতোয়ারা ভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য, অপূর্ব্ব নেত্রপ্রীতিক গৌরমূর্ত্তি, প্রত্যেকের হৃদয় আকর্ষণ করত ভক্তপ্রাণে আনন্দ বর্ষণ করিয়াছিল।

শেষদিন ৫ই বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতে উঠিয়া আমরা সব কাঙ্গালী ভোজনের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম; এবং আমাদি সভার প্রত্যেক সভ্যই আচার্য্য মহাশয়ের আদেশানুসারে করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। এতদিন হরিকথা সাধুসহবাস, পূজা অর্চ্চনাদি দর্শন এবং ভগবৎ-আলোচনায় থাকায় সকলের মুখে এক স্বর্গীয়ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। সকলেই পরমানন্দের সহিত কাঙ্গালী ভোজনের করিতে লাগিলেন

লাগিল, এবং এক২ বারে প্রায় দুইশত কাঙ্গালী খাওয়াইতে হইতেছিল, আমরা সকলে পারিবেশন করিতে লাগিলাম এবং যে কি আনন্দ হইতে ছিল তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা তছি না। বোধ হয় কাঙ্গালীদিগকে পরিবেশন করিয়া, ও য়াইয়া যেরূপ আনন্দ হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। বোধহয় বুঝাইতেই আচার্য্য মহাশয় কাঙ্গালী ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া ন। কাঙ্গালী ভোজনান্তে আমরা সকলে প্রেমানন্দে বালকের মত খেলা করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলাম। তাহা কিরূপ নিম্নে লিখিতেছি——চতুর্দ্দিকে হরিনাম ধ্বনি হইতেছে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের অঙ্গে অন্ন ব্যঞ্জনাদি নিক্ষেপ করিতেছেন, প্রত্যেককেই অবশিষ্ট সকলে কাঁদে তুলিয়া "বলহরি হরিবোল" বলিতে বলিতে কিছুক্ষণ বেড়াইতেছেন, এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত আলিঙ্গন করিতেছেন। এইরূপে খেলা শেষ হইলে আমরা সকলে মিলিয়া স্নান করিয়া আসিলাম। আমাদের জন্য প্রসাদান্ন ও নানাবিধ দ্রব্য স্তুত, সুতরাং সভা বাটীর দ্বিতলের উপর সকলে একত্রে আহার রিতে বসিলাম। আজ কি আনন্দ! খেলা করিতেছি সেখানে রিনাম" আহার করিতেছি সেখানে "হরিনাম" প্রত্যেক কাজেই রিনাম" কি আনন্দ আজ! এরূপ আনন্দের দিন জীবের ভাগ্যে দিন ঘটিয়া থাকে?

হরিনাম বিদ্বেষী ও কয়েকজন অধিবেশন সময়ে কি জানি কোন শে সভামণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁহারাই বলিলেন লোচনায় এত আনন্দ আছে পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতাম না এবং ক্তভাবে স্বীকার করিলেন, আমরা প্রথম দুই একদিন হরিগুণ- ও ভগবৎ কথা শ্রবণ করিয়া এত আনন্দলাভ করিয়াছিলাম যে দিবসও উহা পান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বৈশাখ মঙ্গলবার আমাদিগের সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক শেষ হইল। প্রার্থনা করি শ্রীভগবানের কৃপায় প্রতি সারের আবর্জ্জনা হইতে একটু সরিয়া যেন